

মহাত্মা গান্ধী কেন মহাত্মা নন

মনোজ দাশ

মহাত্মা গান্ধী কেন মহাত্মা নন

মনোজ দাশ

ঋত্বিক প্রকাশন
৯২বি, কালীঘাট রোড
কলকাতা-৭০০ ০২৬

প্রাপ্তিস্থান ঃ

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

MAHATMA GANDHI KENO MAHATMA NON
A critical analysis on Mahatma Gandhi in Bengali
Written by **Manoj Das**
Price : ₹ 230

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৪
প্রকাশক : বোধিসত্ত্ব দাশ। ঋত্বিক প্রকাশন। ৯২বি, কালীঘাট রোড, কলকাতা-২৬, দূরভাষ-৯৪৩৩৯৫৯৩৮২
বর্ণ সংস্থাপন : লেজার পয়েন্ট। ২, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৬
মুদ্রাকর : নিউ জয়কালী প্রেস। ৮এ, দীনবন্ধু মিত্র লেন, কলকাতা-৬
প্রচ্ছদ : উত্তম সিন্‌হা

দুইশত ত্রিশ টাকা মাত্র

আমার মা

স্বর্গীয়া **চম্পকলতা দাশকে**

পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

উপন্যাস

ধর্মযুদ্ধ

ইঁদুর

গল্প সংকলন

মুখোমুখি

কিশোর-উপন্যাস

অলৌকিক অভিযান

আলোচনা ও সমালোচনা গ্রন্থ

কলকাতার কলগার্ল

মুসলমানদের উন্নয়ন ও হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক

ভূমিকা

১

দোসরা অক্টোবর। দুজন বিখ্যাত মানুষের জন্ম হয়েছিল এই দিনে। অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন বছরে। দুজনেই রাজনীতির মানুষ। একই ঘরানার রাজনীতি। একজন সেই রাজনীতির শুরুর দিকের। আর একজন বেশ কিছু বছর পরের। একজন রাজসিংহাসনে না বসেও রাজা — অসীম ক্ষমতা ও সম্মানের অধিকারী, আর একজন সিংহাসনে বসেও যেন উপেক্ষিত। উপেক্ষিত বলাতে হয়তো কেউ কেউ ক্ষুব্ধ হতে পারেন, কিন্তু এই শব্দটি ছাড়া অন্য কোনও যুৎসই প্রতিশব্দ খুঁজে পেলাম না। রাজা না হয়েও যিনি ভারতে শত সহস্র রাজার চেয়ে বেশি সম্মান পেয়েছেন, তিনি মোহনদাস কর্মচন্দ্ গান্ধী, দেশ যাঁকে জানে মহাত্মা নামে। শুধু দেশ কেন, সারা পৃথিবী জুড়ে যিনি সম্মান পান মহাত্মা বা গ্রেট সোল হিসেবে। তাঁর জন্মদিন যথাযোগ্য মর্যাদায় স্মরণ করার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (*United Nations*) ২ অক্টোবরকে আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবস (*International Non-Violence Day*) হিসেবে ঘোষণা করেছে বহু বছর আগেই। আর দ্বিতীয় জনটি রাজা হয়েও অর্থাৎ ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়েও যিনি উপেক্ষিত, তিনি লাল বাহাদুর শাস্ত্রী।

এই বছর (২০১৩) ২ অক্টোবরের সকালে বেশ কয়েকটি দৈনিক পত্রের পৃষ্ঠাগুলো উল্টে দেখলাম। গান্ধীর জন্মদিন উপলক্ষে সরকারী, আধা-সরকারি, বেসরকারি বহু প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন দিয়ে তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছে। লালবাহাদুরকে পেলাম একটি মাত্র জায়গায়। শুধুই এক জায়গার ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপনে। এই ছোট্ট একরত্তি জায়গার একটা বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই। এমন কি, দু-চার লাইনের সম্পাদকীয়তেও পর্যন্ত নেই তিনি। অথচ, পাঁচ ফুট এক ইঞ্চি উচ্চতার এই মানুষটি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রথম নির্ণায়ক জয়টি যে শুধু দেশবাসীকে এনে দিয়েছিলেন তাই নয়, চীনের কাছে লজ্জাজনক পরাজয়ের ফলে শোকগ্রস্ত দেশবাসীকে নতুন আশার মন্ত্র শুনিয়েছিলেন। মাত্র এটুকুই নয়। আমাদের রক্ষানীতি, বিদেশনীতিকে তিনি দিয়েছিলেন আশ্চর্য এক স্বাভিমান। যে স্বাভিমান পরবর্তীকালে মাত্র দুজন প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে পাওয়া গেছে — ইন্দিরা গান্ধী আর অটলবিহারী বাজপেয়ী।

এই প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট ঘটনার কথা বলতে ইচ্ছা করছে। মনে পড়ার বড় কারণ, মাত্রই মাস দুয়েক আগে পাক সেনাবাহিনীর জওয়ানরা পাঁচজন ভারতীয় সেনাকে টহলদারির সময় হত্যা করে, তারপর তাদের মুণ্ডচ্ছেদ করে মুণ্ডগুলোকে নিজেদের কাছে রেখে দেহগুলি ফেলে রাখে আমাদের সীমানার মধ্যে। এই নারকীয় ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে যখন সারা দেশ প্রবল আক্রোশে ফুঁসছে এবং দাবি করছে বড় কোনও প্রত্যাঘাতের জন্য, তখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর দল কংগ্রেস শুধু প্রতিবাদ জানিয়েই নিজেদের দায়িত্ব শেষ করল। অথচ, এই একই রকম ঘটনা আগে একবার ঘটেছিল, যখন লালবাহাদুর শাস্ত্রী ছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। তিনি কীভাবে মোকাবিলা করেছিলেন সেদিন, সেটা জানলে বুঝতে পারবেন পার্থক্যটা কোথায় ও কীরকম। এই ঘটনার বিবরণ ভারতের সেনাবাহিনীর কাছে নিশ্চয়ই আছে, তবে আমি কোনও বইতে পড়িনি এই ঘটনা। ঘটনাটির কথা শুনেছি লালবাহাদুরের নাতি সিদ্ধার্থ নাথ সিংয়ের কাছে। ৩ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে মহাজাতি সদনের এক সভায় তিনি বলেছিলেন এই ঘটনাটি।

ঘটনাটি পঁয়ষট্টি সালের ভারত-পাক লড়াই চলাকালীন সময়ের। গভীর রাত, লালবাহাদুর ঘুমোচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর ফোন বেজে উঠল। ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রধান অর্জন সিং ফোনে জানালেন, এইমাত্র জানা গেছে যে, ভারতের সতের জন যুদ্ধবন্দীকে পাক সেনারা মাথা কেটে হত্যা করেছে। ঘটনাটি বলে তিনি লালবাহাদুরের কাছে জানতে চান, এই পরিস্থিতিতে তাঁদের কী কর্তব্য হবে। লালবাহাদুর কাল বিলম্ব না করে জানতে চাইলেন, পাক বাহিনীর কত সেনা আমাদের কাছে বন্দি আছে। উত্তর পেলেন — একশ' ছেচল্লিশ জন। লালবাহাদুর বললেন —ওদের পাশাপাশি দাঁড় করান এবং সবাইকে গুলি করে মারুন (শুট দেম অল)। বলা বাহুল্য, তাই করা হয়েছিল। এই ঘটনাকে পাকিস্তান ভালভাবে যে নিতে পারবে না, সেটা জানা কথা। স্বাভাবিক। সোভিয়েত রাশিয়াও সম্ভবত ভালভাবে নিতে পারেনি। কারণ গান্ধীবাদের অহিংস ভারতে এমন একরোখা, স্বাধীনচেতা মানুষ যদি প্রধানমন্ত্রী হয়ে বসে থাকে, তা সোভিয়েত স্বার্থের পক্ষে ভাল হতে পারে না। তাদের চাই পুতুল প্রধানমন্ত্রী। যিনি কাজ করবেন কম, কথা বলবেন বেশি। যিনি দেশের ভাবমূর্তির চেয়ে নিজের ভাবমূর্তি নিয়ে চিন্তিত থাকবেন বেশি। এই চাওয়া-পাওয়ার রাজনীতিতে জওহরলাল নেহরু ফিট্ করেছিলেন ভাল, শাস্ত্রী করেননি। সেকারণে অনেকের বিশ্বাস, তাসখন্দের মাটিতে লালবাহাদুরের হঠাৎ মৃত্যু কোনও স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, সেটা হত্যাকাণ্ড। ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য, নেতাজি অন্তর্ধান রহস্যের মত লালবাহাদুর

মৃত্যুরহস্যও কোনওরকম অনুসন্ধান ব্যতিরেকে চাপা দেওয়া হয়েছে এবং বৈদেশিক সম্পর্কের দোহাই দিয়ে এই মৃত্যুসম্পর্কিত বেশ কিছু ফাইলপত্র 'ডিক্ল্যাসিফায়েড' করা হয়নি এই ২০১৩ সালেও।

কিন্তু লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে নিয়ে আলোচনার জন্য আমার এই পুস্তকটি নয়। কেবলমাত্র জন্মদিনের মিল থাকার জন্য তিনি এসেছিলেন আলোচনার বৃত্তে। সুতরাং ফিরি গান্ধীর কথায়। তবে তার আগে স্রেফ্ কৌতুহল মেটানোর জন্য একটা প্রশ্নের অবতারণা করা যায়। গান্ধী যদি লালবাহাদুরের জায়গায় থাকতেন, যদি তিনি প্রধানমন্ত্রী হতেন আর তাঁর সৈন্যদের মাথা কেটে যদি দেহগুলো পাকিস্তান পাঠিয়ে দিত এদেশে, তাহলে তিনি কী করতেন? পাল্টা মাথা কাটতেন? কিংবা কোনওরকম প্রত্যাঘাতের কথা কি ভাবতেও পারতেন? গান্ধীবাদ সম্পর্কে যাঁদের সামান্যতম ধারণা আছে, তাঁরা বলবেন, গান্ধী কিছুই করতেন না, ক্ষমা করে দেওয়ার কথা বলতেন।

মহাজাতি সদনের যে সভায় লালবাহাদুরের নাতি সিদ্ধার্থ নাথ সিং এই ঘটনা জানিয়েছিলেন আমাদের, সেই সভায় পরিচিত-অপরিচিত বহু যুবক উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের কয়েক জনের কাছে আলাদা আলাদা ভাবে রেখেছিলাম এই প্রশ্নটি। তাদের সংক্ষিপ্ত উত্তরগুলো ছিল এরকম:

প্রথম জন —উনি পাকিস্তানকে বলতেন, কতজনকে হত্যা করলে তোমাদের হৃদয় শান্ত হবে? এক শ'? দুশ? এক হাজার? দু হাজার? তোমাদের হৃদয় পরিবর্তনের জন্য ভারত সবকিছু করতে পারে। তোমাদের হাতে শহীদ হওয়ার জন্য অবিলম্বে দুহাজার সেনা পাঠাচ্ছি।

দ্বিতীয় জন —গান্ধীর হাতে দেশ শাসনের ভার থাকলে ভারত রাষ্ট্র এতদিন টিকে থাকত কিনা সন্দেহ। যদিও বা থাকত, তবে সে একেবারে শেষ অবস্থায়। পাকিস্তান মাত্র দুহাজার আত্মবলিদানে ইচ্ছুক ভারতীয় সেনা পেলে খুশি হত না, আরও বেশি ডিম্যান্ড পাঠাত।

তৃতীয় জন — গান্ধীর রাজনীতি ক্লীবের রাজনীতি। লালবাহাদুর যা করেছিলেন, সেরকম প্রত্যাশা গান্ধীর কাছে যে করে, সে নিজে উন্মাদ।

চতুর্থ জন — গান্ধী সম্পর্কে যতটুকু পড়াশোনা করেছি, তাতে বলতে পারি, ব্রিটিশ তাঁকে পাগলাগারদে ঢোকায়নি একটাই কারণে, পাগলদের কাছ থেকে কামড় খাওয়ার ভয় থাকে, গান্ধীজির কাছ থেকে অন্তত সেই ভয়টুকু ছিল না।

পঞ্চম জন — আমাদের কপাল ভাল, নাথুরাম গড্‌সে তাঁকে সরিয়ে দিয়েছিলেন পৃথিবী থেকে। বেঁচে থাকলে ভারতের দুর্গতির কথা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়।

আরও পাঁচজনের মন্তব্য পেয়েছিলাম সেদিন। কয়েকজন গান্ধীর চরিত্র নিয়ে রীতিমত আক্রমণাত্মক কথা বলেছিলেন। এই পুস্তকে গান্ধীর চরিত্র নিয়ে যথাসম্ভব বিস্তার সহকারে অনেক কথা বলা হয়েছে। তাই সেই বিষয়টি নিয়ে এখানে আলোচনা করছি না।

কিন্তু যে প্রশ্নটা আমাকে ভাবিয়ে তুলল, তা হল, আজকের ভারতবাসী, বিশেষ করে ভারতের যুবসমাজ গান্ধীকে যে আদৌ শ্রদ্ধা করে না এটা দেখে। শ্রদ্ধা তো দূরের কথা, গান্ধীর রাজনীতি, গান্ধীর আদর্শ, গান্ধীর চিন্তাধারাতে তাদের যে শুধু অনাস্থা আছে তাই নয়, তারা এগুলোকে বিন্দুমাত্র গ্রহণযোগ্য বলেও মনে করে না। কারও কাছে গান্ধীবাদ আসলে উন্মাদবাদ, কারও কাছে ধান্দাবাদ। কেউ বা এটাকে বলে তোষণবাদ। তবে একটা ব্যাপারে সবাই একমত যে, মানুষটি ধূর্ত ছিলেন। কেননা, ধূর্ত না হলে আসমুদ্র হিমাচলের সর্বত্র পুজো হত না তাঁর।

পুজো যে হত, সে তো আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আমার ছেলেবেলার গ্রামে ছাব্বিশে জানুয়ারি, পনেরই আগষ্ট, দোসরা অক্টোবর — এই সব দিনগুলিতে আক্ষরিক অর্থে গান্ধীপুজো হত। নেতাজির ঠাঁই একেবারে যে হত না, তা বলব না। তবে সেই ঠাঁই যে তাঁর বাঙালি পরিচয়ের কারণে, তা সেই ছেলেবেলাতেই পরিষ্কার বুঝতাম। বিশাল গান্ধীচিত্রের একপাশে যুদ্ধসাজে সজ্জিত নেতাজির একখানি চিত্রও থাকত। গান্ধীর ছবির গলায় যে মালা ঝুলত, তার তুলনায় নেতাজির গলার মালাও হয়তো ছোট হোত না। তবে বুঝতাম, গান্ধী হলেন মুখ্যচরিত্র, নেতাজি নেহাতই পার্শ্বচরিত্র। আমরা কিন্তু পছন্দ করতাম নেতাজিকে। আহা, কত বড় বীর! গান্ধীকে সেই তুলনায় কিরকম ম্যাদামারা লাগত। গান্ধীকে ভক্তি করতে হত বটে, তবে স্বীকার করা ভাল, মন থেকে নয়। ভয়ে। জানকী দাদুর ভয়ে এবং কিছুটা লোভের জন্যও বটে। গান্ধীর স্মরণ-সভায় হাজির হলে বোঁদে আর জিলিপি বাঁধা ছিল। ব্যবস্থাটা নিজের পয়সায় করতেন জানকী দাদু। আমার দেখা সবচেয়ে বড় গান্ধীভক্ত। লোক দেখানো ভক্তি নয়, সত্যিকারের ভক্তি বলতে যা বোঝায়, তাই। গান্ধীভক্ত বা গান্ধীপুজোর কথা উঠলে সবার আগে তাই জানকী দাদুর কথা মনে পড়ে আমার। তাঁর গান্ধীভক্তির কিছু আমার শোনা, কিছু দেখা। দু-চারটে বলি সেই সব ঘটনার কথা।

২

আমার পূর্বপুরুষের ভিটে ছিল ঘলঘলে গ্রামে। জেলা খুলনা, মহকুমা সাতক্ষীরা, থানা দেবহাটা। বর্তমানে সেই গ্রাম বাংলাদেশে। ইছামতী নদীর এপারে টাকী-হাসনাবাদ, ওপারে ঘলঘলে-দেবহাটা। দেবহাটার বিখ্যাত সন্তান পশ্চিমবাংলার প্রথম যুগের মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধান চন্দ্র রায়। উনিশ শ' পঞ্চাশ সালে ভিটেমাটি ছেড়ে আমার বাপ-ঠাকুর্দারা চলে আসেন এপারে। এসে ওঠেন সুন্দরবনের কালীনগরে। বন কেটে সদ্য বসত হয়েছে সেখানে। ইস্কুল-পাঠশালা কিছু নেই। আমার তখন সবে বছর দুয়েক বয়স। আমার ঠাঁই হল মামার বাড়িতে। বরুণহাটে। তারও পাশ ঘেঁসে বইছে ইছামতী, ওপারে পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ)।

অজ পাড়াগাঁ বললেও বোধহয় বরুণহাট গ্রামের সবটুকু বোঝানো যাবে না। পাকা রাস্তা —এমনকি ইঁট বাঁধানো রাস্তা বলেও কিছু ছিল না। যাতায়াতের একমাত্র উপায় ছিল ইছামতীর ওপর দিয়ে নৌকা। পরে অবশ্য মোটর লঞ্চও চালু হয়।

জানকী দাদু ছিলেন এই গ্রামের মানুষ। বড় কোনও পরীক্ষা পাশটাশ করেননি, তবে পড়াশোনার অভ্যাস ছিল, খবরের কাগজ পড়াটা নেশার মত ছিল। নিজের গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়েছেন কিনা সন্দেহ, গান্ধী সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞানের উৎস বলতে খবরের কাগজ। রেডিও তখনো পৌঁছয়নি সে গ্রামে। এহেন মানুষটি যে কীভাবে এক আদ্যন্ত গান্ধীভক্ত হয়ে উঠলেন, তার হদিশ পাইনি কখনো।

নাথুরাম গড্‌সে যেদিন হত্যা করেছিলেন গান্ধীকে, তার দুদিন পর খবর পান জানকী দাদু। তারপর কী ঘটেছিল, সেটা শুনেছিলাম অনেক বছর পরে আমার মামার কাছ থেকে। গান্ধীবাবা মারা গেছেন —প্রথমটায় বিশ্বাস হয়নি, ভেবেছিলেন ভুল লিখেছে খবরের কাগজে। তাই খবরটা পাকা কিনা জানতে রাত পোহাতেই চলে গিয়েছিলেন মাইল চারেক দূরের হিঙ্গালগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়িতে। সেখানে টরে টক্কায় পৌঁছে গিয়েছিল খবরটা। আগেই। পাকা খবরটা তাঁদের কাছে পেলেন জানকী দাদু। উদ্‌ভ্রান্তের মত সারা দুপুরটা নদীর পাড়ে বসে কাটিয়েছিলেন। তারপর হিঙ্গালগঞ্জ বাজার থেকে অশৌচের কোরাধুতি, পৈতে, লোহার চাবি কিনলেন। আসন কিনলেন। একটা কঞ্চিও যোগাড় করে ফেললেন। তারপর পুকুরে স্নান করে অশৌচের পোশাক পরণে ফিরলেন বাড়িতে।

তাঁকে ওই মূর্তিতে দেখে সবাই চমকে উঠল। দু-তিন ঘন্টার মধ্যে আশপাশের গ্রামে রটে গেল খবর — গান্ধীবাবার মৃত্যুতে পিতৃ-অশৌচ পালন করছেন

বরুণহাটের জানকী মণ্ডল। পরের দিন অশৌচে যোগ দিয়েছিলেন পাশাপাশি গ্রামের আরও পাঁচ জন। তাঁরা পোশাক পাল্টালেন, খালি পায়ে থাকলেন, দিনে একবার হবিষ্যি করলেন। হিন্দু আচারে যেমন ক্ষৌরকর্ম হয়, তেমন করে ন্যাড়া হয়ে গেলেন সবাই। একসাথে। পাশাপাশি। ঘাটশ্রাদ্ধও করলেন সবাই একত্রে। তারপর পুরো গ্রামের মানুষকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়ে সম্পন্ন করলেন পারলৌকিক কাজ। ঠিক যেভাবে আপন পিতার শ্রাদ্ধ করে হিন্দুরা।

উনিশ শ' আটচল্লিশে গান্ধী যখন নিহত হন, তখন আমি পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করিনি। তাই নিজের চোখে সেই দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু মামার কাছে যেমন শুনেছি সেই ঘটনার বর্ণনা, তেমন শুনেছি জানকী দাদু এবং সেদিন যাঁরা এই অশৌচ পালনে তাঁর সঙ্গী ছিলেন — তাঁদের দু-চারজনের কাছ থেকেও। জানকী দাদুর পাশেরপাড়া হালদারদের। তাদের চণ্ডীমণ্ডপে যতদূর মনে পড়ে, গোটা তিনেক চরকা ছিল। সবাই একত্র হয়ে কিছুটা সময় দিতেন চরকা কাটার কাজে। সবাই যে সব দিন আসতেন, তা নয়। চাষী মানুষ, মাঠঘাটের নানান কাজকর্ম থাকে সবার। তবু সে সব সামলে সুমলে ওই বৃদ্ধরা সপ্তাহের এক-আধটা দিন আসতেনই। মিষ্টি খাওয়ার লোভ, নাকি গল্প শোনার লোভ — যেটাই কারণ হোক, জানকী দাদুর কাছে মাঝেমধ্যে আমিও হাজির হতাম। আমাকেও চরকা কাটতে বলতেন। দু-চারদিন আমিও বসে পড়তাম।

এই যে গ্রামের মানুষগুলো এক অদ্ভুত উন্মাদনায় গান্ধীর পুজো করতেন, তার কারণ কী? গান্ধী অহিংসার পূজারী, তার জন্য? হতে পারে। গান্ধী ব্রিটিশকে তাড়িয়েছেন, তার জন্য? হতে পারে। কিন্তু গান্ধী ছাড়াও তো ভারতে অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত আরও অনেকে ছিলেন, তাঁদেরকে আমরা সেভাবে মনে রাখি না কেন? আর ব্রিটিশকে দেশ থেকে তাড়ানো? একা গান্ধী ব্রিটিশদের তাড়িয়েছেন দেশ থেকে — কথাটা মানতে পারতাম না। তাহলে ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকীরা যে তাদের প্রাণ দিল, তার কোনও দাম নেই? নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু যে আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে ব্রিটিশকে নাস্তানাবুদ করেছিলেন, তার কোনও দাম নেই?

এসব প্রশ্নের উত্তর জানকী দাদু ঠিকমত দিতে পারতেন না। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের খুঁটিনাটিও জানতেন না। এখন মনে হয়, গান্ধীকেও তিনি জানতেন না, চিনতেন না। তিনি জানতেন 'গান্ধী' নামের এক আবেগকে। গান্ধীর সাজপোষাক, গান্ধীর জীবনযাত্রা, গান্ধী সম্পর্কে প্রচলিত গল্পগাথাই এই আবেগটিকে তৈরি করেছিল। একটা খেঁটো ধুতি পরা, খালি গা, গ্রাম্য চেহারার মানুষ, হ্যাট-কোট-বুট পরা অত্যাচারী ইংরেজদের হারিয়েছে — এই ধারণাটিই

গান্ধীর উচ্চতাকে আকাশচুম্বী করে দিয়েছিল। এই পুস্তকে গান্ধীর এই সাজ-পরিবর্তনের ব্যাপারেও কিছু আলোচনা করেছি। সেখানে দেখিয়েছি, গান্ধীর এই সিদ্ধান্ত কীভাবে তাঁর ইমেজ তৈরিতে সাহায্য করেছে। বলা বাহুল্য, ভারতের রাজনীতিতে অভিনয় করতে নেমে এইসব টুকরো টুকরো কারুকার্যগুলোই সৃষ্টি করেছে গান্ধী মিথ্। এই মিথ্ এখন আস্তে আস্তে ভাঙতে শুরু করেছে, নতুন নতুন তথ্য আসতে শুরু করেছে মানুষের কাছে। সেইসব তথ্যের আলোকে বিচার করা হচ্ছে গান্ধীকে। যে বিচারকে এতদিন চেপে রাখা হয়েছে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার দ্বারা। একটা 'লার্জার দ্যান লাইফ' ছবি তৈরি করে গান্ধীকে দেশের সর্বকালের সবচেয়ে মহান মানুষ হিসেবে প্রচার করা হচ্ছে। এই প্রচার তাঁকে 'মহাত্মা' বা '*Great Soul*' বানাবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের অন্যান্য অনেক স্মরণীয় সন্তানদের দৃষ্টিকটুভাবে তাঁদের প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করেছে। ইতিহাসের কাছে যা অপরাধের সামিল। কারণ, ইতিহাস সত্যকে প্রকাশ করে, মিথ্যা আবেগকে নয়। গান্ধী সম্পর্কে এইসব নতুন নতুন তথ্য যেভাবে উদ্ঘাটিত হচ্ছে, যেভাবে গান্ধী মিথের মায়াজাল ক্রমশ ছিঁড়ে যাচ্ছে, তাতে মনে হয়, 'মহাত্মা' কিংবা 'জাতির জনক' উপাধিগুলি খুব বেশি দিন আর তাঁর নামের আগে ব্যবহার করা যাবে না।

৩

প্রথমেই বলে রাখি, সমালোচনা মানে কিন্তু নিন্দা নয়। গান্ধী চরিত্রে কালি লেপে দেওয়ার জন্যও এই পুস্তকের অবতারণা নয়। অনেক সমালোচক সম্যক বিচার না করে গান্ধী সম্পর্কে চট্জলদি সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়ে নানারকম অপমানজনক কথা এখন বলছেন। গান্ধীকে পুজো করাটা যেমন অতিভক্তির প্রকাশ ও সেইকারণে ইতিহাসবিচ্যুত, তেমনই গান্ধী সম্পর্কে অকারণ ঘৃণা প্রকাশ করাটাও সৎ সমালোচকের কাছে প্রত্যাশিত নয়। গান্ধীকে তাঁর প্রাপ্য সম্মানটুকু দিতে হবে, যে অসম্মান তাঁর প্রাপ্য, সেটা দিতেও দ্বিধা থাকবে না। এটাই সৎ সমালোচকের কর্তব্য। মনে রাখতে হবে, একটি মানুষের মধ্যে সম্মানযোগ্য কিছু না থাকলে আসমুদ্র হিমাচল তাঁর জয়ধ্বনিতে মুখর হত না। সারা পৃথিবীর ব্যাপক সংখ্যক মানুষ তাঁকে নিয়ে আলোচনা করত না শ্রদ্ধার সঙ্গে। আমরা দেখব সেই শ্রদ্ধার কারণগুলোর কতটুকু সত্য আর কতটুকু মিথ্যা। দেখব কতটা এর মধ্যে বাস্তব আর কতটা আরোপিত।

ইদানীং কিছু কিছু গবেষক, গান্ধী চরিত্রের নানান অসঙ্গতি নিয়ে সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। তাঁদের ঘোষিত আদর্শ যদি ইতিহাসের যুক্তিনিষ্ঠ

আলোচনা হত, প্রতিবাদের কিছু থাকত না, কিন্তু মাঝে মাঝে এই প্রশ্ন জাগে — সত্যিই কি এমন মহান আদর্শ নিয়ে গান্ধীচরিত্রের বিশ্লেষণে তাঁরা নেমেছেন? নাকি তাঁদের মূল উদ্দেশ্য গান্ধীর গায়ে নোংরা ছুঁড়ে দেওয়া? এই বিষয়টিও আমরা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করব, যখন যেমন দরকার পড়ে, সেভাবে।

পরবর্তী কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গান্ধী চরিত্রকে বিচার করব আমরা। শুরুটা করব তাঁর মৃত্যু নিয়ে, তারপর তাঁকে নিয়ে তৈরি মিথ নিয়ে। তারপর একে একে তাঁর আদর্শবাদ, তাঁর রাজনীতি, তাঁর পারিবারিক সত্তা এবং তাঁর ব্যক্তিগত জীবনচর্যা নিয়ে। এরপর আলোচনা করব বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে। গান্ধী-মিথ্ ভাঙছে, না ক্রমশ শক্ত হচ্ছে তার ভিত —এই বিষয়টি নিয়েও একটি আলোচনা আছে।

যে উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা হয়েছে বইটি, তা সফল হলে খুশি হব।

বি.জে. - ২২৯
সেক্টর-২, সল্টলেক
কলকাতা-৭০০ ০৯১
দূরভাষ - ৯৮৭৪৬৭৫৬৪৮

সূচি



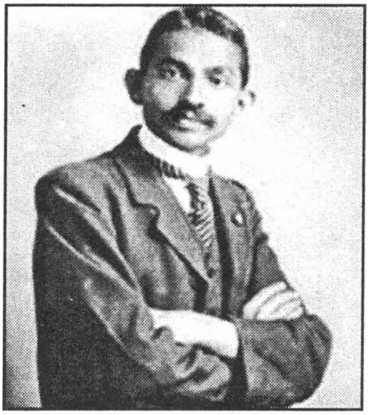
কস্তুরবার সঙ্গে (১৯০৬)



প্রথম যেদিন মাথায় গান্ধী টুপি উঠল (১৯২০)



চার পুত্রকে নিয়ে কস্তুরবা



সাহেব ব্যারিস্টারের বেশে



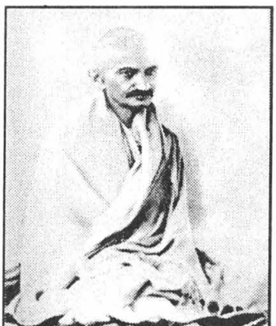
লন্ডন প্রবাসে



সৈনিকের বেশে (জুলু যুদ্ধের সময়)



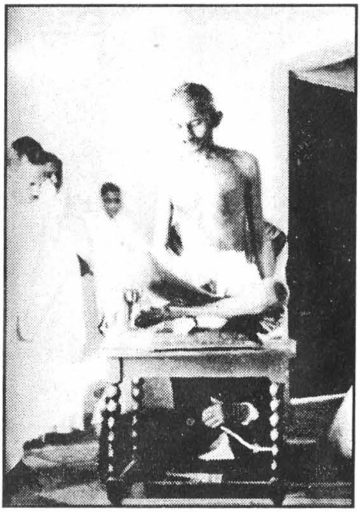
দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন



মাদুরাইতে প্রথম যেদিন কটিবস্ত্র পরলেন



গান্ধীর জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিলাল



অনশনে বসার তোড়জোড় চলছে
(১৯২৪)



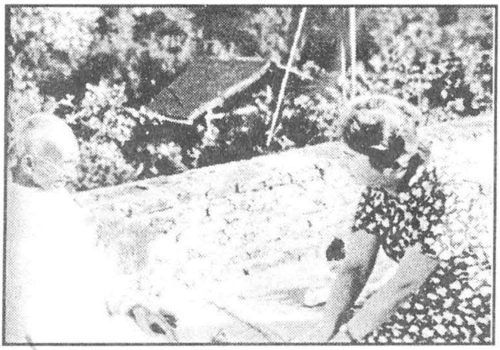
লন্ডনের ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির সামনে
(১৯৩১)



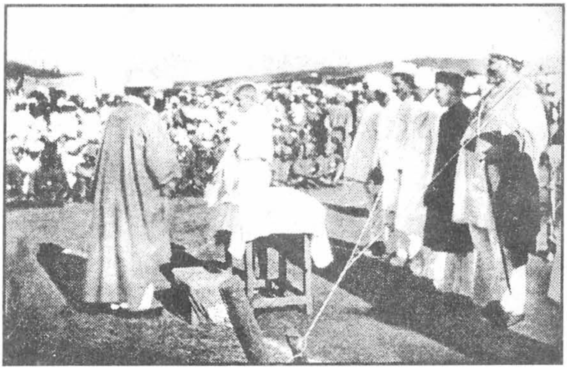
কলকাতায় নেতাজি এবং অন্যান্যদের সঙ্গে (১৯৩৭)



বামে গোখলে এবং ডাইনে কালেনবাখকে নিয়ে



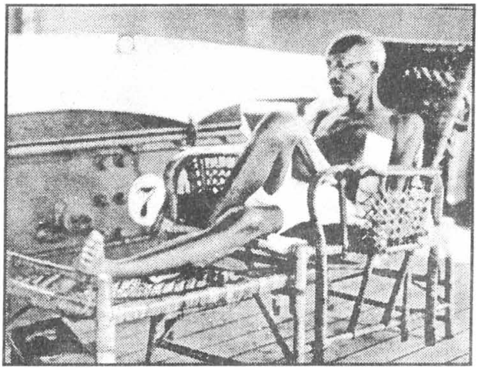
যৌনতা এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে মার্গারেট স্যাঙ্গারের সঙ্গে আলোচনারত



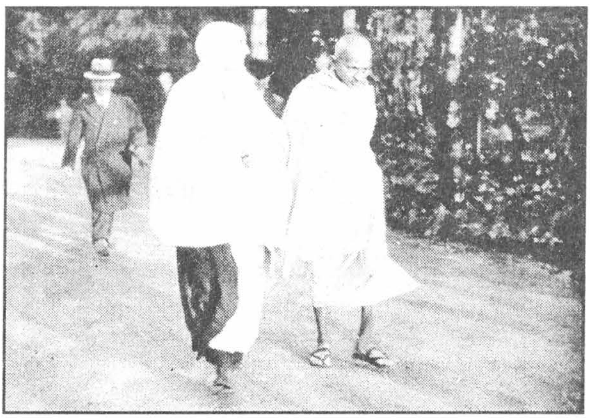
মহম্মদ আলির কাছ থেকে কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্বগ্রহণ (১৯২৪)



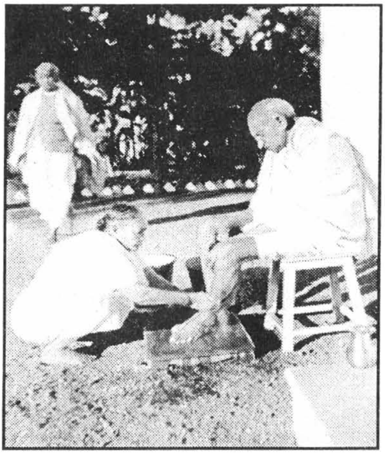
ল্যাঙ্কাশায়ারে বস্ত্রশিল্প কর্মীদের উল্লাস তাঁকে ঘিরে (১৯৩১)



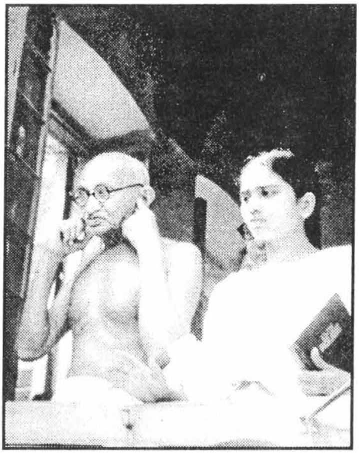
লন্ডনগামী এস এস রাজপুতানা জাহাজের ডেকে রৌদ্রস্নান



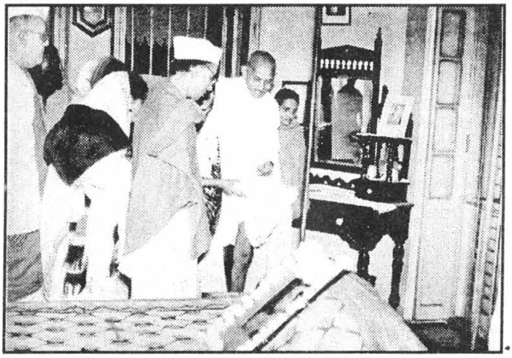
সুইজারল্যান্ডে মীরাবেনের সঙ্গে প্রাতর্ভ্রমণ (১৯৩১)



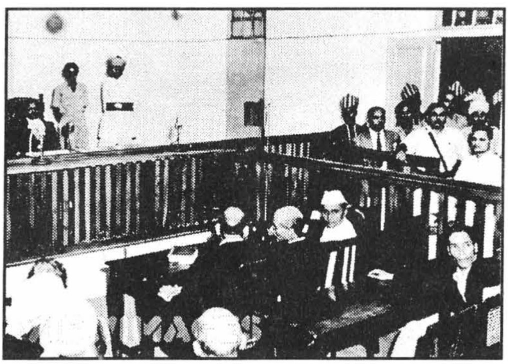
সান্ধ্যভ্রমণের পর স্বামীর পদসেবারত কস্তুরবা



কলকাতায় তীব্র ধিক্কার শুনতে না পেরে কানে আঙুল



শোক জানাতে নেতাজির বাড়িতে (৯ ডিসেম্বর ১৯৪৫)



নাথুরাম গডসের (কাঠগড়ায় একেবারে ডাইনে) বিচার ১৮ই আগস্ট, ১৯৪৮

প্রথম অধ্যায়

শীতের সেই সন্ধ্যা ও গান্ধীর প্রথম মৃত্যু

যবনিকা পাতের আগের মুহূর্ত : সেটা ছিল তাঁর প্রথম মৃত্যু। তাঁর পার্থিব শরীরের অবসান। আজথেকে পঁয়ষট্টি বছর আগে, দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র মাস পাঁচেক পর। তারপর এই দীর্ঘ সময় ধরে আস্তে আস্তে ঘটেছে তাঁর দ্বিতীয় মৃত্যু। আগে বলি, প্রথম মৃত্যুর কথা। ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারির এক শীতের সন্ধ্যা। সময় বিকাল সওয়া পাঁচটা। অকুস্থল দিল্লির বিড়লা ভবন। সেখানে আছেন তিনি। মূল ভবন ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন সংলগ্ন এক প্রার্থনাসভায় যাবেন বলে। তাঁর দুই সঙ্গিনী বাংলার মেয়ে তথা গুজরাটের বধূ আভা গান্ধী (চট্টোপাধ্যায়) এবং গান্ধীর ভাইয়ের নাতনী মনু আছেন তাঁর সঙ্গে। যথারীতি তাঁদের কাঁধে দুই হাত রেখে (ভর দিয়ে নয়, গান্ধী কখনোই ভর দিয়ে চলার মত অসুস্থ ছিলেন না) তিনি হাঁটছেন। তাঁর পিছনে একটি ছোটখাটো জনতা, যার মধ্যে পরিবারের লোকজন আছেন, ভক্তরা আছেন। প্রার্থনা সভাস্থলেও আছেন অনেক ভক্ত। সবাই একটু ব্যস্ত হয়ে হাঁটছেন। কেননা, প্রার্থনাসভার জন্য বেরোতে গান্ধী ইতিমধ্যেই দেরি করে ফেলেছেন।

নাথুরাম বিনায়ক গডসে নামে এক মারাঠি ব্রাহ্মণ যুবক অপেক্ষা করছিলেন পথের পাশে। গান্ধী কাছাকাছি আসতে তিনি এগিয়ে এলেন। সামনে এসে মাথা নুইয়ে প্রণাম জানালেন গান্ধীকে। গান্ধীর পাশ থেকে আভা ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে উঠলেন—'আরে ভাইয়া, বাপুর দেরি হয়ে যাচ্ছে। ওনাকে যেতে দিন।'

নাথুরাম পথ ছাড়লেন না। আভা নাথুরামকে এক পাশে ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। বরং নাথুরামই তাঁকে একপাশে ঠেলে দিলেন। কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন গান্ধীর দিকে। পরমুহূর্তে তাঁর হাতে উঠে এল পিস্তল। একটি বেরেটো এম ১৯৩৪ সেমি অটোমেটিক পিস্তল, যার চেম্বার ছিল .৩৮ বোরের এবং সিরিয়াল নম্বর ছিল ৬০৬৮২৪, সেই পিস্তলটি থেকে গান্ধীর একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে যাকে বলে পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জে গুলি করলেন তিনি— একটা নয়, পরপর তিনটে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয় গান্ধীর। মৃত্যুর আগে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে দুটি মাত্র ছোট্ট শব্দ।

শেষ কথা : শব্দ দুটি যে কী, তা নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ, গান্ধীর জীবনের মতই। বিরোধটা সামান্য নয়। জীবনের শেষ মুহূর্তে উচ্চারণ করা শব্দ দুটি তাঁর

চরিত্রের মতই, তাঁর আদর্শের মতই, তাঁর রাজনীতির মতই ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন। এ যেন গান্ধীর চরিত্রের বহুকথিত ও বহু আলোচিত দ্বৈতসত্তারই প্রকাশ, আরও পরিষ্কার করে বললে গান্ধীর বহুচর্চিত মুখ আর মুখোশের ফারাক। যে ফারাক ব্যাপ্ত আছে তাঁর কথিত আদর্শগত অবস্থান আর তাঁর কৃত বাস্তব অবস্থানের মধ্যে। যে ফারাকের কিছুটা তৈরি করেছেন তিনি নিজে, আর কিছুটা তৈরি করেছে তাঁর বিপুল বিশাল ভক্তসমাজ। কিছু তাঁর শত্রুও।

এই লেখা যদি কোনও অন্ধ গান্ধীভক্তের হাতে পড়ে থাকে, বুঝতে পারছি, ইতিমধ্যে তাঁর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হতে শুরু করেছে। এই কুঞ্চনে কতটা সত্য আছে কিংবা গান্ধী-চরিত্রে আদৌ সমালোচনাযোগ্য কিছু আছে কিনা, সেই প্রসঙ্গে পরে যাচ্ছি। আপাতত, উহ্য থাক সেই কথা। যাওয়া যাক ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারির সেই সন্ধ্যার কথায়। মৃত্যুর আগে ঠিক কোন্ দুটি কথা বলেছিলেন মহাত্মা মোহনদাস করমচন্দ গান্ধী!

পুলিশের কাছে দায়ের করা অভিযোগপত্রে (এফ আই আর) শ্রী নন্দলাল মেহতা লিখেছেন—শব্দ দুটি ছিল 'হে রাম!' কিন্তু গান্ধীর প্রাক্তন ব্যক্তিগত সচিব ভেঙ্কিটা কল্যাণম যিনি উপস্থিত ছিলেন সেখানে, তিনি বলেন, গান্ধীর শেষ কথা দুটি ছিল—'ওহ্ গড (Oh God)!' আর গান্ধীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ও সচিব প্যারেলাল নায়ার আবার বলেন—শব্দদুটি হল—'রাম রাম'। এই তিনটির বাইরে নতুন কোনও কথা কেউ বলেন নি। তবে এই প্রসঙ্গে মৃত্যুর নয় মাস আগে করা গান্ধীর নিজের করা একটি উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন—"যদি আমাকে হত্যাও করা হয়, তাহলেও আমি রাম ও রহিমের নাম উচ্চারণ করা ত্যাগ করব না। আমার মুখে তখনও থাকবে এই শব্দদুটি। কেননা আমার কাছে এঁরা একই ঈশ্বর।" (দ্রষ্টব্য: *Gandhi's Inaudible Last Words* by Mark Lindley)

কিন্তু অন্য দুজনের কথা বাদ দিয়ে নন্দলালের কথাটা (হে রাম) গ্রাহ্য হল কেন? এই শব্দ দুটি কেন এত বিপুলভাবে প্রচার করা হল? কারা করল সেই প্রচার? কী উদ্দেশ্য ছিল এই প্রচারের পিছনে? তার কারণ 'ওহ্ গড্!' শব্দ দুটি ইংরেজি। গান্ধী তাঁর জীবনের শেষ কথা ইংরেজিতে বলেছেন—যে ইংরেজকে তাড়াবার জন্য তাঁর এত লড়াই—ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে এটা মানতে অসুবিধা হচ্ছিল তাঁর ভক্তদের। তা ছাড়া যিনি খাটো ধুতি পরে, চরকা কেটে, কৃচ্ছ্রসাধন করে ভারতাত্মার (Soul of India) প্রতীক হয়েছেন, তাঁর মুখের শেষ কথা ইংরেজি—এ যেন খাপ খাচ্ছিল না ঠিকমত। অতএব বাদ গেল 'ওহ্ গড'।

বাকি থাকে 'রাম রাম'। হিন্দি ভাষায় যাঁদের সামান্য পরিচয় আছে, তাঁরা জানেন, পরপর দুবার 'রাম' কথাটা বলা হয় কখন। বিশেষত আগে 'হে' শব্দটি যোগ না করে। যাঁদের তেমন ঘনিষ্ঠতা নেই হিন্দির সঙ্গে, তাঁদের জ্ঞাতার্থে বলি— খারাপ কিছু বললে কিংবা শুনলে কিংবা করে ফেললে 'রাম রাম' শব্দটি একযোগে উচ্চারিত হওয়াটাই নিয়ম। আশা করি, উদাহরণ দেওয়ার প্রয়োজন হবে না।

এবার 'হে রাম' কথাটি এত বিপুলভাবে প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে দুটি কথা। বলা বাহুল্য, তাঁর নামের সঙ্গে, তাঁর জীবনের সঙ্গে এই শেষের কথাটি যোগ করলে গান্ধী নামক জীবনের বৃত্তটি যেন সম্পূর্ণ হয়। সেই কারণেই এই প্রচার। সেই সঙ্গে ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত 'ভারত' রাষ্ট্রে যে রাম নামের সঙ্গে যুক্ত হিন্দুধর্মকে অবজ্ঞা করা হবে না, সেই বার্তাটিও ছড়িয়ে দেওয়া হল। আর এই প্রচার কারা করল? অবশ্যই দেশের শাসকগোষ্ঠী। কেননা, গান্ধী হত্যার পিছনে যে কোনও রহস্য নেই, এই প্রচার করেও শুধুমাত্র নাথুরাম আর তার কয়েকজন সহকারীর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে এদেশের শাসক শ্রেণি যে পার পাবে না, তা দিনে দিনে স্পষ্টতর হচ্ছিল।

কেন হত্যা : ৩০ জানুয়ারির এই ঘটনার কিঞ্চিদধিক তিন বছর আগে গান্ধী ওপর এক হামলা হয়। দিনটা ছিল ১৯৪৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর। মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য সেবাগ্রাম আশ্রম ছেড়ে মুম্বই যাত্রায় বেরিয়েছেন গান্ধী, পথে একদল বিক্ষোভকারী তাঁকে ঘিরে ধরেছিল। তারা জিন্নাহ্‌র সঙ্গে আলোচনা চালাবার বিরুদ্ধে। এই দলে ছিলেন নাথুরাম। অন্য বিক্ষোভকারীরা নিরস্ত্র থাকলেও নাথুরামের হাতে একটা ছোরা ছিল। পুলিশ তাকে আটকে দিয়ে মজা করার জন্য বলে—'গান্ধীকে তুমি কেন খুন করবে? কাজটা নেতাদের হাতে ছেড়ে দেওয়াই তো ভাল। ...সাভারকরই একদিন লোকটাকে সাবাড় করে দেবে।'

নাথুরাম উত্তরে বলেছিলেন—'সাভারকরের হাতে মরার সম্মান এই লোকটা পাওয়ার যোগ্য নয়। একজন ঝাড়ুদারই এব্যাপারে যথেষ্ট।'

এই ঘটনা থেকে এটা বোঝা যায়, ১৯৪৮-এর অনেক আগে থেকেই গান্ধী আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিলেন। আর এই ব্যাপারটা যে সরকারের অজানা ছিল, তা নয়। গান্ধীর প্রতি, গান্ধীর রাজনীতির প্রতি মানুষের ক্ষোভ যে প্রতিদিন বাড়ছিল, তা-ও জানত সরকার। কিন্তু গান্ধীর জীবন রক্ষার জন্য বড় কিছু ব্যবস্থা কখনোই গ্রহণ করেনি। এই না-করাটা কি তাদের ভুল ছিল, নাকি ইচ্ছা করে তারা এমনটা করেছিল? তার বিচার করার জন্য মৃত্যুর মাত্র দশ দিন আগে তাঁর প্রতি যে আক্রমণটা করা হয়েছিল, তার কথাও উল্লেখ করা যায়।

সেটা ছিল ২০ জানুয়ারি, ১৯৪৮। নাথুরাম গড্‌সে তাঁর ছয় সহযোগী নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন দিল্লির বিড়লা ভবনে। দলের দুই সদস্যকে আলাদা রেখে পাঁচজন সদস্য একটা ট্যাক্সিতে চেপে বিড়লা ভবনের পিছন দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। বাইরে যে দুজন ছিলেন, তাদের মধ্যে একজন মদনলাল পাহোয়া দ্বাররক্ষীকে ঘুষ দিয়ে ও ফটোগ্রাফারের মিথ্যা পরিচয় দিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলেন বটে, তবে সফল হলেন না। উল্টে সেই দ্বাররক্ষী ছোটুরাম সন্দেহ করা শুরু করল মদনলালকে এবং সেই সন্দেহের কথা অন্যদের জানাতে চেষ্টা করল। গান্ধী তখনও আসেননি সভাস্থলে। ফলে ভয় পেয়ে গেলেন নাথুরাম আর তার সঙ্গীরা। তারা পালালেন। সেবারের মত বেঁচে গেলেন গান্ধী। মেরিনা হোটেলে যেখানে উঠেছিলেন নাথুরাম, সেখানেও গিয়েছিল পুলিশ। কিন্তু কাউকে পেল না। পেল নাথুরামের ব্যবহৃত কিছু জামাকাপড় ও চিঠিপত্র। পুলিশ এটাও জেনেছিল যে, এই যুবকরা সবাই মারাঠি। কিন্তু ওই পর্যন্ত। আর কিছু করল না পুলিশ। প্রশ্নটা তাই ওঠে, গান্ধীর মত বড় মাপের একজন মানুষের সুরক্ষার ব্যাপারে পুলিশ বা সরকার এতটা অবহেলা করেছিল কেন?

শুধু এইটুকুই নয়, ৩০ জানুয়ারি গান্ধী হত্যার তিন-চারদিন আগে মুম্বই পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ দিল্লি পুলিশকে জানিয়ে দেয় নাথুরামদের সন্দেহজনক গতিবিধির কথা। তারা যে দিল্লির পথে রওনা দিয়েছেন, সেকথাও জানায়। কিন্তু না দিল্লি পুলিশ, না কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগ আমলই দিল না সে কথায়। অতএব নারায়ণ আপ্তেকে সঙ্গী করে নাথুরাম এলেন, বিড়লা ভবনে প্রবেশ করলেন, কোনওরকম বাধা ছাড়া গান্ধীর সামনে এলেন, তারপর একটা নয়, পরপর তিনটে গুলি করলেন। এরপর বাকি থাকে পালানোর কাজ। চাইলে পালাতেও পারতেন। কিন্তু তিনি পালানো তো দূরের কথা, নিজেই চিৎকার করে ডাকলেন — 'পুলিশ।' বেশ খানিকটা দূরে একজন পুলিশ কর্মী দাঁড়িয়েছিল। ঘটনার আকস্মিকতায় তার তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব। কী করবে বুঝতে পারছে না। নাথুরাম আবার তাকে ডাকলেন এবং তারপর এগিয়ে চললেন সেদিকে। তার কাছে গিয়ে বললেন, "আমি গান্ধীকে হত্যা করেছি। আমাকে গ্রেফতার করো।"

নাথুরাম সবাইকে—সারা পৃথিবীকে এটাই জানাতে চাইছিলেন যে, তিনি সাধারণ খুনী নন, তিনি এক আদর্শের জন্য খুন করেছেন গান্ধীকে। সেই আদর্শ গান্ধীর নীতির হাত থেকে দেশটাকে বাঁচানো। যে কথা পরবর্তী সময়ে গান্ধী হত্যার বিচারকালে নাথুরাম এভাবে প্রকাশ করেছিলেন—'Gandhiji has lived for his ideals and I have died for my ideals' (গান্ধীজি বাঁচতেন তাঁর আদর্শের জন্য, আর আমি মরছি আমার আদর্শের জন্য)।

অতএব সরাসরি কোনও ষড়যন্ত্রে জড়িত না থাকলেও, গান্ধী নামক মানুষটির হাত থেকে মনেপ্রাণে নিস্তার যে চাইছিলেন সরকারের কর্তাব্যক্তিরা, এমন আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সেই আশঙ্কা যে সবসময় চাপা থাকছিল, তাও নয়, উঠছিল। আর তাই প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল আরও বেশি আড়ম্বরের মাধ্যমে আরও বেশি পুজোর মাধ্যমে গান্ধীকে মহামানব বানিয়ে নিজেদের হাত ধুয়ে ফেলা। এরপরই গান্ধীময় হয়ে গেল ভারত। পরবর্তীকালে গান্ধী হত্যার তদন্ত নিয়ে গঠিত জীবনলাল কাপুর কমিশন সরকারকে যে ভাষায় সমালোচনা করেছেন, যে ভাবে গান্ধীর সুরক্ষায় সরকারের গা-ছাড়া ভাবকে দায়ী করেছেন, তাতে একটা প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই ওঠে যে, নাথুরাম গড্সের ষড়যন্ত্রের পশ্চাতে প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ সমর্থন ছিল সরকারের বেশ কিছু কর্তাব্যক্তির। প্রশ্ন ওঠে, কারা সেই কর্তাব্যক্তি? তাঁদের মধ্যে কি নেহরু-প্যাটেলরা আছেন? নাকি অন্য কেউ? এই প্রশ্নের উত্তরে অবশ্য সেই সময়ের সরকার কী ভাবে চলছিল, সেটাও দেখতে হয়। মাত্র মাস পাঁচেক আগে স্বাধীন হয়েছে দেশ। নেহরু-প্যাটেলরা মন্ত্রী হয়েছেন বটে, তবে ক্ষমতা পাননি পুরোপুরি। তখনও লর্ড মাউন্টব্যাটেন এদেশের গভর্ণর জেনারেল। ব্রিটিশ জেনারেল বাউচার এদেশের সেনাপ্রধান। পুলিশে-প্রশাসনে সর্বত্র ব্রিটিশ সরকারের নিযুক্ত ব্যক্তিরা। তাদের মাধ্যমে তখনও সবকিছুতে পূর্ণমাত্রায় ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ। এই নিয়ন্ত্রণ এমনই জমাট ছিল যে, লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কাছে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে পর্যন্ত বারবার অভিযোগ জানাতে হয়েছে যে, ভারত-পাকিস্তান দুদেশেই দাঙ্গা দমনের ব্যাপারে পুলিশ এবং সেনার ভূমিকা ভীষণ খারাপ। তারা দাঙ্গা না থামিয়ে বরং দাঙ্গাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে।

এই যখন ভারতের প্রশাসনিক অবস্থা, তখন নিহত হলেন গান্ধী। পুরো দায়টা ফেলা হল নাথুরাম গড্সে এবং তাঁর সঙ্গীদের ওপর। তৎকালীন সরকারের দায় নিয়ে একটা কথাও কেউ বলল না। অথচ, গান্ধীর সুরক্ষার ব্যাপারে সরকার যে অপরাধমূলক অবহেলা (Criminal negligence) দেখিয়েছে, তার জন্য সরকারকেই সবার আগে কাঠগড়ায় তোলা উচিত ছিল। এই দাবি আর কারও নয়, বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী জয়প্রকাশ নারায়ণ স্বয়ং তুলেছেন এই অভিযোগ। তিনি স্পষ্ট ভাষায় নেহরু সরকার ও সেই সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার প্যাটেলকে গান্ধী হত্যার ঘটনা ঘটতে দেওয়ার জন্য দায়ী করেছেন।

কিন্তু থাক সে প্রসঙ্গ। হত্যার পর গান্ধীর মৃতদেহের পোস্টমর্টেম প্রসঙ্গে আসি। কেননা, সেখানেও আইনকে ভাঙা হয়েছে খেয়াল খুশি মতো —

গান্ধীর মৃতদেহের পোস্টমর্টেম : অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটলে, বিশেষ করে আততায়ীর হাতে নিহত হলে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা একটি স্বাভাবিক নিয়ম এবং তা পুলিশের অবশ্যকরণীয় একটি কাজ। কিন্তু বহু জায়গাতে তল্লাশি চালিয়ে, বহু নথিপত্র ঘেঁটে, বহু গান্ধীবাদী মানুষের সঙ্গে কথা বলেও আমি জানতে পারিনি, গান্ধীর মৃতদেহের পোস্টমর্টেম আদৌ হয়েছিল কিনা। যদি হয়ে থাকে, তবে কী লেখা ছিল সেই রিপোর্টে। যে অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়েছিল গান্ধীকে, সেই অস্ত্রের ধরণটাই বা কী ছিল। সমস্ত ব্যাপারটার ওপর ইচ্ছাকৃত এক কালো পর্দা যেন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই পর্দা চাপানোর উদ্দেশ্যটা আমার কাছে পরিষ্কার নয়। হয়তো তাঁকে মৃত্যুঞ্জয়ী মহামানব বানাবার এ আর এক প্রয়াস। হয়তো খ্রিস্টের মত পুনরুত্থান না হোক, সেই ধরণের কিছু একটা করার প্রয়াস ছিল কারো কারো মধ্যে।

কিছুদিন আগে এম এস সুব্রহ্মণ্যম নামে এক দক্ষিণী সাংবাদিক তথা মানবাধিকার নেতার সৌজন্যে এই প্রশ্নের উত্তর মিলেছে। বিগত ৩০.১২.২০০৬ সালে তথ্য জানার অধিকার আইনের বলে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দফতরে একটি আবেদন পেশ করেন। এই আবেদনে তিনি মহাত্মা গান্ধীর মৃতদেহের পোস্টমর্টেম রিপোর্টের একটি কপি চেয়ে পাঠান। প্রায় তিন বছর অপেক্ষার পর এবং সেন্ট্রাল ইনফর্মেশন কমিশনের কাছে অনেক অভিযোগ জানাবার পর অবশেষে পাওয়া যায় সেই ময়নাতদন্তের রিপোর্টের একটি কপি। পাঠকের জ্ঞাতার্থে পুরো রিপোর্টটি নীচে প্রকাশ করব। তবে তার আগে বলি, সাধারণভাবে পোস্টমর্টেম করতে গেলে শব-ব্যবচ্ছেদ করতে হয়। গান্ধীর শবদেহের ক্ষেত্রে তা কিন্তু করা হয় নি। যিনি পোস্টমর্টেম করেছিলেন, সেই ডাক্তার লেফ্‌টেনান্ট কর্ণেল বি এল তানেজা শবদেহটি দেখে এবং ঘটনার বিবরণের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে একটি রিপোর্ট দিয়েছেন। আর এই রিপোর্টটিই জমা দেওয়া হয়েছিল গান্ধী হত্যার বিচারের জন্য গঠিত বিশেষ আদালতের কাছে। এবার সেই রিপোর্টের পুরোটা তুলে ধরছি।

<u>Postmortem Report of Mahatma M.K.Gandhi</u>

Examined the body of Mahatma M.K.Gandhi at 6.30 a.m. on Saturday, the 31st January 1948 at Birla House, near Delhi.

The body was identified by Dr. Jivraj Mehta, Director General of Health Services, Government of India.

The following wounds were found on examination:

1. Punctured wound oval in shape 1/2" X 1/4" in size penetrating in nature on the right side of the chest in the 4th intercostal space 1" above the nipple and 4" from the mid line.

   There was no evidence of any exit wound in connection with this injury. Wound dangerous to life. Possibly inflicted by a shot from pistol, a dangerous weapon.

2. & 3. Punctured wound oval in shape 1/2" X 1/4" in size penetrating in nature on the right side of right sternum in the 9th interecetal space 1" to the right of the mid line. Direction of the wound was obliquely downwards and outwards making an exit wound oval in shape 1/3" X 1/4" in size situated 1" above the right lilac crest and 1" to the right of spinal column.

   Wound dangerous to life, possibly inflicted by a shot from pistol, a dangerous weapon.

4. & 5. Punctured wound oval in shape 1/2" X 1/4" in size penetrating in nature on the right side of the abdomen, 2" above the unbilious and 1" to the right of the midline. Direction of the wound was obliquely downwards and towards making an exit wound oval in shape 1/3" X 2" in size situated 1" above the right lilac crest and 2 inches to the right of spinal column.

Wound dangerous to life. Possibly inflicted by a shot from pistol, a dangerous weapon.

I was shown thė case of a pistol cartridge which was recovered from the garments of Mahatma Gandhi.

These garments were also seen by me and found to be soaked in blood.

Cause of Death

In my opinion, Mahatma Gandhi's death was caused by shock and internal Haemorrahage due to the above mentioned injuries inflicted on him by bullets fired from a pistol.

Erwin Hospital, New Delhi

sd/. B.L. Taneja
Ex. Col.
Medical Superintendent
and Addl. Civil Surgeon

গান্ধী হত্যার প্রতিক্রিয়ায় সারা দেশ নাথুরাম গড্‌সের প্রতি ঘৃণায় এবং ধিক্কারে ফেটে পড়ে। এই পুস্তকের ভূমিকায় বাংলার এক অখ্যাত গ্রামের ততোধিক অখ্যাত এক মানুষ এবং তাঁর কয়েকজন সঙ্গী গান্ধীর মৃত্যুর পর কী করেছিলেন তা আগে বলেছি। এই ছবি ছিল সারা ভারত জুড়ে। আরও উল্লেখ করার মত বিষয় হল, গান্ধীর প্রদর্শিত পথ ধরে যে সর্বত্র অহিংসার পথে এই ঘৃণা প্রকাশের পালা চলেছিল, তা নয়। নাথুরাম ব্রাহ্মণ সন্তান ছিল, অতএব সমস্ত ব্রাহ্মণই গান্ধীর মৃত্যুর জন্য দায়ী, এই ধুয়ো তুলে মারাঠী ব্রাহ্মণদের ওপর আক্রমণ নেমে আসে। তাদের বহু ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়, আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। গান্ধীর অহিংস অনুরাগীদের সহিংস আক্রমণে বেশ কয়েকজন ব্রাহ্মণ প্রাণ হারান। অনেক ব্রাহ্মণকে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। সেখানে অনেকসময় চিকিৎসকরাও এতটাই গান্ধীশোকে আচ্ছন্ন ছিলেন যে, ওইসব আহতদের চিকিৎসাও করতে চাননি। এই আক্রমণ বেশি করে ভোগ করতে হয়েছিল মহারাষ্ট্রের চিৎপবন ব্রাহ্মণদের। যেহেতু নাথুরাম এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন।

শোকের বহিঃপ্রকাশ এমনই তীব্র ছিল যে, 'কেন গান্ধীজিকে হত্যা করেছি' এই সম্পর্কে আদালতে যা বলেছিলেন নাথুরাম গড্‌সে, তা বহু বহু বছর পর্যন্ত জনসাধারণের সামনেও আসতে দেওয়া হয়নি। গান্ধীর পোস্টমর্টেম সম্পর্কে বলতে গেলে নাথুরামের বক্তব্য জানাটা খুবই জরুরি। কেননা, এই বক্তব্যের মধ্যে আমরা খুঁজে পাই গান্ধীর দ্বিতীয় মৃত্যুর বীজও। যদিচ, অনেকগুলি কারণের মধ্যে নাথুরাম কয়েকটি মাত্র দিক নিয়ে বিচার করেছিলেন গান্ধীর। এবার বলব সেই কথা। বলব, কেন গান্ধীকে সেদিন নিহত হতে হয়।

নাথুরাম গডসের জবানবন্দি : গান্ধী হত্যার ন'মাস পর, ৮ নভেম্বর ১৯৪৮-এ নাথুরাম আদালতে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। পরিষ্কারভাবে টাইপ করা কাগজটি পড়তে পড়তে অত্যন্ত শান্তভাবে তিনি ব্যাখ্যা করতে থাকলেন কেন গান্ধীজিকে হত্যা করেছেন তিনি। তাঁর সেই বক্তব্য ছিল নব্বুই পৃষ্ঠাব্যাপী এবং দীর্ঘ পাঁচ ঘন্টা ধরে তিনি রাখেন সেই বক্তব্য। ভারত সরকার গান্ধী হত্যার বিচার গোপনে করেছিল। আত্মপক্ষ সমর্থনে নাথুরাম যা বলেছিলেন, তা এদেশে প্রচার করা হয়নি বহু বছর যাবৎ। এখন অবশ্য সহজেই পাওয়া যায় ইন্টারনেটে। সেটা পড়লে নাথুরামের গভীর দেশপ্রেম, ভারতের আবহমানকালের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার তীব্রতা খুব সহজেই অনুভব করা যায়। নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন — 'As I grew up, I developed a tendency to free thinking unfettered by any superstitious

allegiance to any isms, political or religious. That is why I worked actively for the eradication of untouchability and the caste system based on birth alone. I openly joined anti-caste movements...' অর্থাৎ, জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে এবং অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলনে আমি গভীরভাবে জড়িত ছিলাম। গণভোজে উচ্চনীচ জাতি নির্বিশেষে অংশ নিয়েছি। দাদাভাই নওরোজি, বিবেকানন্দ, গোখেল, তিলক-এর ভাষণ ও রচনা গভীর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে পাঠ করেছি। পাঠ করেছি ভারতের ইতিহাস, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, রাশিয়ার ইতিহাস। সমাজতন্ত্র এবং মার্কস্‌বাদও অধ্যয়ন করেছি। কিন্তু সবার ওপর গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করেছি বীর সাভারকর এবং গান্ধীজির রচনা ও বাণী। আমি মনে করি, এই দুই চিন্তাবিদ ভারতের মানুষের ওপর গত ত্রিশ বছরে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছেন।' সংক্ষেপিত আকারে নাথুরামের সেই জবানবন্দি এখানে উদ্ধৃত করছি:

> ''ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে গান্ধীজির প্রভাব বাড়তে শুরু করে ১৯২০ সালে বালগঙ্গাধর তিলকের মৃত্যুর পর এবং শীঘ্রই তিনি কংগ্রেস দলের সর্বেসর্বা হয়ে যান। জনতাকে জাগানোর জন্য তাঁর অহিংসা ও সত্যের প্রতি গভীর আস্থার আহ্বান অসাধারণ প্রভাব ফেলেছিল মানুষের মনে। এই দুটি বিষয়ে কোনও কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির কোনও বিরোধ থাকতে পারে না। কারণ, এই দুটি বিষয়ই নূতন কিংবা তাঁর আবিষ্কৃত ছিল না। কিন্তু এই দুই বড় আদর্শ প্রতিদিনের জীবনে মেনে চলা সম্ভব নয়। আপনজনের ও দেশের প্রতি শ্রদ্ধা, কর্তব্য এবং ভালবাসা কখনও কখনও অহিংসাকে অস্বীকার করে বল প্রয়োগকে অবশ্যগ্রহণীয় করে তোলে। আমি কখনোই মনে করি না যে, কোনও আগ্রাসনকে ঠেকাতে গেলে যদি অস্ত্রধারণ করতে হয়, তবে তা অনুচিত কাজ হবে। ভয়ঙ্কর যুদ্ধে রাম রাবণকে পরাজিত করেছিলেন ও সীতা উদ্ধার করেছিলেন। কৃষ্ণ কংসকে হত্যা করেছিলেন তার অত্যাচার বন্ধ করার জন্য। অর্জুন তাঁর বহু বন্ধু ও পরিজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে ও তাদের হত্যা করতে বাধ্য হয়েছিলেন, এমন কি, পরম শ্রদ্ধেয় ভীষ্মের বিরুদ্ধে পর্যন্ত অস্ত্রধারণ করেছিলেন। কেননা, ভীষ্ম ছিলেন অত্যাচারীদের পক্ষে। অথচ, এই রাম, কৃষ্ণ, অর্জুনকে হিংসার অপরাধে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করেছেন গান্ধীজি। সাম্প্রতিক ইতিহাসে ছত্রপতি শিবাজীর গৌরবময় সংগ্রামকে তিনি সমালোচনা করেছেন। শিবাজী ছাড়াও রাণা প্রতাপ ও গুরু গোবিন্দ সিংকে বলেছেন পথভ্রষ্ট দেশপ্রেমিক (misguided patriots)। একথা বলে তিনি আত্মগর্ব জাহির করেছেন।

তাঁর এই সমস্ত বক্তব্য আত্মবিরোধী। সত্যের সপক্ষে, অহিংসার সপক্ষে তাঁর এই অতিরিক্ত আস্থা এই দেশের অনেক বিপদের কারণ হয়েছে। বিগত বত্রিশ বছর ধরে চলে আসা তাঁর এইসব কাজকর্ম শেষপর্যন্ত পর্যবসিত হয়েছে মুসলিমদের স্বার্থের সপক্ষে শুরু করা তাঁর শেষ অনশনে। এই ঘটনা আমাকে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে যে, এই মানুষটিকে আর বাঁচতে দেওয়া যায় না।

দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন সময়ে সেখানকার ভারতীয়দের জন্য অনেক ভাল কাজ করেছেন গান্ধী, কিন্তু ভারতে আসার পর তাঁর মধ্যে একধরণের চূড়ান্ত আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা গড়ে উঠল। তিনি নিজেই নিজের কাজের বিচারক হয়ে গেলেন। তিনি যেটা ঠিক বলবেন সেটা ঠিক, যেটা ভুল বলবেন সেটা ভুল —এই মানসিকতা পেয়ে বসল তাঁকে। তিনি তাঁর কাজেকর্মে বুঝিয়ে দিলেন —যদি দেশ তাঁর নেতৃত্ব চায় তবে তাঁর সমস্ত কাজকে বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে হবে। যদি কংগ্রেস দল তাঁর এই কথা না মানতে চায়, তবে তিনি দলের থেকে দূরে চলে যাবেন ও নিজের মত চলবেন। যে নেতার দৃষ্টিভঙ্গি এমন কট্টর, সেখানে মধ্যপন্থা বলে কিছু থাকতে পারে না। অতএব আত্মসমর্পণ করল কংগ্রেস। তারা গান্ধীর যাবতীয় পাগলামি, খামখেয়ালিপনা, উদ্ভট চিন্তাধারা ও অবৈজ্ঞানিক দর্শনকে সমর্থন জানিয়ে যেতে বাধ্য হল। তাঁর ভাব ছিল, একমাত্র তিনিই সব জানেন, সব বোঝেন। তিনিই সব ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ বিচারক। কোন বিষয়ে আন্দোলন হবে, কোন পদ্ধতিতে হবে, কখন শুরু হবে, কখন শেষ হবে—সব ব্যাপারে তাঁর মতই প্রথম, তাঁর মতই শেষ। জয়-পরাজয় নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা নেই, তাঁর কথা হল—সত্যাগ্রহী কখনো ভুল করে না।

এভাবে মহাত্মা তাঁর নিজের জজ্ হলেন, জুরি হলেন। তাঁর ছেলেমানুষের মত পাগলামি আর একগুঁয়েমির বিরুদ্ধে কারও কিছু বলার সাহস ছিল না। এই একনায়কতন্ত্র আর দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্য তিনি একের পর এক ভুল করতে লাগলেন, একের পর এক অকৃতকার্যতা এবং ক্ষতির পর ক্ষতি আসতে থাকল দেশের সামনে। তাঁর মুসলিম তোষণ নীতি ক্রমশই বল্গাহীন হতে থাকল, যার প্রমাণ ভারতের রাষ্ট্রভাষা নির্বাচনের প্রশ্নেও। মুসলমানদের খুশি করার জন্য রাষ্ট্রভাষা হিসেবে হিন্দির বিরুদ্ধাচরণ করা শুরু করে দিলেন গান্ধীজি। গান্ধীজির যারতীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা হিন্দুদের ক্ষতিসাধন করেই।

১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাস থেকে মুসলিম লীগের নিজস্ব সেনা (Private Army) হিন্দু নিধন শুরু করল। কিন্তু গভর্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ১৯৩৫-এর জন্য ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলের এই খুন-ধর্ষণ-লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে কিছু করার

ছিল না। বাংলা থেকে করাচী সর্বত্র বইতে লাগল রক্তের ধারা, হিন্দুরা কিছু করতে পারল না। ১৯৩৫-এর সেপ্টেম্বরে গঠিত সরকারের মুসলিম লীগ সদস্যরা শুরু থেকেই ওই সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করছিল, কিন্তু যত তারা শত্রুতা করতে থাকল, গান্ধী ততই তাদের প্রেমে বেশি করে পড়তে থাকলেন। এরপর লর্ড ওয়াভেল চলে গেলেন, তার জায়গায় এলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। মাউন্টব্যাটেনের দৌত্যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টির প্রস্তাবে সমর্থন জানাল।

ব্রিটিশ সরকার ঠিক করে দিয়েছিল ৩০ জুন ১৯৪৮-এ ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। কিন্তু মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা এত তাড়াতাড়ি সফল হয়ে গেল যে, দশ মাস আগে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট তারিখেই দিয়ে দেওয়া হল স্বাধীনতা। যে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির বুদ্বুদ এতদিন বিরাট করে তৈরি হয়েছিল, তা শেষ পর্যন্ত ফেটে গেল। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হল। এরপরেও গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস বড় মুখে বলতে থাকল—অনেক আত্মাহূতি দিয়ে নাকি স্বাধীনতা এনেছে তারা। কী আহূতি দিয়েছে কংগ্রেস?

গান্ধীর এবারের অনশনে একটা দাবি ছিল দিল্লির যেসব মসজিদে হিন্দু শরণার্থীরা পাকিস্তান থেকে এসে উঠেছে, তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দিতে হবে। এই হিন্দুরাই যখন ভয়ঙ্কর ভাবে আক্রান্ত হচ্ছিল পাকিস্থানে, তখন কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে একটা শব্দও বেরিয়ে আসেনি প্রতিবাদে। তাঁর যাবতীয় শর্ত চাপানো ছিল হিন্দুদের ওপর, মুসলমানদের ওপর কোনও শর্ত তিনি কখনও রাখেননি।

গান্ধীকে জাতির জনক বলা হয়। যদি সত্যিই তিনি জাতির জনক হয়ে থাকেন, তবে আমি বলতে বাধ্য যে, পিতার কর্তব্য তো পালন করেনই নি তিনি, বরং জাতির প্রতি ক্রমান্বয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে গেছেন এবং শেষপর্যন্ত নিজেকে প্রমাণ করেছেন পাকিস্তানের পিতা হিসেবে।

সংক্ষেপে বলি, আমি মনে মনে অনেক ভেবেছি এবং কল্পনা করেছি যে, যদি আমি গান্ধীজিকে হত্যা করি, তাহলে আমি পুরোপুরি শেষ হয়ে যাব। দেশের মানুষ আমাকে প্রবল ঘৃণা করবে এবং যে সম্মান আমি এতদিন ধরে অর্জন করেছি এবং যে সম্মানকে আমি আমার জীবনের চেয়েও মূল্যবান মনে করি — তা একদম শেষ হয়ে যাবে। তবু আমি মনে করি, এর ফলে দেশ এগিয়ে যাবে সত্যকারের শক্তিশালী এক জাতিগঠনের পথে।

এভাবে সমস্ত রকমের চিন্তাভাবনা করে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। কিন্তু কারও সঙ্গে কোনও আলোচনা আমি করিনি। আমি আমার এই দুটো হাতে

শক্তি সঞ্চার করে গান্ধীজিকে গুলি করেছি। আমি আবারও বলি, আমার বন্দুকের গুলি আমি এমন একজন ব্যক্তিকে লক্ষ করে চালিয়েছি, যার নীতি ও কাজ দেশের কোটি কোটি হিন্দুর সর্বনাশের কারণ হয়েছে। দেশের আইনে এমন কোনও সংস্থান নেই যার জোরে দেশের সর্বনাশকারী এমন একজন মানুষকে শাস্তি দেওয়া যায়। আর সেজন্যেই এই শাস্তি আমি নিজে দিয়েছি। কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে কোনও অভিযোগ আমার নেই, কিন্তু আমি বলতে বাধ্য যে, ভারতের বর্তমান সরকার যার সমস্ত নীতি গান্ধীর নির্দেশে নেওয়া হয়, সেই সরকারের মুসলিম তোষণ নীতির প্রতি আমার কোনও শ্রদ্ধা নেই।

গভীর দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, প্রধানমন্ত্রী নেহরু তাঁর সুবিধামত ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা তৈরি করে নেন। ভারতের ব্যাপারে তিনি ঘোর ধর্মনিরপেক্ষ, অথচ, পাকিস্তানের ব্যাপারে তিনি ঘোর ধার্মিক। আর এইসব কাজ করতে তাঁর সুবিধা হয়েছে গান্ধীর প্রবল মুসলিম তোষণ নীতির জন্য।

মহামান্য আদালতের কাছে আমি জানাচ্ছি যে, গান্ধী-হত্যার সব দায় আমার। আমার একার। এই কাজের জন্য যে শাস্তি আমার প্রাপ্য, তা নিতে আমি প্রস্তুত। আমি আরও বলতে চাই, কোনও দয়া বা করুণা যেন আমাকে দেখানো না হয়। কারও কাছেই আমি কোনও দয়া ভিক্ষা করছি না। চতুর্দিক থেকে আমার এই কাজের প্রচুর সমালোচনা হচ্ছে, আমি জানি। কিন্তু তাতে আমার বিবেক, এই কাজের পশ্চাতে আমার যে নীতিগত অবস্থান ছিল, তার একটুও নড়চড় হয়নি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একদিন সত্যকারের সৎ ইতিহাসবিদ্‌রা আমার এই কাজের যথার্থতা অনুধাবন করবেন এবং সেই অনাগত ভবিষ্যতে আমার এই কাজের সঠিক মূল্যায়নও হবে।"

অসঙ্গত বিচার প্রক্রিয়া : অত্যন্ত অসঙ্গতভাবে করা গোপন আদালতের বিচারে গান্ধী হত্যার দায়ে নাথুরাম গড়্‌সের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয় ৮.১১.১৯৪৯ তারিখে। সাতদিন পর ১৫.১১.১৯৪৯ তারিখে আম্বালা জেলে ফাঁসি হয় তাঁর। একইসঙ্গে নারায়ণ আপ্তেরও প্রাণদণ্ড কার্যকর হয়। কিন্তু 'অসঙ্গত বিচার' কথাটি ব্যবহার করলাম কেন? এইজন্যই করলাম, প্রথমত, গোপনে বিচার চালাবার মত অপরাধ এটি ছিল না। দ্বিতীয়ত, দেশের মানুষের অধিকার ছিল এই হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে জানার। তৃতীয়ত, গড়্‌সে তাঁর জবানবন্দীতে যে অভিযোগগুলি তুলেছিলেন, সে সম্পর্কে সরকারি উকিল কোনও কথাই বলেননি। চতুর্থত, তাঁর বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগগুলির জবাবে গড়্‌সে যে উত্তর দিয়েছিলেন, যার মধ্যে হত্যার ব্যাপারে অনেক খুঁটিনাটি অসঙ্গতি ছিল, সে বিষয়টি বিচারক সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়েছিলেন। একটি হত্যাকাণ্ডের বিচারে শব ব্যবচ্ছেদের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট একান্ত জরুরি। অথচ,

গান্ধী হত্যার পর যে পোস্টমর্টেম রিপোর্টটি তৈরি হল, সেখানে শব-ব্যবচ্ছেদের কোনও কথাই নেই। কেন করা হয়নি শব ব্যবচ্ছেদ? তা কি এই জন্য যে, মৃতদেহটি মহাত্মা গান্ধী নামক এক ব্যক্তির? তা কি করা হয়নি এই কারণে যে মৃত গান্ধীর শরীরে কাটাকুটি চালাবার সাহস কিংবা ইচ্ছা কারও ছিল না? যে কারণেই এমনটা হয়ে থাকুক না কেন, সেটা ঘোর বেআইনি কাজ হয়েছে। পৃথিবীতে এমন বহু গোয়েন্দা গল্প আছে যেখানে কেউ খুন হলেন আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিতে, অথচ পরে দেখা গেল, তাঁর ভিসেরাতে বিষ আছে এবং মৃত্যুর আসল কারণ সেই বিষ। ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর তাঁর মৃতদেহের শব ব্যবচ্ছেদ হয়েছিল। দেখা গিয়েছিল, তাঁকে লক্ষ্য করে সবকটি গুলি যে সামনে থেকে এসেছিল, তা নয়। গুলি এসেছিল এবং তা তাঁর শরীরে প্রবেশ করেছিল পিছন দিক থেকেও। অথচ, খুনীরা ছিল তাঁর সামনে। অন্তত সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী। পিছন থেকে তাহলে অন্য কেউ কি গুলি করেছিল। কে সে? এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। তবু বলি, এক অভিযুক্তের উকিল পি এন লেখি এই বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ সওয়াল করেছিলেন আদালতে এবং উপসংহার টেনেছিলেন এই বলে যে, ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের আসল অভিযুক্ত তখন দিল্লি থেকে কয়েক শত মাইল দূরে বহাল তবিয়তে ছিলেন।

যদি এমন কিছু ঘটে থাকে মহাত্মা গান্ধীর বেলায়! গান্ধীর ক্ষেত্রে এই ভাবনাকে কষ্টকল্পনা মনে হতেই পারে, কিন্তু আইনের চোখে এই কষ্টকল্পনারও মূল্য আছে। এই এক সংশয়ের ফাঁক গলে ফাঁসির দড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে পারতেন নাথুরাম ও নারায়ণ। এই এক প্রশ্নের জোরে ব্যাপ্ত হতে পারত গান্ধী হত্যার চক্রান্তের পরিধি। তা হয়নি। হতে দেয়নি গোপনে বিচার চালাবার সিদ্ধান্ত। যে সিদ্ধান্তের অঙ্গ হিসেবে প্রথম থেকেই নির্দিষ্ট করা ছিল কী রায় দেবেন বিচারক, সেই বিষয়টিও।

এভাবে গান্ধীহত্যার বিচারকে ধামাচাপা দিয়ে, গান্ধী নামক ব্যক্তিটির সব ব্যাপারে খবরদারির হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে স্বস্তির শ্বাস নিলেন ভারত সরকারের কর্তাব্যক্তিরা। জীবিত জুলিয়াস সীজারের চেয়ে মৃত জুলিয়াস সীজারের ক্ষমতা যেমন বেশি ছিল, তেমনই জীবিত গান্ধীর চেয়ে মৃত গান্ধীকে অসীম ক্ষমতাবান হিসেবে তৈরি করার লক্ষে পূর্ণ-উদ্যমে কাজ চালু হয়ে গেল অতঃপর। সুযোগ ছিল অনন্ত। ভারত দেশটা তো আর ছোট নয়। অজস্র গ্রাম, অজস্র নগর-শহর-বন্দর। সব জায়গার প্রধান প্রধান রাজপথগুলি তাঁর নামে নামাঙ্কিত হল, তাঁর স্মৃতিরক্ষায় অজস্র ভবন তৈরি হল, আদালতে বিচারকদের মাথার

ওপরে তাঁর ছবি প্রতিষ্ঠা পেল, দেশের কারেন্সি নোটে তাঁর ছবি মুদ্রিত হল। এক কথায় গান্ধীময় হয়ে উঠল ভারত।

প্রশ্ন উঠতে পারে—এবং উঠছেও যে, এদেশে কি গান্ধী ছাড়া আর কেউ নেই? আর কোনও মহাপুরুষ কি জন্মাননি এদেশে? গান্ধী না হয় হাজার টাকা, পাঁচশ' টাকার নোটের ওপর থাকলেন, বাকিগুলির কোনও একটির ওপর কি অন্য কেউ থাকতে পারেন না? এর উত্তর—না পারেন না। কিছুদিন আগে সরকারের কাছে গিয়েছিল এমন একটি প্রস্তাব। সরাসরি নাকচ করে দিয়েছে সরকার। বলেছে, গান্ধীর সমান উচ্চতার মানুষ আর কাউকে পাওয়া যায়নি এই দেশে, অতএব গ্রহণ করা হল না এই প্রস্তাব। অর্থাৎ গান্ধী হলেন এভারেস্ট পর্বত শৃঙ্গ, আর বাকিরা ঘাটশিলার ফুলডুংরি গোছের টিলা।

ধৃষ্টতার যে স্বাভাবিক সীমা থাকে, সেটিও ভারত সরকারের নেই। এর পিছনে গান্ধীর প্রতি তাদের গভীর প্রেম আছে —এমনটা ভাবা ভুল। আসলে গান্ধীকে ভগবান বানিয়ে, নিজেদের কৃতকর্মের সব দায় তাঁর ওপর চাপিয়ে নিষ্কৃতি পাওয়ার লোভে এমনতর গান্ধীভজনা। সেজন্যেই এমনভাবে বিরাট বিশাল গান্ধী মিথ তৈরি করা।

পরের অধ্যায়ে আমরা সেই গান্ধী-মিথ নিয়ে আলোচনা করব। দেখব, কিভাবে সেই মিথ ভেঙে গিয়ে মহাত্মা মোহনদাস কর্মচন্দ গান্ধীর দ্বিতীয় মৃত্যু হচ্ছে। নাথুরাম গড্‌সে তাঁর জবানবন্দিতে বলেছিলেন —একদিন ইতিহাস তাঁর কাজের যথার্থ মূল্যায়ন করবে। সেই মূল্যায়নের কাজ যে শুরু হয়েছে, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। সেই কথাই বলব এবার।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গান্ধী মিথ : সৃজনের পটভূমি ও বিস্তার

মিথ কাকে বলে : মিথ শব্দটির সাধারণ অর্থ হল গল্প, যা সত্যি হতেও পারে, না-ও হতে পারে। আগে শব্দটি প্রয়োগ করা হত প্রাচীনকালের কোনও ঘটনা বা কাহিনিকে নিয়ে। কিন্তু বর্তমানে এই শব্দটি আধুনিক সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয় নিয়েও প্রযোজ্য হয়। যেমন, সোবিয়েত শাসনে মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র আর আচ্ছাদনের কোনও সমস্যা ছিল না, এমন একটি ধারণা প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল। পরবর্তীকালে দেখা গেল যে এই ধারণার সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিল নেই। অতএব ভেঙে গেল একটা সোবিয়েত মিথ। এর মানে এটাই দাঁড়ায়, মিথের সঙ্গে বাস্তবের কোনও সম্পর্ক নেই। কোনও প্রমাণ বা রেকর্ড ছাড়াই মিথ তৈরি হতে পারে। হয়ও। অবশ্য এটা কখনো বলছি না যে, মিথের পিছনে কোনও সত্য নেই। সত্য থাকতেও পারে, না-ও পারে। তবে সেটা অপ্রাসঙ্গিক। কিছুটা সত্যি আর বাকিটা মিথ্যে—এমন ব্যাপার নিয়েও তৈরি হয় মিথ্। বাংলা প্রবাদ 'তিলকে তাল করা'র পদ্ধতিতে। পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে সবার সঙ্গে নানান মিথ জড়িয়ে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে হিন্দুধর্মে এক রকমের মিথ, ইহুদি-খ্রিস্টানদের মধ্যে আর একরকমের মিথ, মুসলমানদের ধর্মশাস্ত্রে আবার এক রকমের। তিনটে কাহিনিই সত্যি হতে পারে না। কারণ একটার থেকে আর একটার পার্থক্য বিশাল। যদিও সব ধর্মের বিশ্বাসীরা তাদের ধর্মে বর্ণিত কাহিনিটিকেই সত্যি বলে মনে করে। এর দ্বারা এই কথা প্রমাণ হয় যে, মিথের জন্ম মানুষের কল্পনায়, মিথের বৃদ্ধি মানুষের বিশ্বাসে। বাস্তবতার ওপর তা নির্ভর করে না।

মিথকে তাহলে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? শুধুমাত্র উর্বর কল্পনাশক্তির বিকাশ? না তাও নয়। কিছু মিথের শুরুতে হয়তো ছোট্ট একটুকরো সত্যি ছিল, কিন্তু সময় যত গড়িয়েছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই একটুকরো 'সত্যি'টুকু মানুষ ক্রমশই পল্লবিত করে বিরাট আখ্যানে পরিণত করেছে। এই বিরাট আখ্যানকে আমরা কী বলব? মিথ্যে কথা? কেউ যদি বলেন, তেমন জোরালোভাবে প্রতিবাদ করা যাবেনা। কিন্তু মিথ্যে না বলে যদি 'বর্দ্ধিত অংশ'টিকে 'কম সত্যি' বলি, তবে সেটাই হয়তো সঠিক হবে।

মিথ সম্পর্কে এই শেষোক্ত ব্যাখ্যা বর্তমানকালের ঐতিহাসিকদের একটা বড় অংশ বিশ্বাস করেন। তাঁরা ছোট্ট একটি ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা বলে দেখেন না, তাঁদের কল্পনা দিয়ে তৈরি বহুদূরের এক মিথের একটা অংশ হিসেবে দেখেন। যখন কোনও ঘটনা ঘটতে থাকে, সেই ঘটনার সঙ্গে মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস সব কিছু জড়িয়ে যায় এবং দিনে দিনে বাস্তবকে অতিক্রম করে কল্পনা তার ডানা মেলতে থাকে সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে। শেষ পর্যন্ত এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায় সেই কল্পনার জোর, যেখানে বাস্তব থাকে অতি সামান্য একটু অংশ নিয়ে। এমনকি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেটুকু বাস্তব থাকে, তা মিথের তুলনাতে শুধু কম নয়, একান্তই গুরুত্বহীন। এটা ঘটে এইজন্য যে, ঘটনাকে তার বাস্তব পটভূমি থেকে তুলে নিয়ে এসে অন্য এক প্রেক্ষাপটে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। এই দাঁড় করিয়ে দেওয়ার পিছনে থাকে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা। কাদের স্বার্থসিদ্ধি? যারা সেই মিথের দ্বারা নিজেদের উপকৃত করতে পারবে বলে মনে করে, তাদের।

মিথ তৈরির নেপথ্যে : মিথ যে শুধু প্রাচীনকালে তৈরি হত, তা নয়। একালেও তৈরি হয়। তবে সেকাল আর একালের মধ্যে গুণগত কিছু পার্থক্য আছে। সেকালে ধর্ম ছিল মিথ তৈরির বড় জায়গা। একালে সেই জায়গা নিয়েছে রাজনীতি। যদিও, রাজনীতি যে একেবারেই ছিল না সেকালে, তা নয়। ছিল, তবে ধর্মসংপৃক্ত হয়ে। 'রামরাজ্য' নামক মিথটি তার প্রমাণ। একালে রাজনীতির মানুষেরাই নতুন নতুন মিথের জন্ম দিচ্ছেন। ভারতে গান্ধীই যে কেবলমাত্র মিথ হিসেবে একা প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, তা নয়। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুও কোনও অর্থে কম নন। বিশেষ করে দেশ থেকে ছদ্মবেশে তাঁর পালিয়ে যাওয়া, ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং সবশেষে তাঁর অন্তর্ধানের রহস্যময়তা তাঁকে এক মিথিক্যাল চরিত্র হিসেবে তুলে ধরেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্র শক্তির সবচেয়ে বর্ণাঢ্য চরিত্র উইনস্টন চার্চিল সেদেশে এইরকম মিথিক্যাল চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। কিন্তু এই যে গান্ধীজি, নেতাজি, চার্চিল, আমেরিকার মার্টিন লুথার কিং—এঁরা যে মিথ হয়ে উঠলেন, তা কীভাবে হলেন? সেটা কি এমনি এমনি কালের প্রবাহে হয়ে গেলেন, নাকি কোনও ব্যক্তি বা সংগঠন বা গোষ্ঠীর সচেতন প্রয়াস ছিল এর পিছনে? তার জন্য দেখা যাক মিথ্ তৈরির পটভূমি।

আগেই বলেছি, কালের প্রবাহে ছোট ছোট ঘটনা ক্রমশ পল্লবিত হতে হতে মিথে পরিণত হয়। সে আমলের রাজা-মহারাজা-নবাব-বাদশাদের প্রশ্রয় থাকত যেসব ঘটনার পিছনে, তাদের পল্লবিত হওয়ার পথে কোনও বাধা থাকত না।

এছাড়া আর একটা কারণও থাকত। তা হল, গল্পের মাধ্যমে সমাজের প্রাজ্ঞ মানুষেরা লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। এইসব গল্পই কালে কালে মিথে পরিণত হয়।

বর্তমান কালেও অব্যাহত আছে মিথ তৈরির সেই একই ঘরানা। এখন তৈরি হয় যে মিথ, তাকে বলা হয় শহুরে মিথ বা Urban Myth। কলিন্‌স্‌ ইংলিশ ডিকশনারি অনুযায়ী—'Urban myth is a folkloric and often sensational tale about modern life that is repeated in the media and by other means, making it more believable to some.' অর্থাৎ, বর্তমানের মিথ হবে আমাদের জীবনযাত্রা সঞ্জাত ঘটনা যেখানে রাষ্ট্র-সমাজ-ধর্ম সব কিছু থাকবে। এবং এই মিথ তৈরির পিছনে সংবাদ মাধ্যম ও অন্যান্যদের ভূমিকা থাকে মিথকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার ব্যাপারে। এই 'অন্যান্যদের' বলতে বোঝায় সেইসব ব্যক্তি —বুদ্ধিজীবী বা ইনটেলেক্‌চুয়াল বলে খ্যাতি আছে যাদের।

আধুনিক মিথ যাদের নিয়ে তৈরি হয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করেছে মিডিয়া আর ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালরা। এঁরাই কাউকে কাউকে জীবনের থেকে এত বড় মাপের (larger than life) বানিয়ে ফেলেন যে, অনেক সময় সাধারণ মানুষ ভেবে বসে, আদৌ কি বাস্তবে ছিলেন তাঁরা? নাকি তাঁরা কাল্পনিক চরিত্র? এ সম্পর্কে একটি সংবাদ সম্প্রতি আমাদের নজরে এসেছে। সার্ভেটি করা হয়েছিল ব্রিটেনে। অংশ নিয়েছিল বিশেষ করে সেখানকার যুবকরা। সার্ভের বেশ কিছু পরিসংখ্যান চমকে দেওয়ার মত। কয়েকটা বলছি :

❑ শতকরা একান্ন ভাগ মানুষ বিশ্বাস করেন যে, রবিনহুড নামে সত্য সত্যই একজন দস্যু ছিল, সে শেরউড জঙ্গলে থাকত, এবং ধনীদের সম্পত্তি লুঠ করে গরীবদের দিত।

❑ শতকরা পঁচিশভাগ ব্রিটেনবাসী মনে করে, স্যর উইনস্টন চার্চিল একটি কাল্পনিক চরিত্র।

❑ মহাত্মা গান্ধী হলেন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গোলের মতই আর এক মিথিক্যাল চরিত্র।

❑ শার্লক হোমস্‌ বাস্তবে এক বিরাট গোয়েন্দা ছিলেন এবং তিনি লণ্ডনের বেকার স্ট্রিটের ওই বাড়িতে থাকতেন।

সার্ভেটি পরিচালনা করেছিলেন লণ্ডনের ইউ কে টিভি গোল্ড চ্যানেলের প্রধান পল মোরেটন। তিনি তাঁর সার্ভে সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছিলেন

—"While there is no excuse for demoting real historical figures such as Churchill, the elevation of mythical figures to real life showed the impact good films could have in shaping the public consciousness" অর্থাৎ, চার্চিলের মত ঐতিহাসিক চরিত্রের অবমূল্যায়নের ব্যাপারে কোনও অজুহাত চলে না এটা মেনে নিয়েও বলতে হয় ভাল সিনেমার দৌলতে কাল্পনিক চরিত্ররা ঐতিহাসিক চরিত্র হয়ে জনগণের সচেতনতা বাড়াচ্ছে। অর্থাৎ ইতিহাসের চরিত্র পরিবর্তিত হচ্ছেন মিথিকাল চরিত্রে, আর মিথিকাল চরিত্র ঠাঁই পাচ্ছে ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে। এই স্থান পরিবর্তন কিন্তু এটা বুঝিয়ে দেয় যে, মানুষ মিথ তৈরি করতে বাস্তবের ধার বড় ধারে না। ইতিহাস থেকে মিথ হয়, আবার মিথ থেকেও ইতিহাস হয়। অনেকের বিশ্বাস আমাদের রামায়ণ-মহাভারতের মিথ এভাবেই তৈরি হয়েছে, পরে সেই মিথ্ হয়েছে ইতিহাস।

বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করে বোঝানোর জন্য যীশু খ্রিস্টের মিথ সম্পর্কে একটু বিশদভাবে আলোচনা করা যায়। মোজেসের কথায় সমুদ্র দুভাগে ভাগ হয়ে যাওয়া, যীশু খ্রিস্টের পুনরুত্থানের অলৌকিক ঘটনা সারা পৃথিবীর মানুষ জানেন। সেসব না হয় বহু শতাব্দী আগের কাহিনি। তার অনেক - অনেক পরে এই বাংলাতে আমাদের মহাপুরুষদের জীবনেও কম মিথ তৈরি হয়নি। সাধক রামপ্রসাদ শ্যামা সঙ্গীত গাইতে গাইতে বেড়া বাঁধছিলেন, বেড়ার ওপাশ থেকে স্বয়ং শ্যামা মা তাঁর বেড়া বাঁধার দড়ি গুছিয়ে দিচ্ছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত গিরিশ ঘোষের ক্যান্সার নিজের শরীরে নিয়েছিলেন। সাধক বামাখ্যাপা, সাধক তারাখ্যাপা, লোকনাথ বাবা এবং আরও অজস্র সব মহাপুরুষদের নামে কত যে মিথ তৈরি হয়ে রয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। এসব ঘটনার কোনও প্রমাণ নেই, শুধু বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এই সব ঘটনা। পৃথিবীর সব দেশে সব ধর্মে এমন অজস্র মিথ।

কীভাবে এই যীশু-মিথ তৈরি হল, সেটা নিয়ে Cosmic Awareness নামে একটি সংগঠন সম্প্রতি একটি মত প্রকাশ করেছে, যা কৌতুহলের উদ্রেক করে।

যীশু-মিথের উদ্ভব : সারা পৃথিবীতে যে ধর্মমতগুলি প্রচারিত আছে, তাদেরকে দুটি প্রধানভাগে ভাগ করা হয়। এক ভাগ সেমিটিক (Semitic) ধর্ম, অন্যভাগটি নন-সেমিটিক। সেমিটিক নাম হওয়ার কারণ মহাপ্লাবন থেকে পৃথিবীর জীবজগৎকে তাঁর নৌকায় তুলে যিনি বাঁচিয়েছিলেন, সেই পয়গম্বর নোয়ার চার পুত্রের মধ্যে একজনের নাম ছিল সেম (Sem)। সেমের যারা সন্তানসন্ততি বা উত্তরাধিকারী, তাদের বলা হয় সেমাইট্স্। সেমাইট্স্দের ধর্মমতগুলি হল সেমিটিক। সেমিটিক ধর্মের উদ্ভব আরব এবং সন্নিহিত অঞ্চলে। প্রধান সেমিটিক

ধর্ম হল ইহুদি (Judaism), খ্রিস্টধর্ম (Christianity) এবং ইসলাম (Islam)। এই ধর্মমতগুলির বিশেষত্ব হল, এরা ঈশ্বরের অবতার রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে আসা বিশ্বাস করে না। এদের মতে ঈশ্বর তাঁর ঐশ্বরিক নির্দেশ পাঠান পয়গম্বরের (Prophet) কাছে দূত মারফৎ। ইহুদি ধর্মে মোজেস, খ্রিস্ট ধর্মে যিশু খ্রিস্ট এবং ইসলামে হজরত মহম্মদের কাছে ঈশ্বর তাঁর বাণী পাঠিয়েছেন।

নন-সেমিটিক ধর্মমতগুলিকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয় —একটি আর্যধর্ম (Aryan) এবং অন্যটি নন-এরিয়ান (Non-Aryan)। আর্যধর্মের আবার দুটি উপবিভাগ আছে. বৈদিক এবং অবৈদিক। হিন্দুধর্ম হল বৈদিক ধর্ম। পক্ষান্তরে শিখ ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম ইত্যাদিরা হল অবৈদিক (non-Vedic)। আর্য ধর্ম অনুযায়ী সৃষ্টিকে সঠিক পথে চালনা করার জন্য, অধর্মের হাত থেকে ধর্মকে বাঁচাবার জন্য অবতার রূপে স্বয়ং ঈশ্বর অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে। রাম, কৃষ্ণ হলেন ঈশ্বরের অবতার। বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম, শিখ ধর্মের ঈশ্বরতত্ত্বেই বিশ্বাস নেই। তাই এই ধর্মমতগুলির প্রচারকদের না বলা হয় ঈশ্বরের পুত্র, না বলা হয় পয়গম্বর (prophet)। তাঁরা সদাচারকে (ethical systems) এবং পৃথিবীতে কিভাবে আরও মহত্তর থাকা যায়, সেই কথা বলেছেন তাঁদের ধর্মমতের মাধ্যমে। বুদ্ধ, মহাবীর, গুরু নানকের ধর্ম তাই ঈশ্বরবাদী ধর্ম নয়।

নন-এরিয়ান ধর্মগুলির মধ্যে প্রধান কনফুসিয়াস ও তাও ধর্মের উৎপত্তি চীনে। শিন্টো ধর্মের উৎপত্তি জাপানে। এই ধর্মগুলিও ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী।

দেখা গেল, সেমিটিক ধর্মগুলি এবং আর্যধর্ম—উভয়েই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, কিন্তু অবতারবাদে বিশ্বাসী নয়। যদিও যিশু অবতার না হলেও পূজিত হন অবতার রূপেই। ঘোষিত ভাবে হিন্দুরাই পৃথিবীর একমাত্র মূর্তিপূজক বটে, তবে যেভাবে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মূর্তি গীর্জায় গীর্জায় রক্ষিত হয় এবং তার সামনে আরাধনা করা হয়, তাকে যদি কেউ মূর্তিপূজা বলেন, তবে খুব একটা ভুল বোধহয় বলবেন না।

মহাপুরুষদের মিথ কীভাবে তৈরি হয়, সেই আলোচনার জন্য যিশু খ্রিস্টের উদাহরণ নেওয়াটা সবচেয়ে যুতসই হবে, তাই তাঁর প্রসঙ্গ উল্লেখ করছি।

যে যিশু খ্রিস্টকে আমরা চিনি ও জানি, তিনি কি সত্যিই কোনও বিশেষ একজন মানুষ ছিলেন? নাকি বহুজনের, বহু সাধকের, সমস্ত লৌকিক-অলৌকিক সত্ত্বার মিলনে গঠিত এক কল্পিত মানুষ তিনি? যিশু নামে কি কোনও মানুষ আদৌ ছিলেন? তিনিই কি খ্রিস্ট ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন?

অনেকে বিশ্বাস করেন, যিশু নামে কোনও বিশেষ একজন মানুষই ছিলেন

না আদতে। যিশু বা Jesus আসলে রোম সম্রাট কনস্টানটাইনের এক ভাবনার ফসল। কী সেই ভাবনা? কনস্টানটিন চেয়েছিলেন, রোম সাম্রাজ্যের তৎকালীন সরকারি ধর্মের বদলে সমস্ত ধর্মের ভাল গুণগুলি নিয়ে একটি ধর্মমত তৈরি হোক। অনেকটা সম্রাট আকবরের 'দীন-ই-ইলাহী' ধর্মের মত। এভাবে তৈরি হয়েছিল খ্রিস্টান ধর্ম। আর এটা করতে গিয়ে বিভিন্ন ধর্মের ভাল দিকগুলি নিয়ে ঈশ্বরের বাণীর সংকলন 'বাইবেল' লিখিত হয়েছিল। লর্ড গ্রাহাম তাঁর বিখ্যাত বই—*Deception and Myths in Bible*-এ বাইবেল-এর ওল্ড টেস্টামেন্ট-এ উল্লেখিত বিভিন্ন কাহিনির উৎস অনুসন্ধান করে দেখিয়েছেন যে, এইসব কাহিনি বাইবেল-এর ওল্ড টেস্টামেন্ট-এর আগে শুধু যে প্রচলিত ছিল তাই নয়, আগেকার অনেক ধর্মীয় পুস্তকে এইসব কাহিনি লিপিবদ্ধও ছিল। একেবারে অক্ষর মিলিয়ে বাইবেল-এ লিপিবদ্ধ হয়েছে সেইসব কাহিনি। মোজেসের গল্প শুধু নয়, তার নামটিও এসেছে সিরিয়ার উপকথার এক চরিত্র থেকে, যার নাম ছিল মাইসিস। ইডেনের স্বর্গোদ্যানের বর্ণনার প্রেরণা এসেছে ব্যাবিলনের বিখ্যাত ঝুলন্ত উদ্যান থেকে। এভাবে শুধু সিরিয়া-ব্যাবিলন নয়, ভারতীয় লোককথা-উপকথার অনেক গল্পও ঠাঁই পেয়েছে বাইবেল-এ। শুধু ওল্ড টেস্টামেন্ট নয়, নিউ টেস্টামেন্ট-এও যে আর্য ধর্মের, বিশেষভাবে বৈদিক ধর্মের বিভিন্ন গল্পকথা ও মিথ ঠাঁই পেয়েছে, তারও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈদিক ধর্ম বা হিন্দু ধর্মকে গ্রাম্য ও অবিশ্বাসীদের ধর্ম বলে সেমিটিক ধর্মাবলম্বীরা প্রচুর সমালোচনা করেছে বটে, কিন্তু এই ধর্মের পুস্তকাদিতে যে সব চমৎকার ও গ্রহণীয় কাহিনি আছে, সেগুলোকে নিজেদের ধর্মপুস্তকে নিতে দেরি করেনি। এবং নেওয়ার পর সেগুলোকে নিজেদের পয়গম্বরের অলৌকিক কাহিনি বলে প্রচারও করেছে। যিশুর নামে প্রচলিত বাইবেল-এর বহু কাহিনি আদিতে হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন ধর্ম থেকে যে নেওয়া হয়েছে, লর্ড গ্রাহাম তাঁর উপরি-উক্ত গ্রন্থে সেকথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন।

এই সমস্ত কাহিনি থেকে এই সন্দেহটা উঠে আসা অমূলক নয় যে, যিশু খ্রিস্ট কোনও বিশেষ একজন মানুষ ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন সংস্কার ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণে সৃষ্টি হওয়া এক ভাববাদী চরিত্র যিনি এই পৃথিবীতে আদৌ কোনওদিন পদসঞ্চার করেননি। যাঁর আবির্ভাব ও প্রয়াণ আমাদের চেতনায়। কথাটা নতুন শোনাতে পারে, মেনে নিতে অসুবিধা হতে পারে অনেকের। তবু ঠিক এই ধরণের সম্ভাবনা উঠে এসেছে হিন্দুদের কৃষ্ণচরিত্র নিয়েও। কথা উঠেছে, কৃষ্ণ কোনও একজন মানুষের নাম নয়, কোনও বস্তুজগতের মানুষের

নাম নয়, কৃষ্ণ একটি ধারণা মাত্র, একটি কনসেপ্ট। বহু মানুষের চরিত্রের গুণাবলী একটু একটু নিয়ে এক অনুপম মানুষের ধারণা হলেন কৃষ্ণ।

যিশু খ্রিস্টও যে এরকমটা হতে পারেন, তার সপক্ষে অনেক প্রমাণ আছে। যিশু খ্রিস্ট এই বিশেষ নামটির মধ্যেই সেই সম্ভাবনার প্রভূত ইঙ্গিত আছে। রোমসম্রাট কনস্টানটাইন আহূত যে ধর্ম সম্মেলনে খ্রিস্ট ধর্মের জন্ম হয়েছিল বলে অনেকে বিশ্বাস করেন, সেখানে ধর্মের মূল চরিত্রটির নাম কী দেওয়া হবে, এই নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়। প্রথমে প্রস্তাবিত হয় জিউস (Zeus) নামটি। কিন্তু ওই নামে এক গ্রীক দেবতা ছিলেন, আর গ্রীক দেবতার নাম নিতে রোমানদের আপত্তি ছিল। তারা চাইছিল একটা রোমান নাম। প্রস্তাব হল 'হেসাস' (Hesus) এই নামটি। যার হিব্রু ভাষায় অর্থ হল 'অর্ধনারীশ্বর' (Neither He nor She। এই হেসাস শব্দটির আর একটি প্রতিশব্দ হল জেসাস (Jesus)। খ্রিস্ট বা Christ নামটিও আদিতে ছিল ক্রিস্টস বা Christos। যার অর্থ 'আলোকপ্রাপ্ত মনুষ্য' (Enlightened One)। গ্রীকদের মধ্যে একটি নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত ছিল ক্রেস্টাস (Krestus)। এই Krestus বা Krest কথাটির অর্থ চূড়া বা Top। ভাষাবিজ্ঞানীদের অনেকেই দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করেন যে, হিন্দুদের দেবতা কৃষ্ণ—এই নামটির সঙ্গে গ্রীকদের পরিচয় হয়েছিল আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময়। পৌত্তলিক গ্রীকদের খুব পছন্দ হয়েছিল কৃষ্ণের নাম ও তাঁর কাহিনি। তাঁরা স্বদেশে নিয়ে যান 'কৃষ্ণ' নামটিকে এবং উচ্চারণ-বিকৃতিতে বা দেশীয়করণের প্রচেষ্টাতে 'কৃষ্ণ' হয়ে যান 'কৃষ্ট' বা ক্রেষ্ট। এভাবে যিশু খ্রিস্ট নামের জন্ম।

এইসব কথাগুলো বলছি এটা দেখানোর জন্য যে মিথ্ কিভাবে তৈরি হয় এবং কিভাবে তা ছড়িয়ে পড়ে। দেখাবার চেষ্টা করলাম মানবজীবনের সর্ববিধ গুণাবলী একটি মানুষের মধ্যে আরোপিত হয়ে কিভাবে তাঁকে দেবত্বে বা Larger than Life-এর ইমেজে পৌঁছে দেয়। এই দৃষ্টি নিয়ে আমরা গান্ধী চরিত্রের মিথগুলি কী এবং কেমন তাদের স্বরূপ—সেই আলোচনায় যাব।

গান্ধী মিথের স্বরূপ ও বিকাশ : উদারপন্থী মতবাদের (Liberalism) সমর্থকরা সারা বিশ্বজুড়ে একটা নূতন ধর্মের জন্ম দিয়েছে বর্তমান কালে। তা হল, তাদের পছন্দের আওতায় এলে একজন ভিলেনকে তারা নায়ক বানাতে যেমন দেরি করে না, তেমন তারা অপছন্দ করলে একজন নায়ককেও ভিলেন বানাতে দেরি করে না। লিবারেল বিশেষজ্ঞদের কাছে এই খেলাটি বিশেষ প্রিয়। উন্নত-অনুন্নত কিংবা উন্নয়নশীল—সব রকমের দেশ নির্বিশেষেই চলে তাদের

এই খেলা। তবে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে এই খেলাটি বিশেষ জমজমাট। অন্য দেশের কথা ছেড়ে আমাদের ভারতের আলোচনায় আসি।

ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দলটি লিবারেল বুদ্ধিজীবীদের বিশেষ প্রিয়। এই দলটি তাদের যতটা প্রিয়, ততটাই অপ্রিয় ভারতীয় জনতা পার্টি বা ভা জ পা (বি জে পি)। বিজেপি তাদের মতে একটি হিন্দু সাম্প্রদায়িক দল। কংগ্রেস যে কাজ করে, তার মধ্যে সাধারণভাবে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাভাবনা খুঁজে পায় এরা। তাই ১৯৮৪ সালে দিল্লীর শিখহত্যার ঘটনায় যখন কোনও রাঘব বোয়ালের টিকিটিও ছুঁতে পারে না দেশের আইন বা প্রশাসন, যখন শাহবানু মামলার রায় ঘুরিয়ে দিতে 'মুসলিম পারসোনাল ল' বিল পাশ করাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে কংগ্রেস, তখন এসবের মধ্যে খারাপ কিছু খুঁজে পায় না এরা। কিন্তু যখন ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গায় বিজেপির নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ আদালতে অগ্রাহ্য হয়, তখন এরা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে শুধু নয়, এরপরেও মোদিকে এক ভয়ংকর হিংস্র দৈত্য হিসেবে দাগিয়ে দিতে দেরি করে না। যখন দাঙ্গাপ্রবণ রাজ্য গুজরাট থেকে দাঙ্গা নামক শব্দটি উধাও হয়, তখনও সমালোচনার অন্ত থাকে না। এর কারণ, এই লিবারেল বুদ্ধিজীবীদের পা কখনও মাটিতে থাকে না, এঁরা উদারবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইত্যাদি আদর্শবাদের আকাশে উড়ে বেড়াতে বেড়াতে সব কিছু দ্যাখেন ও সেইমত বিচার করেন।

কিন্তু আমরা সেই আলোচনায় যাব না। আলোচনাকে সীমিত রাখব মোহনদাস কর্মচন্দ্ গান্ধী নামক ব্যক্তিটির মধ্যে। যিনি এই উদারপন্থী চিন্তাধারার আইকনদের মধ্যে সবার আগে। যে গুণাবলী তাঁর চরিত্রে আরোপিত হয়ে তাঁকে এক মিথে পরিণত করেছে, সেই বিষয়টির আলোচনাতে যাব আমরা। বুঝতে পারছি, 'আরোপিত' কথাটি ইতিমধ্যেই অনেকের ভ্রূ এবং নাসিকা কুঞ্চনের কারণ হয়েছে। তাঁদের শান্ত করার জন্য বলি, কথাটি কিন্তু আমার নয়, স্বয়ং গান্ধীই একবার বলেছিলেন এই কথাটি। যদিও, তাঁর ভাষাটি ছিল কিঞ্চিৎ অন্যরকমের। মানুষ যখন গান্ধীচরিত্রের দেবতাসুলভ গুণাবলী দেখে তাঁকে সন্ত বা saint বলছেন, বলছেন যে 'একজন সন্ত চেষ্টা করছেন রাজনীতিবিদ হওয়ার জন্য' (a saint trying to be a politician), তিনি তখন প্রতিবাদ করে বলেছেন — 'একজন রাজনীতিবিদ চেষ্টা করছেন সন্ত হওয়ার জন্য' (a politician trying to be a saint)।

আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি, গান্ধী ঠিকই বলেছিলেন। কেননা, ভগবান বানিয়ে দিলে তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা পাওয়ার কোনও আশা মানুষের থাকে না,

তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়ার কিছু থাকে না, তাঁর জীবনকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখার সুযোগ থাকে না, তাঁর ব্যর্থতা ও ভুলভ্রান্তিগুলোকে বোঝার কোনও সুযোগ থাকে না। এছাড়া আরও একটা খারাপ সম্ভাবনা থাকে। সেটা হল, সন্ত হয়ে গেলে তখন এই পৃথিবীতে চলার জন্য তাঁর শিক্ষা কোনও কাজে লাগবে না। এই কথাটা ভেবে নেবে সবাই। মনে রাখবেন, সাধু-সন্তদের মানুষ ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে, তাদের কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করে বটে, কিন্তু তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করে নিজেরা সাধুসন্তদের জীবনে যেতে চায় না। গান্ধীকে মহাত্মা বানিয়ে ফেলে আমরা ইতিমধ্যেই এই ভুল অনেকটা করে ফেলেছি। গান্ধীকে তাঁর ঐতিহাসিক পটভূমিকাতে রেখে দিয়ে তাঁর নামে যে মিথগুলি তৈরি হয়েছে, তার বিশ্লেষণে যাব আমরা। দেখব, সেগুলো সবই কল্পকাহিনি, নাকি তার মধ্যে অল্প কিছু গল্প এবং সত্যকারের কিছু সত্যি আছে কিনা। থাকলে কতটা আছে।

পাঞ্জাবীতে একটা প্রবাদ আছে, যার বাংলা অর্থ হল—চারদিকে লোহার পাঁচিল তুলেও সত্যকে আটকে রাখা যায় না, দেয়াল ভেঙে সে বেরিয়ে আসবেই। কথাটা এইজন্য বলা যে, অনেকেই এখন সন্দেহ করতে শুরু করেছেন গান্ধীকে নিয়ে, গান্ধী জীবনের মিথ নিয়ে। তাঁরা বলতে শুরু করেছেন, গান্ধী জীবনের সত্যটাকে বন্দি করে রাখা হয়েছে লোহার প্রাচীরের মধ্যে আর তাঁর সম্পর্কে তৈরি হওয়া মিথকে খুলে দেওয়া হয়েছে সবার সামনে। সন্দেহটা অমূলক, নাকি তার কোনও ভিত্তি আছে, খতিয়ে দেখতে গেলে সত্য আর মিথ্যা, মুখ আর মুখোশ—দুটিকেই দেখতে হয়। আর এই দেখার জন্য আলোচনা শুরু করব, মুখোশ নিয়ে। সন্দিগ্ধমনারা যাকে বলছেন গান্ধী-মিথ।

গান্ধী-মিথের মিথগুলিকে এভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়ঃ

ক) গান্ধী একজন সাধু-মহাত্মা ছিলেন;

খ) গান্ধী শান্তির জন্য ঈশ্বর প্রেরিত দূত ছিলেন;

গ) ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের নিজের হাতে তিনি গড়ে ছিলেন;

ঘ) তিনি সত্যকারের অহিংসার পূজারি ছিলেন;

ঙ) তিনি সত্যের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন, মিথ্যাকে ঘৃণা করতেন;

চ) সাধারণ মানুষর প্রতি তাঁর নিঃস্বার্থ ভালবাসা ছিল;

ছ) তিনি দরিদ্র মানুষের মত জীবন যাপন করতেন;

জ) তিনি ভারতের স্বাধীনতা এনেছিলেন।

গান্ধী-মিথের শুরু তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকা থাকাকালীন সময়ে। রেভারেন্ড জোসেফ জে. ডোক নামে একজন শ্বেতাঙ্গ পাদ্রী সর্বপ্রথম একটি গান্ধী-জীবনী লেখেন। মনে রাখতে হবে, ওই সময় পর্যন্ত গান্ধীর কর্মজীবনের ভারত-অধ্যায়

শুরুই হয়নি। ১৮৯৩ সাল থেকে ১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত গান্ধী ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকাতে। মোট প্রায় একুশ বছর। এই একুশ বছরে যেসব কাজ গান্ধী করেছিলেন সেখানে, সেগুলি মোটামুটি এইরকম—

- দাদা আবদুল্লা অ্যান্ড কোম্পানি নামে একটি ভারতীয় ফার্মের নাটাল অফিসে আইনী পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ শুরু করেন। এক বছরের জন্য করা চুক্তিতে। যে কাজের জন্য তিনি যান সেখানে, সেটা মিটে গেলেও দক্ষিণ আফ্রিকাতে থেকে যান আরও প্রায় তিন বছর। এই তিন বছরে সেখানকার প্রবাসী ভারতীয়দের দাবী ও অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। মুখ্যত তাঁরই প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয় নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস। এখানে তিনি আইন ব্যবসাও শুরু করেন, কিন্তু তেমন পসার না হওয়ায় ১৮৯৬ সালের জুন মাসে ভারতে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন এবং ফিরেও আসেন। কিন্তু এখানে এসেও তাঁর কাজকর্মের সুবিধা হল না, এমন কি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দলেও তাঁর কোনও কদর হল না। ফলে ছ'মাস পরে স্ত্রী এবং দুটি শিশুপুত্রকে নিয়ে আবার তিনি দক্ষিণ আফ্রিকাতে ফিরে যান। সেটা ছিল ১৮৯৭ সালের জানুয়ারি মাস। ডারবান বন্দরে জাহাজ ভেড়ার পর একটি ঘটনা ঘটল যা গান্ধীকে বিখ্যাত করে দিল। কলকাতায় থাকাকালীন সময়ে কংগ্রেসের এক সভায় তিনি সমালোচনা করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকার ও সেদেশের কালো মানুষদের। ভারতীয়দের ওপর অত্যাচারের অভিযোগ এনেছিলেন তাদের বিরুদ্ধে। এতে সেখানকার শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ উভয় সম্প্রদায়ের মানুষরা খুব রেগে যায় গান্ধীর ওপর এবং তাঁর ওপর হামলা করে। অনেক কষ্টে গায়ে-মুখে রঙ মেখে নিগ্রোর ছদ্মবেশ নিয়ে কোনওক্রমে পালিয়ে বাঁচেন গান্ধী।
- ১৮৯৯ থেকে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দব্যপী বোয়ার যুদ্ধে (Boer War) ইন্ডিয়ান অ্যাম্বুলেন্স কর্পস নামে একটি সংগঠনতৈরি করে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে কাজ করেন। ভয়ঙ্কর অত্যাচার চালিয়ে ও অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে ব্রিটিশরা এই যুদ্ধে বোয়ার (যার অর্থ চাষী)দের পরাস্ত করে। ব্রিটিশকে সাহায্য করার জন্য গান্ধীকে সরকার War Medal-ও প্রদান করে।
- ১৯০২ সালের জানুয়ারি মাসে সপরিবারে ভারতে ফিরে আসেন গান্ধী। প্রায় এক বছর ছিলেন ভারতে। তারপর আবার ফিরে যান দক্ষিণ আফ্রিকায়। কয়েক মাস পর তাঁর পরিবারও যোগ দেন তাঁর সঙ্গে। নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেসের নেতৃত্বে চলে আসেন গান্ধী।

- ১৯০৩ সালে তিনি দুই বন্ধুর সঙ্গে একত্রে 'ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন' নামে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু করেন। এই পত্রিকায় তাঁর রাজনীতি, সমাজনীতি সহ নানারকম ভাবনা নিয়ে লেখালেখি শুরু।
- ১৯০৪ সালে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্স্ভাল-এ বন্ধু কলেনবাখের দান করা জমিতে ফিনিক্স ফার্মের প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে লিও টলস্টয়ের অনুসরণে কমিউনিটি জীবন যাপনের চেষ্টা শুরু করেন।
- ১৯০৬ সালে জুলু সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ব্রিটিশ। ভারতীয়রা যাতে দলে দলে এই যুদ্ধে ব্রিটিশের পক্ষে যোগ দেয়, তার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন গান্ধী। ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা আবার পুরস্কৃত হন। ১৯০৬ সালে তিনি সেখানকার ভারতীয়দের কিছু দাবি দাওয়া নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য ইংলন্ডে যান। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে আসার পর ভারতীয়দের হাতে শারীরিকভাবে আক্রান্ত হন। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা (মূলত মুসলমান) তাঁর বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনে এবং গান্ধীকে ব্রিটিশের দালাল আখ্যা দেয়। তাঁকে রাস্তায় ফেলে ভয়ংকরভাবে মারধর করা হয়। মরেই যেতেন, বেঁচে যান যোসেফ ডোক্ নামের এক ব্রিটিশ পাদ্রীর হস্তক্ষেপে। এই পাদ্রীই গান্ধীর প্রথম জীবনীকার হন কিছুদিন পরে।
- ১৯০৭ সালে শ্বেতাঙ্গ সরকার ট্রান্সভাল এশিয়াটিক রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট পাশ করে, যার বলে এশীয়দের জন্য সরকার প্রদত্ত পাশ গ্রহণকে বাধ্যতামূলক করা হয়। এর বিরুদ্ধে গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয়, প্রায় ২০০০ এশীয় অধিবাসী কারাবরণ করে। গান্ধী নিজেও গ্রেপ্তার হন। ট্রান্সভাল সরকারের প্রধান জেনারেল স্মাট্সের সঙ্গে ভারতীয়দের একটি চুক্তি হয়। ঠিক হয় ভারতীয়রা স্বেচ্ছায় পাশ নেবে, তারপর এই আইন বাতিল হবে। গান্ধীর মধ্যস্থতায় এই চুক্তি হয়। কিন্তু জেনারেল স্মাটস্ তাঁর কথা রাখলেন না। আইন বাতিল তো করলেনই না, বরং কড়াকড়ি এবং নিপীড়ন বাড়িয়ে দিলেন। এই ঘটনায় ভারতীয়দের চোখে গান্ধীর মর্যাদা খুবই খুণ্ণ হয়। সত্যাগ্রহ আন্দোলন ক্রমশই ভেঙে পড়ল এরপর থেকে। ভারতীয়দের মধ্যে প্রতিরোধও আর তেমন থাকল না। ১৯০৯ সালে ব্রিটিশ সরকার ঠিক করল দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশগুলিকে একত্র করে Union of South Africa গঠন করা হবে। ভারতীয়রা প্রমাদ গুনল যে, বোয়ার প্রদেশের ভারতীয় বিরোধী আইন হয়তো সারা দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন জুড়ে বলবৎ করা হবে। গান্ধীকে তারা তাই লন্ডনে পাঠাল সরকারের

সঙ্গে কথা বলার জন্য। কিন্তু গান্ধীর সফর সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল। ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের কোনও দাবি মেনে নিল না। গান্ধীর এই ব্যর্থতা দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের কাছেতাঁর গুরুত্ব আরও কমিয়ে দিল। ১৯১৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত আর কোনও আন্দোলন গান্ধী করেননি।

- ১৯১৩ সালের মার্চ মাসে ভারতীয়দের বিবাহ সম্পর্কিত কিছু দাবী, ইমিগ্রেশন রেগুলেশন অ্যাক্ট ১৯১৩ এবং ভারতীয়দের ওপর ধার্য করা তিন পাউন্ড ট্যাক্সের বিরুধে গান্ধী তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলন আবার শুরু করেন। গান্ধীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিন মাসের কারাদন্ড দেওয়া হয়। সত্যাগ্রহ আন্দোলন আবার ভেঙে পড়ল। কিন্তু একটি নতুন ঘটনা ঘটল। গান্ধীর সঙ্গে মধ্যস্থতার ব্যাপারে ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ এগিয়ে এলেন। তাঁর মধ্যস্থতায় গান্ধীর কারামুক্তি ঘটল। ১৯১৪ সালের জানুয়ারি মাস থেকে জেনারেল স্মাটস্ ও জেনারেল বোথার সঙ্গে গান্ধীর বৈঠক হতে থাকল।কিন্তু আলোচনার বড় ধীর গতি। শেষমেষ প্রায় অর্থহীন একটা চুক্তি হল জুন (১৯১৪) মাসে। ভারতীয়রা ভীষণ ক্ষেপে গেল গান্ধীর ওপর। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকা আর যে তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না, সেটা বুঝলেন গান্ধী। ভারতে ফিরে যাবেন বলে মনস্থ করলেন। সম্ভবত ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হয়ে থাকবে তাঁর। ব্রিটিশরা তাঁকে লন্ডনে ডেকে পাঠাল। তাদের সঙ্গে কথা বলে লন্ডন থেকে তিনি সোজা ভারতে ফিরলেন। আর কখনো পা রাখেননি দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে।

এই হল গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসজীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। বলা বাহুল্য, উপরে উল্লেখিত ঘটনাবলী থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, গান্ধীর আন্দোলনে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সমাজ তেমনভাবে উপকৃত না হলেও গান্ধীর নিজের উপকার বিপুলভাবে হয়। তাঁর মধ্যে ব্রিটিশ খুঁজে পেল এমন একজন রাজনীতিবিদকে, যাকে খুব বেশি ভয় না করলেও চলে, পাত্তা না দিলেও চলে। অহিংসা এবং সত্যাগ্রহ এই দুটি বিষয়ে আপাতভাবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই বলেও তাদের বিশ্বাস দৃঢ় হল। ভারতে তখন ব্রিটিশের বিরুধে সশস্ত্র সংগ্রাম পূর্ণোদ্যমে চলছে। অতএব ব্রিটিশ পরিকল্পনা করল যে, গান্ধীকে এবং তাঁর অহিংস আন্দোলন ও সত্যাগ্রহকে ভারতে নিয়ে এসে এখানকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ধারাকে অন্যপথে বইয়ে দিতে হবে। এই পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে গান্ধীকে বিরাট মানুষ বা বিরাট নেতা বানাবার চেষ্টা পূর্ণোদ্যমে শুরু হল। রেভারেণ্ড যোসেফ জে ডোকের গান্ধী জীবনীগ্রন্থ এই উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে একটি

ফরমায়েসী লেখা। এর পরপর বেরোল আরও কয়েকটি গান্ধী বিষয়ক লেখা। সবাই হলেন ইউরোপীয় ও আমেরিকান ধর্মযাজক। এঁদের মধ্যে জন এইচ হোম্স নামে নিউ ইয়র্কের এক পাদ্রী তো তাঁর গান্ধী বিষয়ক বিভিন্ন লেখায় কখনো তাঁকে বলেছেন এযুগের যিশু খ্রিস্ট (Gandhi: The Modern Christ) কখনো বলেছেন—খ্রিস্টের পরবর্তী মহত্তম মানুষ (Mahatma Gandhi : The Greatest Man since Jesus Christ), কখনো বলেছেন খ্রিস্টের অবতার (Mahatma Ji: Reincarnation of Christ)। বিখ্যাত সাহিত্যিক রম্যাঁ রলাঁ পর্যন্ত গান্ধীকে শুধু হিন্দু সন্ত বলে ক্ষান্ত হলেন না, তিনিও তাঁকে বললেন নতুন খ্রিস্ট। গান্ধীর এক জীবনী তিনি লিখলেন ফরাসী ভাষায়; যার ইংরাজী অনুবাদের শুরুটাই হল এই কথাগুলি দিয়ে : "He is the One Luminous Creator of All, Mahatma." গান্ধীর প্রতি পশ্চিমী পণ্ডিতদের এই ভক্তির বান দেখে ভারতের হিন্দু পন্ডিতরাও চুপ করে থাকতে পারলেন না। এঁদেরই একজন কৃষ্ণলাল শ্রীধরনি গান্ধীকে ভগবান বিষ্ণুর দশম অবতার রূপে ঘোষণা করে বসলেন। গান্ধীকে ভগবান রূপে দেখানোর জন্য লেখকদের মধ্যে আক্ষরিক অর্থে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। সবার চেষ্টা একে অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার। এভাবে গান্ধী হয়ে উঠলেন সাধু-মহাত্মা। এ বিষয়ে বিশদভাবে এই গ্রন্থের অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। এখানে শুধু একটাই কথা বলার, তা হল, এভাবেই মুখ্যত অভারতীয়রা গান্ধীকে দেবতা বানিয়ে ছাড়ল।

গান্ধী প্রসঙ্গে দ্বিতীয় মিথ তিনি শান্তির দূত হিসেবে ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় আদৌ কোথাও শান্তি এসেছিল কিনা সে সম্পর্কে অবশ্য কিছু জানা যায় না। শান্তির অনেক ধরণের মধ্যে একটা হল শ্মশানের শান্তি। ভারত ভাগের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধ্যায় যদি দেশে শান্তি এনে থাকে, তবে তা নিঃসন্দেহে শ্মশানের শান্তি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বিপক্ষ দলে সমাগত ভাই-বন্ধু-স্বজনদের দেখে বিষাদগ্রস্ত অর্জুন যখন যুদ্ধ না করার কথা ভাবছিলেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে যুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার জন্য যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন, সেখানেও শান্তির কথা ছিল। কিন্তু সে শান্তি ক্লীবের শান্তি ছিল না, অক্ষমের শান্তি ছিল না। গান্ধীর শান্তি আসলে ক্লীবের শান্তি। এমন শান্তির জন্য ঈশ্বর কাউকে নিজের দূত করে পাঠাতে পারেন না এই পৃথিবীতে। আসলে শান্তি বিষয়ে গান্ধীর ধারণা শুধু যে অবাস্তব ও অনুসরণের অযোগ্য ছিল তাই নয়, এ ছিল পাগলামির এক চূড়ান্ত উদাহরণ। তাঁর এই পাগলামি যে শুধু ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তিকে বিলম্বিত করেছে তাই নয়, দেশভাগের প্রেক্ষাপটে সাধারণ

মানুষের, বিশেষ করে ভারতীয় হিন্দুদের অস্তিত্বের ওপরেই এক বিরাট প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিয়েছিল। তাঁর নেতৃত্বাধীন মুখ্যত হিন্দুদের দল বলে অভিহিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেস যখন রামধুন গাইতে গাইতে শান্তির ললিত বাণী আউড়ে গিয়েছে, তখন পূর্ণমাত্রায় রণসাজে সজ্জিত সশস্ত্র মুসলিম লীগের গুন্ডারা (Private Army) চরম অত্যাচার চালিয়েছে হিন্দুদের ওপর। যখন পশ্চিম পাকিস্তানে ও পূর্ব পাকিস্তানে দাঙ্গা বেধেছে, তখন ভারতের জনগণমনের অধিনায়ক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর কাছে সেই আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য শুকনো কথা ছাড়া আর কিছু ছিল না। এই প্রসঙ্গে এ টি এম আবদুল্লাহেল সফি নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Peace and Conflict Studies বিভাগের অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর ২০১০ সালের এক প্রতিবেদনে যে কথা বলেছেন, তা রীতিমত অনুধাবনযোগ্য। True Lies : The Myths and Realities about Mahatma Gandhi নামক নিবন্ধে তিনি বলেছেন—"Whereas the Muslim League was armed, the Congress was not and (it) was entirely dependent on the British police and military apparatus. When the partition riots began in West Punjab and East Bengal, the Congress had no means to defend the helpless victims. Being unable to prevent the slaughter and rape or protect the stream of Hindu and Sikh refugees, it lost the moral authority... "

ভারতের রাজনৈতিক নেতারা গান্ধীর ভাবশিষ্য ছিলেন এবং গান্ধীর ভাবধারার পথে স্বাধীন ভারতকে নিয়ে চলেছেন তাঁরা—এটাও গান্ধী সম্পর্কে প্রচারিত একটি মিথ। এটাও আর এক বড় মিথ্যাচার। ভারতে গান্ধী আছেন শুধু রাস্তার মোড়ে মোড়ে, তেমাথা-চৌমাথায়, কারেন্সি নোটে, আর যমুনাতীরের রাজঘাটে। আর কোথাও তিনি নেই। না সামাজিক ধারণায়, না রাজনৈতিক চেতনায়, না দেশগঠনের প্রক্রিয়ায়। তাঁর অহিংসার রাজনীতি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভারত এখন সামরিক সজ্জায় বিশ্বের চতুর্থ শক্তি। গান্ধী ক্ষুদ্র শিল্পে উন্নয়নের মডেলকে দেশগঠনে জরুরি বলে ভাবতেন। তাঁর সবচেয়ে বড় শিষ্য জওহরলাল সেই ভাবনাকে বিসর্জন দিয়ে বৃহৎ শিল্পস্থাপনকে উন্নতির চাবিকাঠি বলে মেনে নিয়েছেন। পরবর্তী জমানাগুলিতেও এই ব্যবস্থা চলেছে। কারণ এই পথটাই বাস্তব। চরকা কেটে যত না তিনি দেশের উন্নতির কথা ভেবেছেন, তার থেকে বেশি ভেবেছেন নিজের ইমেজ গঠনের ভাবনা। বিজ্ঞান মানুষকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, পিছনের দিকে নয়। গান্ধী তাঁর ভাবনা দিয়ে দেশকে বিজ্ঞানমনস্কতার বিপরীত দিকে ঠেলতে চেয়েছিলেন। সেকারণেই সেগুলি গ্রহণযোগ্য বা অনুসরণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না, হয়ওনি। দোষটা

গান্ধীর রাজনৈতিক ভাবশিষ্যদের নয়, দোষটা গান্ধীর ভাবনার। ১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধে লজ্জাজনক পরাজয়ের পর গান্ধীর চিন্তাধারা আরও বে-আব্রু হয়ে পড়েছে। ভারতকে পরিত্যাগ করতে হয়েছে গান্ধীবাদী অহিংসার ধারণা। মজার কথা হল, বর্তমান ভারতের রাজনীতি-সমাজনীতির কোথাও গান্ধীর বিন্দুমাত্র অবশেষ আর নেই, তবু তাঁর ছবি - তাঁর মিথকে ঘষে মেজে উজ্জ্বলতর করার চেষ্টার কোনও ঘাটতি নেই। কারণ, এই চেষ্টা রাজনীতিতে ডিভিডেন্ড দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

তিনি অহিংসার পূজারী ছিলেন, এটা গান্ধী সম্পর্কে আর এক মিথ। এটা ঠিক যে, অহিংসাকে তিনি আশ্রয় করেছিলেন তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রামের অস্ত্র হিসেবে, তবে অহিংসা যে তাঁর জীবনের মন্ত্র ছিল, তা নয়। প্রথম দিকে অহিংসা গ্রহণের কারণ হিসেবে বলতেন—'ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়বার মত অস্ত্র আমাদের হাতে নেই বলে বাধ্য হয়ে অহিংসার পথে লড়াই করতে নামব আমরা। অস্ত্র থাকলে আমরা অহিংসার পথে এগোতাম না।'

আসল কারণ যদিও এটাও ছিল না। তাঁর লড়াই অহিংস পথে চলবে—এই জন্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এনেছিল ভারতে এবং তাঁকে নেতৃত্বের সর্বোচ্চ জায়গাটিতে বসানোর জন্য যতরকম প্রচার-অপপ্রচারের দরকার পড়ে সব করেছিল। সুতরাং অহিংসার মন্ত্র উচ্চারণ করা তাঁর কর্তব্য হয়েও দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ইচ্ছা-অনিচ্ছা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস যে কারণেই করে থাকুন না এই মন্ত্রোচ্চারণ—কালক্রমে সেটা দাঁড়িয়ে গেল একেবারে ধর্মাচরণ হিসেবে। এবং এমনই গাঢ় হল সেই ধর্ম যে, মুছে গেল হিতাহিত জ্ঞান, খেয়াল থাকল না বাস্তব-অবাস্তব বিচার ক্ষমতা। এই অবাস্তব ধ্যানধারণার প্রমাণ হিসেবে একটি উদাহরণ পেশ করছি নীচে ; ১৯৪০ সালের ৬ জুলাই সংখ্যার হরিজন পত্রিকায় প্রকাশিত একটি লেখায় ব্রিটিশদের উদ্দেশে তিনি বলেন—

"I want you (British) to fight Nazism without arms..." অর্থাৎ নাৎসীদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ যেন অস্ত্রধারণ না করে। ওই একই রচনায় তিনি আরও বললেন "—I would like you to lay down the arms you have as being useless for saving you or humanity. You will invite our great leader and Signor Mussolini to take what they want of the countries you call your possessions. Let them take possession of your beautiful island, with your many beautiful buildings. You will give all these but neither your souls, nor your minds. If these gentlemen choose to occupy your homes, you will vacate them.

If they do not give you free passage out, you will allow yourself, man, woman and child to be slaughtered, but you will refuse to owe allegiance to them... my non-violence demands universal love, and you are not a small part of it."

গান্ধীর এই মহান উক্তিগুলি পড়ার পর মিত্রশক্তি তো বটেই, নাৎসী হিটলার এবং ফ্যাসিস্ট মুসোলিনী হেসেছিলেন কিনা সে খবর কোথাও ছাপা হয়নি। তাঁকে পাগলা গারদে পাঠাবার চিন্তা ব্রিটিশের মাথায় এসেছিল কিনা, সে খবরও কারও জানা নেই। তবে সাধারণ মানুষ হিসেবে বলতে পারি, অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র দিয়েই লড়তে হয়। এটা গীতার শিক্ষা। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ একথা বলেছিলেন অর্জুনকে। এখন গান্ধী যদি কৃষ্ণের চেয়ে বড় অবতার হন, তাহলে মানতে হয়, কৃষ্ণ ঠিক বলেননি, গান্ধী ঠিক বলেছেন। এব্যাপারে গান্ধীর পক্ষে একটি ছোট্ট উদাহরণ আছে অবশ্য। তা হল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদাহরণ। তাঁর নামে প্রচারিত সেই বহুখ্যাত কথাটি—'মেরেছ কল্‌সীর কানা / তা বলে কি প্রেম দেব না?'

যদিও 'কল্‌সীর কানা' বস্তুটি নিতান্ত নিরামিষ গোছের অস্ত্র, তাতে বড় জোর কপালের পাশটা একটু কেটেছিল চৈতন্যদেবের। কিন্তু অস্ত্রটি যদি অন্যরকম হত? যদি 'মেরেছ কল্‌সীর কানা' না হয়ে 'মেরেছ কামানের গোলা' হত, তাহলে কোনও মহাপ্রভুই বাকিটুকু বলার সুযোগ পেতেন না, ধরাধাম ছেড়ে চলে যেতেন। গান্ধী গীতা পাঠ করেছিলেন, এটা জানা যায়। চৈতন্যদেব তথা বৈষ্ণবধর্ম সম্পর্কেও কিছু পড়াশোনা করেছিলেন, সেটাও জানা যায়। কিন্তু অহিংসার মন্ত্র কতদূর পর্যন্ত চলতে পারে, সেই সাধারণ জ্ঞানটুকু তাঁর জানা ছিল না।

সে যাই হোক, অহিংসা তথা 'universal love'-এর নামে কী ভয়ংকর কথা তিনি বললেন, সেটা একবার খেয়াল করুন। তিনি বললেন 'Let them take possession of your beautiful island'—স্বদেশ সম্পর্কে যাঁর ভালবাসার এই নমুনা, তিনি কিনা ভারত-উদ্ধারের কংগ্রেসী সেনাপতি! আরও ভয়ংকর কথা তিনি বললেন পরের অংশে 'allow yourself, man, woman and child to be slaughtered'! এই একই উপদেশ তিনি দিয়েছিলেন ভারতের শিখ ও হিন্দুদের —'মুসলমানরা যদি তোমাদের সবাইকে হত্যা করে, তোমরা কিন্তু একটি মুসলমানের গায়েও হাত দেবে না। তাহলেই পাঞ্জাব অমর হবে। অহিংসার সেবক হিসেবে নিজেদের বলিদান দিতে প্রস্তুত থাকো তোমরা।' (If all the Punjabis were to die to the last man without killing (a single Muslim), Punjab will be immortal. Offer yourselves as non-violent willing sacrifices - Collins & Lapierre: Freedom at Mid night.)

এই পুস্তকের অন্যত্র এবিষয়ে আরও বিশদ আলোচনা করেছি। আপাতত তাই থামছি। কিন্তু থামার আগে একটি প্রশ্ন আপনাকে করব। পাঠক, আপনি বলুন, একে কি অহিংসা বলে? নাকি অহিংসার আবরণে ঢাকা নপুংসকের আত্মসান্ত্বনা বলে? বিচারের ভার আপনার।

গান্ধী সম্পর্কে আর এক মিথ তিনি সত্যবাদী ছিলেন, কদাপি মিথ্যা উচ্চারণ করতে পারতেন না। একেবারে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের আধুনিক সংস্করণ। যুধিষ্ঠিরের নামে অন্তত একটি মিথ্যা বলার রেকর্ড আছে—'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ', কিন্তু গান্ধীর বেলায় তা-ও নাকি নেই। সত্যের জন্য তিনি জীবন দিতে প্রস্তুত—একথা গান্ধী বারবার বলেছেন। বলেছেন—'সত্যের জন্য সব কিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত, কিন্তু কোনও কিছুর জন্য সত্যকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত নই।

এটাও যে একটি মিথ, সে ব্যাপারে একটি উদাহরণ গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকায় যাওয়ার সময়ের একটি ঘটনা। তখন গান্ধী বাচ্চা ছেলেটি নন, সাতাশ বছর বয়স। লন্ডন থেকে ব্যারিস্টার হয়ে বোম্বেতে এসে আইন ব্যবসা শুরু করেও সাফল্য না আসায় গান্ধী ভারত ছেড়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় যান ১৮৯৩ সালে। যে কাজ নিয়ে যান তিনি, সেটা শেষ হয়ে গেলে ভারতে ফিরে আসেন। কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণের চেষ্টা করেন। আশানুরূপ সাফল্য না পাওয়ায় আবার দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে যাওয়া মনস্থ করেন। ১৮৯৬ সালের ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে গান্ধী এবং আরও প্রায় ছয়শত ভারতীয় নিয়ে দুটি জাহাজ ডারবানের উপকূলে পৌঁছাল। কিন্তু জাহাজ দুটিকে তীরে ভেড়ার অনুমতি দিল না সেখানকার শ্বেতাঙ্গ সরকার। না দেওয়ার কারণ, কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেস পার্টির বার্ষিক সভায় গৃহীত একটি প্রস্তাব। যে প্রস্তাবে শ্বেতাঙ্গ সরকার কর্তৃক দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের নানাভাবে হয়রানি ও অত্যাচারের প্রতিবাদ করা হয়েছিল এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণের দাবি জানানো হয়েছিল। কংগ্রেসের এমনতর প্রস্তাব দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকার ভালভাবে নেয়নি। চারদিকে বিক্ষোভও চলছিল এর জন্য। এমন সময় গান্ধীর জাহাজে থাকার কথা প্রচার হওয়ামাত্র যেন আগুনে ঘি পড়ল। হাজার হাজার শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ জাহাজঘাটায় এসে দাবি জানাতে থাকল জাহাজ দুটি যাতে বন্দরে আসার অনুমতি না পায়, তার জন্য। কিন্তু শেষপর্যন্ত লন্ডনের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও ভারতের ব্রিটিশ ভাইসরয়ের হস্তক্ষেপে তিন সপ্তাহ পর জাহাজ দুটিকে বন্দরে নোঙর ফেলতে অনুমতি দেওয়া হয়। যাত্রীরা একে একে নামতে থাকে। কিন্তু গান্ধী নামতেই জনতার আক্রোশ বাঁধ ভাঙা। তারা গান্ধীকে তাড়া করল, মারল, গায়ে কাদা আর পচা মাছ ছুঁড়ে মারল।

উন্মত্ত জনতার ক্রোধ থেকে বাঁচতে গান্ধী এক ভারতীয়ের দোকানে ঢুকে পড়লেন। দোকানের চারদিক ঘিরে রেখেছে জনতা। দাবি—গান্ধীকে তুলে দিতে হবে তাদের হাতে। তারা 'লোকটাকে টোকো আপেলের গাছে ফাঁসিতে ঝোলাবে।'

জনতার চাপ যখন ক্রমেই বাড়ছে, তখন প্রাণ বাঁচানোর জন্য গান্ধী এক দারুণ চাল দিলেন। এক কৃষ্ণাঙ্গ রাজকর্মচারীর সঙ্গে নিজের পোশাকটা পাল্টে নিলেন, তারপর সারা মুখে এবং শরীরে কালো কুচকুচে রং মেখে আফ্রিকান হলেন এবং এভাবে আফ্রিকান সেজে নিজেকে আফ্রিকান হিসেবে মিথ্যে পরিচয় দিয়ে পালিয়ে বাঁচলেন। (দ্রষ্টব্য : Gandhi Before India by Ramchandra Guha) এই ঘটনা কি সত্যের প্রতি তাঁর অবিচল আস্থা প্রকাশ করে? নাকি এই কথাটাই প্রমাণ করে যে, বাঁচার জন্য মিথ্যে ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিতে কখনো দ্বিধা করেননি তিনি!

এরকমই আরেকটি গান্ধী-মিথ হল জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের প্রতি তাঁর তথাকথিত অগাধ ভালবাসা। বাস্তবে এরকম ভালবাসার উল্টোটাই দেখা গেছে গান্ধীর জীবনে। তিনি ভয়ঙ্কর বর্ণবিদ্বেষী ছিলেন। আফ্রিকার কালো মানুষদের তিনি 'কাফির' বলে উল্লেখ করতেন এবং তাদের সম্পর্কে তীব্র ঘৃণা পোষণ করতেন। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে প্রমাণসহ গান্ধীর এই বর্ণবিদ্বেষ বিশদভাবে আলোচনা করব। শুধু যে আফ্রিকানদের বিরুদ্ধেই তাঁর এই তীব্র জাতিঘৃণা ছিল, তাই নয়, ভারতের অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের জন্যও খুব একটা প্রেম তাঁর ছিল না। পত্রিকার নাম 'হরিজন' রেখেছিলেন বটে, অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের 'হরিজন' বলে ডাকতেন বটে, কিন্তু এগুলি আদতে ছিল মূলত 'দেখনদারী', ইংরেজিতে যাকে বলে Lip Service। তাঁর এই মানসিকতা ডাঃ ভীমরাও আম্বেদকর ধরে ফেলেছিলেন। গান্ধীর সঙ্গে তাঁর মতবিরোধের মূল কারণটিও ছিল এই। এ ব্যাপারেও পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচনা করব আমরা।

তিনি চাইলে রাজসম্পত্তি ভোগ করতে পারতেন, কিন্তু তা না চেয়ে দীন দরিদ্রের মত সাধারণ জীবন যাপন করতেন। গান্ধী চরিত্র সম্পর্কে এ এক বিশাল মিথ। গান্ধী সাহেবী পোষাকের ভক্ত ছিলেন, ব্যারিস্টারি পড়ার সময় যখন লন্ডনে ছিলেন, তখন জীবনযাপনে পাকা ইংরেজ হওয়ার জন্য খাস ইংরেজি পোশাক পরতেন, নিয়মিত নাচের তালিম নিতেন, ইংরেজ যুবতীদের সঙ্গে বিভিন্ন পার্টিতে সময় কাটাতেন, এমনকি নিজে যে বিবাহিত এবং একটি সন্তানের পিতা সেই তথ্য লুকিয়ে রেখে অন্তত একটি যুবতীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক

করেছিলেন। লন্ডনে থাকাকালীন বেশ কিছুবার বেশ্যালয়েও গিয়েছিলেন। এহেন মানুষটি হঠাৎ কেন অর্দ্ধ উলঙ্গ ভারতীয় সাধুর বেশ ধারণ করেছিলেন, তা বুঝতে পারলে তাঁর ধূর্ততার কিছু নিদর্শন মিলবে। গান্ধী জানতেন, ভারতের বেশিরভাগ মানুষ গ্রামে থাকে। এই মানুষদের পোশাকে-আশাকে বাহুল্য বলতে কিছু নেই। ভারতের সাধু-সন্তরাও সাধারণ ভাবে অর্দ্ধ-উলঙ্গ থাকেন। অতএব এই বিপুল জনগণের সামনে শুধু নিজেকে রাজনীতিবিদ নয়, সাধু মহাত্মা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সাহেবি পোশাক বর্জন করা একান্ত জরুরি। তাই তাঁর এই নতুন ভেক-ধারণ। বলা বাহুল্য, তাঁর চেষ্টা সফলও হয়েছিল। অর্দ্ধ-উলঙ্গ ফকিরের বেশ তাঁকে অন্যান্য নেতাদের থেকে অনেক বেশি উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নমাজ পাঠরত মুসলিম মহিলার বেশধারণের প্রসঙ্গটি পাঠকের মনে স্বভাবতই আসতে পারে। মুসলিমদের কত কাছের মানুষ তিনি এটা বোঝানোর জন্য শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে মুসলিম পোষাক পরছেন, সেভাবে গান্ধীও অর্দ্ধ-উলঙ্গ ফকির সেজেছেন দেশের মানুষকে এই কথাটা বোঝাবার জন্যে যে তিনি তাদের কাছের মানুষ। দুটি ক্ষেত্রেই কাজ করেছে কোনও বিশ্বাস নয়, স্রেফ লোক-দেখানো ভড়ংবাজি।

পোশাকের কথা ছেড়ে তাঁর জীবনযাত্রা প্রসঙ্গে আসা যাক। তিনি রেলের তৃতীয় শ্রেণিতে যাত্রা করতেন, কিন্তু এই যাত্রার জন্য তাঁর দলকে (ও পরবর্তীকালে সরকারকে) বিপুল টাকা খরচ করতে হত। পুরো কামরা বুক করতে হত তাঁর একক যাত্রার জন্য। তাঁর সুরক্ষার বিরাট ব্যবস্থা করতে হত। এইজন্যেই সরোজিনী নাইডু একদা কিঞ্চিৎ মজা করে বলেছিলেন—খরচ বাঁচানোর জন্য বাপু রেলের সবচেয়ে নীচু ক্লাসে যান বটে, কিন্তু তাঁর এই কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য আমাদের যে কী বিপুল খরচ করতে হয়, তা যদি তিনি জানতেন! তিনি জানতেন না, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। কিন্তু খরচ নিয়ে তাঁর কখনোই কোনও মাথাব্যথা ছিল না। তাঁর একমাত্র লক্ষ ছিল কীভাবে নিজের ইমেজ বাড়ানো যায়, তাই নিয়ে।

গান্ধী মিতাহারী ছিলেন, খুব সামান্যই খাওয়াদাওয়া করতেন। যতটুকু না হলে শরীর চলে না, ততটুকুই নাকি তিনি খেতেন। গান্ধী সম্পর্কে এ হল আর একটি মিথ। ভারতের সাধক পওহারী বাবার কথা বহুল ভাবে প্রচারিত। তিনি অন্য খাদ্য গ্রহণ করতেন না, একটি শুকনো লংকা ছিল তাঁর দৈনিক খাদ্য। লোকে বলত, তিনি বাতাস খেয়ে বাঁচতেন, তাই পওহারী বাবা। এমন সাধক অনেকেই ছিলেন যাঁদের দৈনন্দিন খাদ্য বলতে একটি-দুটি হরিতকী, কিংবা একটা

শুকনো মির্চি (লংকা)। গান্ধীর মিতাহারের মিথ্ তৈরি হয়েছিল এই সাধকদের কথা মাথায় রেখে। তবে তিনি সত্যিই মিতাহারী ছিলেন না। এম এম কোঠারির লেখা থেকে আমরা জানতে পারি —ভোরবেলায় প্রার্থনার সময় তিনি বেশ কয়েকটি করে আখরোট আর কাঠবাদাম খেতেন। এরপর সকাল সাড়ে পাঁচটায় ১৬ আউন্স (আধ লিটার) কমলালেবু বা মুসাম্বির রস খেতেন। দেড় ঘন্টা পরে সকাল সাতটায় ১৬ আউন্স ছাগলের দুধ এবং ৮ আউন্স (এক পোয়া) কমলালেবু বা মুসাম্বির রস। দুপুর বারোটায় আবার ১৬ আউন্স ছাগলের দুধ এবং তার সঙ্গে নানান সব্জিসহ মধ্যাহ্নভোজ। দুপুর দুটোয় নারকেলের দুধ এক গ্লাস, বিকাল পাঁচটায় আবার ১৬ আউন্স ছাগলের দুধের সঙ্গে ১৯ আউন্স (৫৩২ গ্রাম) খেজুর এবং অন্য ফল ফুটিয়ে গাঢ় করে খেতেন। দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ দুবেলা খেতে পায় না, বিশেষ করে রাত্তিরটা না খেয়ে কাটায় বলে গান্ধী রাতে আর কিছু খেতেন না। কিন্তু দিনভর তিনি যা খেতেন, তা ক'জন ভারতবাসী খাওয়ার ক্ষমতা রাখে - সে বিচার পাঠকরা করবেন।

এই হল গান্ধীর সাদাসিধে জীবনযাপনের মিথ। এবার বলব, তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিথটির বিষয়ে। সেটি হল—'তিনি ভারতকে স্বাধীন করেছেন।' এই মিথ্যা প্রচার গান্ধীকে কতটা মহান করেছে তা জানি না, তবে এর দ্বারা অপমানিত করা হয়েছে নেতাজি সুভাষ সহ এদেশের শত-সহস্র বিপ্লবী বীরকে যাঁরা স্বাধীনতার জন্য নিজেদের জীবন বাজি রেখেছিলেন হাসিমুখে, হাসতে হাসতে ফাঁসিকাঠে বিসর্জন দিয়েছিলেন তাঁদের প্রাণ। গান্ধী এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিষয়ক অধ্যায়ে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, তাই এখানে শুধু একটি তথ্যের উল্লেখ করে দেখাব ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর যথার্থ ভূমিকা কতটুকু।

ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার প্রস্তাব যাঁর মধ্যস্থতায় ও তত্ত্বাবধানে পাশ হয়েছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টে, সেই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড ক্লিমেন্ট এট্‌লি ভারত সফরে এসে দুটি দিন কাটিয়ে গিয়েছিলেন কলকাতায়। ছিলেন কলকাতার রাজভবনে। তখন পশ্চিমবাংলার কার্যনির্বাহী রাজ্যপাল (Acting Governor) হিসেবে দায়িত্বভার ছিল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ফনিভূষণ চক্রবর্তীর। এট্‌লির সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলাপচারিতায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা ওঠে। এট্‌লি যেসব কথা সেদিন বলেছিলেন, সেইসব কথা একটি চিঠির মাধ্যমে চিফ জাস্টিস চক্রবর্তী পরবর্তীকালে জানিয়েছিলেন ঐতিহাসিক ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদারের *A History of Bengal* গ্রন্থের প্রকাশককে। সেই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—"You have fulfilled a noble task by pursuading

Dr. Majumdar to write this history of Bengal and publishing it... In the preface of the book Dr. Majumdar has written that he could not accept the thesis that Indian independence was brought about solely, or predominantly, by the non-violent civil disobedience movement of Gandhi. When I was the acting Governor, Lord Atlee, who had given us independence by withdrawing the British rule from India, spent two days in the Governor's palace at Calcutta during his tour of India. At that time I had a prolonged discussion with him regarding the real factors that had led the British to quit India. My direct question to him was that since Gandhi's 'Quit India' movement had tapered off quite some time ago and in 1947 no such new compelling situation had arisen that would neccessitate a hasty British departure, why did they have to leave? In his reply Atlee cited several reasons, the principal among them being the erosion of loyality to the British Crown among the Indian army and navy personnel as a result of the military activities of Netaji (Bose). Toward the end of our discussion, I asked Atlee what was the extent of Gandhi's influence upon the British decision to quit India. Hearing this question, Atlee's lips became twisted in a sarcastic smile as he slowly chewed out the word, 'm-i-n-i-m-a-l!'" অর্থাৎ, চিফ জাস্টিস চক্রবর্তীর প্রশ্ন ছিল, ১৯৪২-এ গান্ধীর ডাকা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর এমন কী পরিস্থিতি হয়েছিল যে, ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল! উত্তরে এট্‌লি জানিয়েছিলেন, এই সিদ্ধান্তের পিছনে অনেক কারণ ছিল। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ—ভারতীয় সেনাবাহিনী ও নৌসেনাদের মধ্যে ব্রিটিশ রাজের প্রতি ক্রমবর্দ্ধমান আনুগত্যের অভাব। আর এই অভাবের জন্য দায়ী ছিলেন নেতাজি। আলোচনার শেষে স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীর অবদানের কথা ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে এট্‌লির দুই ঠোঁটে বাঁকা হাসি খেলে গিয়েছিল। তারপর তিনি চিবিয়ে চিবিয়ে একটি কথা উচ্চারণ করেছিলেন—'মি-নি-ম্যা-ল', অর্থাৎ 'যৎসামান্য' (তথ্যসূত্র: Subhas Chandra Bose, The Indian National Army and The War of Indian Liberation by Ranjan Borra, published in 'Journal of Historical Review, No. 3, 4, Winter 1982) এই সাক্ষাৎকার অতি অল্প কথায় বুঝিয়ে দেয় স্বাধীনতা যুদ্ধে গান্ধীর ভূমিকা এবং এসম্পর্কে প্রচলিত মিথের আসল চেহারাটি। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা গান্ধী চরিত্রের অন্য দিকগুলির সঙ্গে এই বিষয়গুলিরও বিস্তারিত আলোচনা করব।

তৃতীয় অধ্যায়

গান্ধীর আদর্শবাদ : মুখ ও মুখোশের সহাবস্থান

'গান্ধীবাদ' নামক শব্দটির সঙ্গে পরিচয় নেই, এমন শিক্ষিত ও সচেতন মানুষ সম্ভবত ভারতে পাওয়া যাবে না। শুধু ভারত কেন, সারা পৃথিবী ব্যাপী গান্ধীর নাম বিস্তৃত। তিনি ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রতীক, তিনি প্রেম ও অহিংসার প্রতীক, তিনি সংগ্রামের প্রতীক, তিনি সত্যের প্রতীক। আর এইসব কিছু মিলে তৈরি হয়েছে গান্ধীবাদ। গান্ধী যেমন সমস্তরকম আদর্শের প্রতীক, তেমন গান্ধীবাদ হল সেই মতবাদ যার মধ্যে মনুষ্যজীবনের সমস্ত আদর্শকে একাধারে রাখা হয়েছে। গান্ধীবাদ মানে প্রেম-অহিংসা-ভালবাসা, সত্যাগ্রহ, আদর্শের জন্য বলিদান দিতে প্রস্তুত হওয়া বোঝায়। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এই বিষয়গুলিকেই বলেছি গান্ধী-মিথ। এটাও বলেছি, মিথ হল কল্পনা — বাস্তবের থেকে বহু যোজন দূরে থাকে তার অবস্থান। গান্ধীর ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা কতদূর সত্যি, এই অধ্যায়ে সেটা আমরা দেখব। আমরা এটাও দেখব, বাস্তবের গান্ধীবাদের সঙ্গে আদর্শগত গান্ধীবাদের কতটা মিল আছে। আদৌ মিল আছে কিনা। দেখব, এই অমিলের পিছনে শুধু কি গান্ধী ভক্তদের ভূমিকা আছে, নাকি গান্ধী নিজেও সযত্নে একটা মুখোশ ব্যবহার করে তাঁর আসল মুখকে চাপা দিতে চেয়েছেন।

গান্ধীর সত্যবাদিতা

গান্ধী বলেছেন—সত্যের জন্য আমি সবকিছু ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু কোনও কিছুর বিনিময়ে সত্যকে ত্যাগ করতে পারিনা।

আরও বলেছেন জীবনে কখনো আমি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিনি (I never resorted to untruth in my profession)। এই উক্তি তিনি করেছিলেন তাঁর ব্যারিস্টারি পেশার ব্যাপারে। গান্ধী তাঁর অসফল আইন ব্যবসা সম্পর্কে বলেছেন, এই পেশায় মিথ্যা না বললে চলে না। কিন্তু আমি মিথ্যাকে কখনো সমর্থন করিনি, আমি মিথ্যা কথা বলতে পারতাম না। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে যারা মামলা লড়তে চাইত, তারা তাই আমার কাছে আসত না। আমার ওকালতি বৃত্তির অনেক অংশটাই তাই কেটেছে, গরীব, সৎ মানুষের স্বার্থে।

এজন্যেই সেযুগে বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে এলেও সফলতা পাননি গান্ধী। এজন্যেই তাঁকে ভারতে স্ত্রী-পুত্র রেখে একটা চাকরি নিয়ে যেতে হয়েছিল

দক্ষিণ আফ্রিকায়। তবু মক্কেলের মিথ্যাচারের হাত থেকে একেবারেই কি রেহাই পেয়েছিলেন তিনি? গান্ধী নিজেই স্বীকার করেছেন, পাননি। তবে প্রথমে বুঝতে পারেননি যে, মক্কেল মিথ্যা বলছে। মামলা জেতার পর গান্ধী বুঝতে পারেন, মক্কেল তাঁকে প্রতারিত করেছে। একই অভিজ্ঞতা হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকাতেও। কিন্তু এসব হলেও গান্ধীর চরিত্রের মধ্যে সত্যের প্রতি যে একটা প্রবল আকুলতা ছিল, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। গান্ধী জীবনের ঘটনাগুলিকে ভালভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মিথ্যাচারকে তিনি অন্তর থেকে ঘৃণা করতেন। গান্ধীর যাঁরা সমালোচক তাঁরা বলেন এসব হল তাঁর লোক দেখানো ভড়ং, ঘোর মিথ্যাশ্রয়ী মানুষ ছিলেন তিনি। আর গান্ধীর যাঁরা অন্ধ ভক্ত, তাঁরা বলেন সত্যের প্রতি তাঁর আকুলতা শিশুকাল থেকে। তাঁরা বলেন, গান্ধী হলেন মহামানব, সূর্যের মত সাদা তাঁর চরিত্র। জীবনের নানান সময়ে—কি বাল্যে কি যৌবনে কি প্রৌঢ়ত্বে কি বার্দ্ধক্যে কখনোই তিনি মিথ্যা বলেন নি।

দুটি মতই একেবারে চরমপন্থী। গান্ধী দেবতা নন, মানুষ। দেবতার চরিত্রেও যেখানে অসত্যবাদিতার কালিমা লেগে থাকে, মানুষের চরিত্রে তা থাকবে না, এটা বোধহয় বড় বেশি কল্পনা। যে চরমপন্থীদের কথা প্রথমে বলা হল তাঁরা গান্ধীকে মিথ্যেবাদী বলে দাগিয়ে দিতে কার্পণ্য করেন না বটে, কিন্তু প্রমাণ দিতে গিয়ে জট পাকিয়ে ফেলেন। গুলিয়ে দেন তাঁর চরিত্রের অন্যান্য অসঙ্গতির সঙ্গে। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় চরমপন্থীরা এই ব্যাপারে গান্ধীর মুখের কথা কিংবা তাঁর লিখিত বক্তব্যকে ধ্রুবসত্য ধরে নিয়ে গান্ধীকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে দেন।

দুই মত ও দুই পথের কোনওটিরই অন্ধ যাত্রী নই আমরা। আমরা চেষ্টা করব, এব্যাপারে সত্যকে অনুসন্ধান করতে। দেখব, গান্ধী কি এব্যাপারে সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ, নাকি সত্য সত্যই অসত্যের আশ্রয় তিনি জীবনের কোনও না কোনও সময় নিয়েছিলেন। আবার বলব, মিথ্যারও জাতিভেদ আছে। ছোট মিথ্যা, বড় মিথ্যা। আক্রমণকারীর মিথ্যা, আক্রান্তের মিথ্যা। হত্যা করার জন্য মিথ্যা, আবার প্রাণ বাঁচাবার জন্য মিথ্যা। সব মিথ্যাকে এক মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না। মিথ্যা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের ধারণাকে অনুসরণ করে বলা যায় — দেয়ালের দিকে তাকান। দেয়াল কি কখনো মিথ্যা কথা বলে? বলে না। সে নির্জীব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। যার জীবন আছে, জীবনের তাগিদে সত্যের সঙ্গে মিথ্যার আশ্রয়ও তাকে নিতে হয়। এই মিথ্যা বা ছলনা প্রকৃতিও তাকে শেখায়। আক্রমণকারীর হাত থেকে বাঁচার জন্য অনেক কীট-পতঙ্গ-প্রাণী তার চারপাশের পরিবেশের

সঙ্গে নিজেকে এমনভাবে মিশিয়ে রাখে যাতে তার অস্তিত্ব আলাদাভাবে বোঝা যায় না। মানুষকেও বেঁচে থাকার জন্য কখনো কখনো মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়, তার জন্য তার ভিতরের ঈশ্বরত্বের ক্ষতি হয় না।

বিবেকানন্দ মনুষ্য ধর্মের সত্যকার রূপটি চিনতেন ও জানতেন বলে এমন কথা বলেছিলেন। কিন্তু গান্ধী ভাবের জগতে, স্ব-আরোপিত এক তথাকথিত আদর্শের জগতে বাস করতেন। তাই মিথ্যা তাঁর কাছে অসহনীয় ও অগ্রহণীয় ছিল এবং গান্ধী-সমালোচকদের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে আমাদের বলতেই হয়, গান্ধী এব্যাপারে অনেকটাই পিউরিটান ছিলেন। তবু প্রশ্ন উঠেছে, তিনি কি জীবনে কখনোই মিথ্যাচার করেননি? এই প্রশ্নের উত্তর গান্ধীর বাল্যকাল থেকে খুঁজতে হবে আমাদের।

বাল্যে বা ছাত্রাবস্থায় তিন জনের কাছে মিথ্যে কথা বলে মানুষ। এক, পিতা-মাতা তথা পরিবারের কাছে; দুই, বিদ্যালয়ে তথা শিক্ষকদের কাছে; এবং তিন বন্ধু-বান্ধবের কাছে। পিতা-মাতা বা বড় দুই ভাই কিংবা কাকারা ও পরিবারস্থ অন্যদের কাছে বালক গান্ধী মিথ্যা কথা বলেছেন, এমন ঘটনার কথা জানা যায় না। কেউ এব্যাপারে কিছু বলেননি, এমনকি গান্ধী নিজেও লেখেননি কিছু। বিদ্যালয়ে ও শিক্ষকদের কাছে সদাচারী হিসেবে গান্ধীর নানান গল্পকথা আমরা পড়েছি, সেগুলি যে অসত্য এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। এপ্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা বললে গান্ধী চরিত্রের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে। বিদ্যালয় পরিদর্শক এসেছেন পরিদর্শনে। পাঁচটি ইংরেজি শব্দ তিনি মুখে মুখে বললেন। গান্ধী চারটি শব্দ ঠিকঠাক লিখলেন, একটি ভুল করলেন। Cattle লিখতে গিয়ে Kettle লিখে ফেললেন। মাস্টারমশায় নজর রেখেছিলেন গান্ধীর ওপর। তিনি ইঙ্গিত করে দেখালেন শুদ্ধ বানানটি কী। গান্ধী দেখলেন, বুঝলেন, কিন্তু যা লিখেছিলেন তার পরিবর্তন করলেন না। সেদিন পুরো ক্লাসে একমাত্র তিনিই ভুল করেছিলেন। ছাত্ররা তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করল, শিক্ষকরা তাঁকে বকাবকি করলেন, কিন্তু গান্ধী নিজেই নাকি নিজেকে বলেছিলেন —মিথ্যার আশ্রয় নাওনি তুমি, তুমি ঠিকই করেছিলে।

এই ঘটনার কথা গান্ধী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন পরবর্তীকালে। প্রশ্ন উঠতেই পারে তিনি কি সত্যিকথা লিখেছিলেন? বাল্যকালে এতটা নিষ্ঠা কি ছিল তাঁর সত্যের প্রতি? সদাচারের প্রতি? নাকি পরবর্তী জীবনের বিশ্বাস এবং আদর্শ চাপিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর বাল্যের জীবনে? এর উত্তর হিসেবে গান্ধীর আত্মবিবৃতিকে সত্য বলে মেনে নেওয়া ছাড়া আমাদের অন্য উপায় নেই। কিন্তু

আমাদের সন্দেহটার তাতে পুরোপুরি নিরসন হয় না। হয়না এই কারণে যে, এই সময়ে তাঁর জীবনে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছিল, যা বোধহয় খুব একটা সৎ-আচার নয়। ছাত্রাবস্থায় তিনি তাঁর দাদার এক মুসলিম বন্ধুর সংস্পর্শে এসে ছাগলের মাংস খান, ধূমপান করেন, এমনকি বেশ্যালয়েও যান। তাঁর এই বেশ্যালয়ে গমনের ব্যাপারটি অন্যত্র বিশদভাবে বর্ণনা করেছি আমরা, এখানে সেই প্রসঙ্গে তাই কিছু বলছি না। কিন্তু ঘোর নিরামিষাশী এক গুজরাটি পরিবারের সন্তান হয়ে মাংস ভক্ষণ করলেন তিনি, সারা রাত ধরে ছাগলটি তাঁর পেটের মধ্যে ডাকতে থাকল, অথচ, বাড়ির কেউ তার আঁচটুকু পেল না? এমন কি তাঁর স্ত্রী কস্তুরবাও কিছু জানতে পারলেন না? এবং এই মাংস খাওয়ার অভিজ্ঞতা যে তাঁর একদিনই হয়েছিল তা নয়, আরও কয়েকবার তিনি মাংস খেয়েছিলেন। গান্ধীর বয়ান অনুযায়ী কাকারা সিগারেট খেয়ে ফেলে দিলে গোপনে কুড়িয়ে নিতেন এবং খেতেন। বাবা-মা নাহয় তামাকের গন্ধ তাঁর মুখে পেতেন না, কিন্তু কস্তুরবার তো পাওয়ার কথা। কেননা, তের বছর বয়স থেকেই গান্ধীর শয্যায় তিনি শুতেন এবং সেই বয়স থেকেই শারীরিক সম্পর্ক হত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। স্বামীর ব্যবহারে কোনও অসঙ্গতি তাঁর নজরে পড়ল না এটা রীতিমত অবিশ্বাস্য। গান্ধী কি তাঁর বালিকাবধূকে মিথ্যা কথা বলে চাপা দিতেন নিজের অনাচার? কী জানি! সন্দেহটা কিন্তু থেকেই যায়।

সন্দেহের কথা নাহয় ছেড়েই দিলাম। ধরে নিলাম, তাঁর এইসব অনাচার কমবয়সের বিদ্রোহী মানসিকতারই প্রকাশ, কিন্তু যে বালক মাস্টার মশায়ের ইঙ্গিত সত্ত্বেও অশুদ্ধ বানানকে শুদ্ধ করে নেয়নি, তার চারিত্রিক দৃঢ়তার সঙ্গে উপরে লেখা অনাচারের ঘটনাগুলি কি খাপ খায়? এব্যাপারে আমাদের কল্পনা শক্তিকে আর প্রশ্রয় না দিয়ে থামছি, কিন্তু থামার আগে গান্ধীর সম্পর্কে একটা কথা কিন্তু উচকণ্ঠে বলতেই হয়—গান্ধী তাঁর আত্মজীবনীতে এসব অনাচারের কথা চেপে রাখলে আমরা জানতেই পারতাম না। তিনি চেপে রাখেননি, প্রকাশ করেছেন সবার সামনে। যেটুকু এবং যতটা প্রকাশ করেছেন তার জন্য—সেই সত্যকথনের জন্য তিনি অবশ্যই প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।

বাল্যকাল বা ছাত্রাবস্থা থেকে চলে আসি জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে যখন মানুষ পূর্ণবয়স্ক ও পূর্ণমনস্ক হয়ে ওঠে। এই বয়সে এসে মানুষের মিথ্যাভাষণ পাত্রভেদে চাররকমের হয়। প্রথমত, স্ত্রীর কাছে, দ্বিতীয়ত সন্তানদের কাছে, তৃতীয়ত কর্মক্ষেত্রে তথা বন্ধু ও আত্মীয়দের কাছে এবং চতুর্থত নিজের কাছে। এই চার পাত্রের সঙ্গে গান্ধীর ব্যবহার কখনো মিথ্যাশ্রয়ী হয়েছিল কিনা, সেই প্রসঙ্গে এবার আসি।

এই পর্বে গান্ধী অনেকদিন বিচ্ছিন্ন ছিলেন স্ত্রীর কাছ থেকে। এককভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলেন বেশ কয়েকটি বছর, কয়েকবার বিলেত গিয়েছেন স্ত্রীকে ছাড়া। স্ত্রী সংস্পর্শে অভ্যস্ত গান্ধী এই সময়ে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন বেশ কিছু মহিলা ও পুরুষের সঙ্গে। গান্ধীর নিজের বয়ান অনুযায়ী 'আত্মিক সম্পর্ক' গড়ে উঠেছিল এঁদের সঙ্গে। শারীরিক সম্পর্ক ঘটেছিল কিনা, সে ব্যাপারে গান্ধী নিজে কখনো কিছু বলেননি যখন, আমরা এব্যাপারে কোনও কিছু কল্পনা করতে যাব না। কিন্তু কথাটা হচ্ছে, শারীরিক সম্পর্ক ক্ষণস্থায়ী, তার চেয়ে বড় হল আত্মিক সম্পর্ক। আত্মিক সম্পর্ক সহজে যায় না। স্বামীর সঙ্গে কোনও মহিলার আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন হলে স্ত্রীরা যত ভয় পান, স্বামী লুকিয়ে বেশ্যাগমন করলেও বোধহয় তত ভয় পান না। কস্তুরবা কি এব্যাপারে স্বামীকে কিছু জিজ্ঞেস করেছেন কখনো? জিজ্ঞেস করাটা কিন্তু স্বাভাবিক এবং এসব ব্যাপারে স্বামীরা যে মিথ্যে কথা বলবে সেটাও স্বাভাবিক। গান্ধী কি এব্যাপারে সত্যি কথা বলেছেন কখনো? গান্ধী তাঁর জীবনের কথা প্রচুর লিখেছেন। অক্ষরজ্ঞানহীন কস্তুরবার পক্ষে কিছু লেখা সম্ভব ছিল না। আজকের যুগ হলে তাঁর জবানিতে আর কেউ লিখে দিতেন কস্তুরবার কথা, কিন্তু এই প্রথা চালু হয়নি তখনো। তাই আমরা জানতে পারিনি কিছু। প্রশ্নটা যদিও থেকেই যায়।

সন্তানদের সঙ্গে গান্ধীর সম্পর্কে সর্বদাই দূরত্ব ছিল। স্বাভাবিক বাপ-ছেলের মধ্যে যেমন একটা সম্পর্কের নিবিড়তা থাকে, তেমনটা আদৌ ছিল না। তিনি তাঁর নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, ওরা থাকত নিজেদের মত। গান্ধীর জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিলাল এই শীতল সম্পর্কের প্রথম বলি। একটি সন্তানের পক্ষে তার বাবাকে যতটা অশ্রদ্ধা করা সম্ভব, হরিলাল তাই করত তার বাবাকে। বাবার প্রতি রাগে-ঘৃণায় সে ধর্মান্তর গ্রহণ করে মুসলমান হয়। গান্ধীর একটা বড় মিথ্যাচারের প্রমাণ এই প্রসঙ্গে পাই আমরা। গান্ধী চিরকালই ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। (সেই শ্রদ্ধা ভক্তিতে না ভয়ে, সেই প্রসঙ্গে আপাতত যাচ্ছি না, পরে যাব) সারাটা জীবন মুসলমানদের ভাই বলেছেন, আত্মার আত্মীয় বলেছেন। কিন্তু ছেলে মুসলমান হতেই গান্ধী আশ্রয় নিলেন আর্য সমাজের সন্ন্যাসী স্বামী শ্রদ্ধানন্দের। বললেন বুঝিয়ে সুঝিয়ে যেভাবেই হোক ছেলেকে আবার হিন্দুত্বে ফিরিয়ে আনার জন্য। প্রশ্ন উঠছে, হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক বিষয়ে যে উপদেশ তিনি এযাবৎ দিয়ে এসেছেন, তার সঙ্গে এই ব্যাপারটা কি মিল খেল? এটা কি তাঁর মিথ্যাচার নয়? এই প্রসঙ্গে আরও মিথ্যাচার করলেন তিনি কিছুদিন পর। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ তখন ধর্মান্তরিত মুসলমানদের ফিরিয়ে আনছেন হিন্দু ধর্মে। তাঁর এই কাজের জন্য এক মুসলমান শ্রদ্ধানন্দকে হত্যা করে। গান্ধী

এই হত্যার পর বলেছিলেন —খুনী মুসলমানটি কোনও অন্যায় করেনি, অন্যায় করেছেন তিনি যিনি ধর্মান্তর করাচ্ছিলেন। অর্থাৎ স্বামী শ্রদ্ধানন্দই দোষী। অথচ, নিজের ছেলেকে স্বধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য এই শ্রদ্ধানন্দের সাহায্যই তিনি চেয়েছিলেন। আরও বড় কথা, এতবড় ঘটনার পরও অহিংসার সাধক গান্ধী সেই আততায়ীটির কোনও দোষ দেখতে পেলেন না! এটা সাধারণ মিথ্যাচার না, ভয়ঙ্কর মিথ্যাচার। এই ব্যাপারটি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছি গান্ধীর মুসলিম তোষণ অংশটিতে।

আত্মীয়-বন্ধু-সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁর মিথ্যাচারের ঘটনার কথা কোথাও আমরা দেখতে পাইনি। কিন্তু তাঁর নিজের কাছে নিজের মিথ্যাচারের কিছু নমুনা আমরা দেখতে পাই। একটু আগে উল্লেখ করেছি, গান্ধী তাঁর জীবনে বেশ কয়েকবার বারবণিতাদের ঘরে গিয়েছেন। তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তাদের ঘর পর্যন্তই তিনি গিয়েছেন। তিনটি ঘটনার বিশেষ উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে, তাদের ঘরে গেলেও তাদের শরীরে গমন করেননি। একেবারে শেষ মুহূর্তে তাঁকে উদ্ধার করেছে 'রামনাম'। আমরা ধরে নিতে পারি যে, এই রামনাম হল তাঁর বিবেক (conscience)। কিন্তু তাই যদি হয়, তবে এভাবে উদ্ধার পাওয়ার পর সব কিছু না করতে পারার জন্য রাগ কেন হবে তাঁর? তাঁর তো ওখানে যাওয়ার জন্য ধিক্কার আসা উচিত ছিল নিজের ওপর। তা না হয়ে তাঁর কিনা আফশোস হচ্ছিল। ঘটনার বিবরণ এমনভাবে দিয়েছেন, যেন স্বয়ং রামচন্দ্র এসে তাঁকে ঠেলেঠুলে বারাঙ্গনার ঘর থেকে বার করে দিয়েছেন। কেন যে বারবার তিনি বারাঙ্গনাদের ঘরে যেতেন, সে ব্যাপারে কোথাও কিছু বলেননি। তবে বারাঙ্গনাদের উদ্ধার করতে যে যেতেন না, সে ব্যাপারটা পরিষ্কার। গান্ধীভক্তরা নিদারুণ রাগলেও আমার বিশ্বাস, অবদমিত ও অপূর্ণ কামনা চরিতার্থ করার জন্যই তিনি এতবার তাদের ঘরে গিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করেছি।

প্রশ্নটা হল, গান্ধীর এই কাজকে কি আমরা সদাচার বলব? বারাঙ্গনা গমন প্রসঙ্গে কিছু কথা প্রকাশ করে এবং অনেক কথা অপ্রকাশ রেখে তিনি যা করলেন, তাকে মিথ্যাচার বলাটা কি অন্যায় হবে? কারণ, কোনও ঘটনার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও নির্বাচিত অংশের বর্ণনা দেওয়াটাকে সত্য কথন বলা যায় না।

গান্ধী কোনও সাধারণ মানুষ নন। তিনি একাধারে বিশাল মাপের রাজনীতিবিদ, আদর্শবাদী আবার সন্তও বটেন। মাই এক্সপেরিমেন্টস্ উইথ ট্রুথ তাঁর জীবনবেদ। বহু আলোচিত ও পঠিত সেই বই। গান্ধীর এই বইয়ের নামকরণের

সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জ্ঞানচাঁদ জৈন নামে একজন একটি বই লিখেছেন—মাই এক্সপেরিমেন্টস্ উইথ আনট্রুথ। সেখানে দেখিয়েছেন, ক্ষমতায় থাকতে গেলে রাজনীতিকদের কিভাবে মিথ্যাচার করতে হয়। রাজনীতিক গান্ধী কি তাঁর জীবনে মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছিলেন? এবার সেই প্রসঙ্গে আসা যাক।

রাজনীতিবিদ্দের মিথ্যাচারের সাধারণ ক্ষেত্র হল—এক, আদর্শের প্রতি; দুই, সহযোদ্ধাদের প্রতি; তিন, জাতির প্রতি; এবং চার নিজের প্রতি।

গান্ধীর আদর্শের কথা উঠলে যে বিষয়টি সর্বপ্রথম আমাদের মনে আসে, তা হল তাঁর সত্যাগ্রহ, যার সঙ্গে তাঁর অহিংসা-সম্পর্কিত ধারণাটি গভীরভাবে জড়িত। গান্ধী নিজে কোথাও এই দাবি করেছেন বলে দেখিনি যে, সত্যাগ্রহ নামক রাজনৈতিক অস্ত্রটির আবিষ্কারক তিনি। কিন্তু তাঁর জীবৎকালে 'সত্যাগ্রহ' তাঁর নামের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে, ভক্তকূল যখন তাঁকে সত্যাগ্রহের উদগাতা মহান পুরুষ হিসেবে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে দিতে শুরু করেছেন, তখন গান্ধী স্মিতমুখে সেটা গ্রহণ করেছেন এবং আমরা মেনে নিয়েছি, গান্ধীকে সত্যাগ্রহের জনক হিসেবে। অভিধাটির প্রতি গান্ধীর নীরব সম্মতিকে তাঁর বক্তব্য হিসেবে ধরলে খুব কি অন্যায় হবে? যদি অন্যায় না হয়, তবে বলা যেতে পারে গান্ধী মিথ্যাচার করেছেন। সত্যাগ্রহ আদৌ তাঁর আবিষ্কার নয়, গান্ধীর বহু আগেই সত্যাগ্রহ ছিল। তার নাম অবশ্যই সত্যাগ্রহ বা Quest for Truth ছিল না, কিন্তু তার পদ্ধতি ছিল একই। সম্প্রতি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক Gene Sharp একটি বই লিখেছেন—*Gandhi As A Political Strategist*। এই বইতে তিনি দেখিয়েছেন গণ অহিংস সংগ্রামের (mass non-violent struggle) অন্তত ২০০টি ঘটনার উল্লেখ আছে ইতিহাসে। গান্ধীর সত্যাগ্রহের ২০০ বছর আগে ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে আমেরিকার ঔপনিবেশিকরা যে আন্দোলনে নামে, সেটাও ছিল অহিংস আন্দোলন এবং সেখানে তারা যে কৌশল অবলম্বন করেছিল, তা গান্ধীর সত্যাগ্রহের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর ও দক্ষ ছিল। ঘটনাটা ছিল ব্রিটিশ রাজের প্রবর্তিত স্ট্যাম্প অ্যাক্ট। এই আইনে আমেরিকায় বসত করা ঔপনিবেশিকদের আইনী কাজকর্মের জন্য স্ট্যাম্প ফি ধার্য করা হয়েছিল। এর বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলন এবং সমস্ত রকমের কর প্রদান বন্ধ করে দেওয়া হয়। ইংলণ্ড থেকে আমদানি করা জিনিষপত্র বর্জন করা শুরু হয়। তারা বিকল্প শাসনব্যবস্থা চালু করে সরকারের অনেক কাজ নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়। গান্ধী এই একই পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন ভারতে। কিন্তু তফাৎটা ছিল যে, আমেরিকায় সেই আন্দোলন বিপুলভাবে সফল হয়েছিল, ভারতে যা করতে

পারেননি গান্ধী। এই না পারার অন্যতম কারণ ছিল, গান্ধীর নিজস্ব একটি দর্শন। তাঁর সত্যাগ্রহের দুটি অংশ ছিল। একটি সিভিল ডিসওবেডিয়েন্স অর্থাৎ সভ্যভাবে আইন অমান্য এবং অপরটি গ্রেফতার বরণ করা। গান্ধী মনে করতেন, নিরস্ত্র হয়ে আইন মেনে আইন অমান্য করা হবে এবং তারপর হাজারে হাজারে লাখে লাখে কারাবরণ করে জেলখানা ভরিয়ে দিতে হবে। তাহলে শাসকের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটবে। বলা বাহুল্য, ব্রিটিশ এদেশে 'হৃদয়' নিয়ে চিন্তাভাবনার পক্ষপাতী ছিল না। কোনও সাম্রাজ্যবাদীরই চিন্তাভাবনায় হৃদয় নামক বস্তুটির কোনও অস্তিত্ব থাকে না। অতএব গান্ধীর বেশিরভাগ অসহযোগ আন্দোলন বা সত্যাগ্রহ যেসব বিষয়কে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল, তা সফল হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে মাঝপথেই সত্যাগ্রহ থামিয়ে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে চৌরিচৌরা সত্যাগ্রহের কথা উল্লেখ করা যায়। যদিও, লবণ সত্যাগ্রহে গান্ধীর সাফল্য মন্দ ছিল না। তবে সেই সাফল্য ব্রিটিশের মাথা নত করতে পারেনি। লবণ আইন তুলে নেয়নি তারা।

গান্ধী বিশ্বাস করতেন, বলপ্রয়োগ করে কিংবা কারও ওপর অন্যায় চাপ সৃষ্টি করে দমন করার চেষ্টা সমর্থন যোগ্য নয়। এই সম্পর্কে তিনি বলেছেন —'Coercion cannot but result in chaos in the end.'। আরও—'one who uses coercion, is guilty of deliberate violence, coercion is inhuman.' অথচ, বহু ক্ষেত্রে কাজে করেছেন তার উল্টো। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতি সুভাষ চন্দ্র বসুর ওপর অনৈতিক ও অগণতান্ত্রিক চাপ সৃষ্টি করে তাঁকে কংগ্রেস ছাড়তে বাধ্য করেছেন। কথার ও কাজের এই অমিল কিন্তু মিথ্যাচারের সামিল। শুধু সুভাষ চন্দ্র বসু কেন, কংগ্রেসের সবাই মিলে যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, তা ত্যাগ করতে হয়েছে গান্ধীর চাপে—এমন উদাহরণ কম নেই। গণতান্ত্রিক রীতিনীতির ওপর শ্রদ্ধাহীন এই মানুষটি কিন্তু গণতন্ত্রের কথা বলতে ক্লান্ত হতেন না।

সহযোদ্ধা বা দলীয় সহকর্মীদের প্রতিও তাঁর আচরণ সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে বহুবার। জওহরলাল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন। তাঁকে কংগ্রেস সভাপতি তথা প্রধানমন্ত্রী করার জন্য তিনি তাঁর নিজের নির্ধারিত নিয়ম ভাঙতে দ্বিধা করেন নি। গান্ধীর কথা ও কাজে যদি মিল থাকত, তবে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হতেন জওহরলালের পরিবর্তে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। এটিও গান্ধীর মিথ্যাচারের নমুনা।

এরকম অসংখ্য ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। কিন্তু একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গে ইতি টানব। গান্ধী খুব ভালভাবেই জানতেন যে, তাইহোকু বিমানবন্দরের বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হয়নি। তিনি জানতেন, নেতাজি বেঁচে আছেন। দেশভাগ মেনে নিয়ে স্বাধীনতার প্রস্তাবে তিনি তাই রাজিও ছিলেন,

কেননা, ভয় ছিল নেতাজি এলে জওহরলাল কিংবা প্যাটেল ক্ষমতায় বসতে পারবেন না। কিন্তু নেতাজির এই বেঁচে থাকার কথা চেপে গিয়েছিলেন। সত্যকে এভাবে চেপে দেওয়াটা মিথ্যা প্রচারের থেকে বেশি অধর্ম। আরও বড় কথা, একদিকে তিনি দেশভাগ সমর্থন করছেন, আবার অন্যদিকে দেশভাগের বিরুদ্ধে দিল্লিতে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান বয়কট করছেন। যিনি সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে থাকেন, তাঁর কাছে এমন দ্বিচারিতা আশা করা যায় না।

গান্ধী ও ভাগবত গীতা

ভাগবত গীতা-কে হিন্দুর সমস্ত ধর্মপুস্তকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে গণ্য করা হয়। আঠারটি অধ্যায়ে ব্যাপ্ত ও সাত শত শ্লোকের সমন্বয়ে রচিত এই মহাগ্রন্থ যে শুধু হিন্দুদের কাছেই প্রধান ধর্মগ্রন্থরূপে পরিচিত তা নয়, পৃথিবীর সর্বদেশের সর্ব ধর্মসম্প্রদায়ের কাছে ও সাধারণভাবে পণ্ডিত সমাজের কাছে গীতা একটি অমূল্য গ্রন্থরূপে সমাদৃত। মহাভারতের যুদ্ধের প্রাক্কালে ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেত আত্মীয়-স্বজনকে দেখবার পর এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে এই চিন্তায় বিমর্ষ হয়ে পড়েন তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন। তিনি তাঁর সারথি মিত্র শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করে তাঁর এই বিমর্ষতার উল্লেখ করে বলেন — হে কৃষ্ণ! আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আগত আমার এই পরিজনদের দেখে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে যাচ্ছে, আমার মুখগহ্বর শুষ্ক হয়ে আসছে, আমার শরীর কাঁপছে, প্রতিটি রোমকূপ খাড়া হয়ে যাচ্ছে, আমার গাণ্ডীব ধনুক খসে পড়ছে হাত থেকে, আমার শরীরের ত্বকে জ্বলন হচ্ছে, আমি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না, আমার মনে নানা কথা আসছে। (বিষাদযোগ, শ্লোক ২৮-৩০) অর্জুনের আরও মনে হচ্ছে — 'রাজ্যসুখ ভোগের লোভে আমি কিনা আমার নিজের মানুষদের হত্যা করতে উদ্যত হয়েছি! এতো মহাপাপ! (বিষাদযোগ, শ্লোক ৪৫) এই কথা বলে হাতের ধনুর্বাণ নীচে ফেলে দিয়ে অর্জুন অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে রথে বসে পড়লেন। তিনি আর যুদ্ধ করবেন না। (বিষাদযোগ শ্লোক ৪৭)

অর্জুনের এই মানসিক অবস্থা দেখে তাঁর রথের সারথি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের বিমর্ষতা দূর করে তাঁকে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। বলেছেন, ন্যায়যুদ্ধ কেন সঙ্গত এবং কেন এই যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। কিন্তু শুধু এই কথাগুলির মধ্যে সীমিত নয় গীতা। সমস্ত মত ও পথের, সমস্ত ধর্মীয় ভাবনা ও চেতনার, সমস্ত চিন্তন ও দর্শনের এক আশ্চর্য সমাহার হল গীতা। সেই সঙ্গে ঈশ্বর কী ও কেমন তাঁর স্বরূপ এবং ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য, অমিত শান্তির জন্য মানুষের কী কর্তব্য

হওয়া উচিত তারও দিশা আছে গীতা-তে। এই সামগ্রিক জীবনদর্শনই হল গীতার সার। গীতার মধ্য দিয়ে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে, এককথায় আমাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের কী কর্তব্য, কী অকর্তব্য — সমস্ত ব্যাপারে উপদেশ দেওয়া আছে।

গান্ধী বারবার বলেছেন, গীতা তাঁর অতীব প্রিয় ধর্মগ্রন্থ। বলেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন গীতা, কোরান এবং বাইবেল তিনি পাঠ করেছেন তন্নিষ্ঠভাবে। কোরান যে তিনি পাঠ করেছিলেন এবং কোরান-এর ওহি (বাণী) -গুলিকে যে তিনি রীতিমত সমীহ করে চলতেন, সেটা বোঝা যায় মুসলমানদের সম্পর্কে তাঁর প্রেম ও ভক্তির বহর দেখে। যদিও অনেকে বলেন, ভক্তি নয়, ভয়। জীবনের সর্ব অবস্থাতে সকল পর্যায়ে তিনি সমর্থন করে গেছেন মুসলমানদের। সম্ভবত কোরান-এ কাফির (বিধর্মী)-দের প্রতি উচ্চারিত বিভিন্ন বাণী তাঁর এই ভয়ের কারণ। তার সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন দু-একটি এমন ঘটনা ঘটেছে যেখানে মুসলমানদের হাতে তিনি মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন — এই সব ঘটনারও কিছু যোগ থাকতেই পারে। খ্রিস্টধর্মগ্রন্থ বাইবেল ও খ্রিস্ট ধর্মের মূল পুরুষ যিশু খ্রিস্ট সম্পর্কেও যে তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল, তার প্রমাণও পাওয়া যায়। ব্যারিস্টারি পড়ার সময় লন্ডনে থাকাকালীন মাঝে মাঝেই যে তিনি গির্জায় যেতেন,তারও প্রমাণ আছে। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও তিনি চার্চে যেতেন, সেখানকার পাদ্রীদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন, এ খবরও পাওয়া যায়। গান্ধীর প্রথম জীবনীকার ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকারই এক গির্জার পাদ্রী।

ত্যাগের যে ধারণার কথা, যে কষ্টসহিষ্ণুতার কথা গান্ধীর আদর্শের অন্যতম প্রধান দিক অনেকের মতে তার পশ্চাতে খ্রিস্ট ধর্মের এবং স্বয়ং যিশু খ্রিস্টের অবদান আছে। কিন্তু বারংবার সে কথা বললেও গান্ধীর জীবনে তথা তাঁর আদর্শ গীতা-র বাণীকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে — এই ধারণা করাটা একদমই ঠিক নয়। কেন ঠিক নয়, সেই আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গান্ধী বলেছেন, হিন্দুদের দুটি ধর্মগ্রন্থ তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবদগীতা এবং তুলসীদাসী রামায়ণ। তুলসীদাসের রামায়ণ হিন্দিতে রচিত, অতএব ধরে নেওয়া যায়, হিন্দিতেই তিনি পাঠ করেছেন রামায়ণ। কিন্তু গীতা কোন ভাষায় পড়েছেন তিনি, সে তথ্য পরিষ্কারভাবে বলেননি কোথাও। সংস্কৃতে পড়ে থাকতে পারেন, হিন্দিতে পড়ে থাকতে পারেন অথবা ইংরেজিতেও পড়ে থাকতে পারেন। ইংরেজিতে পড়ার সম্ভাবনাটা এই কারণে যে, ততদিনে

গীতা ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে গেছে। সাধারণভাবে ভাষ্যসহ গীতা পাঠ করাটা নিয়ম। এই ভাষ্য অর্থাৎ গীতা-র ব্যাখ্যা এক এক মনীষী বা পণ্ডিত এক এক ভাবে করেছেন। তাঁদের বিবেক-বিচারবুদ্ধি মত। গান্ধী গীতা-র কোন্ ভাষ্য পাঠ করেছিলেন, তা বলেননি। তিনি কি মূল সংস্কৃত গীতা (টিকা ছাড়া) পাঠ করেছিলেন? 'The purpose of memorizing the Gita' অর্থাৎ গীতা মুখস্থ রাখার প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেনও সেই কথা — 'For serious students, it is best to understand the Gita in its original form, i.e., in Sanskrit. However, those who find this difficult, should understand and memorise it in any other language.'

গান্ধী ছাত্র হিসেবে না ছিলেন মেধাবী, না ছিলেন সিরিয়াস। লন্ডনে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়ে এবং পরবর্তীকালে দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন সময়ে ইংরেজি ভাষাকে তিনি ভালভাবে রপ্ত করেছিলেন বটে, কিন্তু সংস্কৃতে যে তাঁর ভাল ব্যুৎপত্তি আছে, এবিষয়ে কিছু জানা যায় না। স্কুলে বা স্কুলের বাইরে কিংবা পরবর্তীকালে তিনি বিশেষ ভাবে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেছিলেন — এমন কথা তিনি নিজে তো কখনও বলেননি, তাঁর কোনও ভক্ত জীবনীকারও বলেননি। তাহলে মূল সংস্কৃতে গীতা তিনি পাঠ করেছিলেন কিভাবে এবং পাঠ করে তার অর্থ অনুধাবন করেছিলেন কিভাবে? অবশ্য এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, গান্ধী কখনো দাবি করেননি যে, তিনি সংস্কৃতে গীতা পড়েছেন। যে কথাটি তিনি বলেছেন, তা হল, যারা সিরিয়াস হয়ে গীতা পড়তে চায়, তাদের সংস্কৃতে পড়াই ভাল। তবু তাঁর এইকথার ভিত্তিতে ধরে নিলাম তিনি মূল সংস্কৃতে রচিত গীতা-ই পাঠ করেছেন, কোনওরকম হিন্দি অনুবাদ ও টিকা ছাড়া এবং এই কারণেই প্রশ্ন ওঠে, এভাবে পঠিত গীতা-র উপদেশ কি তিনি ঠিকমত বুঝতে পেরেছিলেন? যদি বুঝে থাকেন, তবে গীতা-র উপদেশের সম্পূর্ণ উল্টো দিকে গিয়ে তাঁর অহিংসা সম্পর্কিত বাণী, তাঁর সত্য (truth) সম্পর্কিত বাণী, তাঁর স্বার্থত্যাগের বাণী, তাঁর অন্যান্য বাণী দিলেন কিভাবে? গীতা যদি তিনি সত্যিই পড়ে থাকেন এবং বুঝে থাকেন, তবে গীতা-র বাণীর পাশাপাশি একই নিঃশ্বাসে কোরান-এর বাণী উচ্চারণ করেন কিভাবে? গীতা এবং কোরানের মধ্যে একটা ছোট আর একটাকে বড় হিসাবে দেখাচ্ছি না, শুধু বলতে চাইছি, এই দুই ধর্মশাস্ত্র কি চরিত্রগত দিক দিয়ে এক ধরণের? বোধহয় নয়।

এসব কথা বলার আরও একটা কারণ - তিনি নিজে লিখেছেন — "We should never distort or twist any of the original principles from these scriptures to suit our convenience." অথচ, নিজে ঠিক এই কাজটি

করেছেন। গীতা-র উপদেশের ব্যাখ্যা করেছেন নিজের সুবিধামত। গীতা-কে 'ঢাল' হিসেবে ব্যবহার করেছেন নিজের তথাকথিত আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

প্রথমে বলি, ন্যায়যুদ্ধে হিংসার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গীতা-র উপদেশের কথা। গীতা-য় অর্জুনকে ন্যায়যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তার কথা বোঝাতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন — তুমি শোকার্ত হচ্ছ তাদের জন্য, যাদের জন্য শোকার্ত হওয়া উচিত নয়। আবার তুমি জ্ঞানের কথা বলছ। যে জ্ঞানী সে কখনো জীবিত বা মৃত কারো জন্যই শোক করে না।' (সাংখ্য যোগ: শ্লোক ১১)। বলছেন, 'ন্যায়যুদ্ধ সর্বদাই ক্ষত্রিয়ের কাছে স্বাগত।' (ঐ: শ্লোক ৩২); 'ক্ষত্রিয় হয়েও যদি ন্যায়যুদ্ধে অবতীর্ণ না হও, তবে তোমার কর্তব্য পালনের অধিকার হারাবে, তোমার সুখ্যাতি হারাবে এবং তুমি পাপ অর্জন করবে।' (ঐ: শ্লোক ৩৩); 'যদি ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ তুমি না করো, তোমার শত্রুরা তোমার শক্তিকে তাচ্ছিল্য করবে, তোমাকে অপমানসূচক কথা বলবে। একজন মানুষের কাছে এর চেয়ে বেশি যন্ত্রণার আর কি কিছু হতে পারে?' (ঐ: শ্লোক ৩৬)

গীতা-র এইসব উপদেশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন গান্ধীর অহিংসা সম্পর্কিত এই কথাগুলিকে:

(এক) গান্ধী মনে করতেন, মুসলমানরা হিন্দুদের ভাই। অতএব ভাইয়ের বিরুদ্ধে হিন্দুদের অস্ত্রধারণ করা কখনোই উচিত নয়। তা যতই কৌরবদের বিরুদ্ধে পাণ্ডবরা যুদ্ধ করে থাকুক না কেন। অতএব মুসলমানরা যদি পাকিস্তানে আক্রমণ করে হিন্দুদের? তাহলে কি হিন্দুরা লড়াই করবে? নাকি দিল্লিতে পালিয়ে চলে আসবে? গান্ধীর উত্তর: — "Why they did not die there? I still hold on to the belief that we should stick to the place where we happen to live, even if we are cruelly treated, and even killed. Let us die if the people kill us, but we should die bravely with the name of God on our tongue... Even if our men are killed, why should we feel angry with anybody? you should realise that even if they are killed, they have had a good and proper end."(২৩.১১.১৯৪৭-এ দেওয়া গান্ধীর ভাষণ)

(দুই) দিল্লিতে এক উদ্বাস্তু শিবির পরিদর্শন করার পর গান্ধী পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুদের প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন — "If all the Punjabis were to die to the

last man without killing (a single Muslim), Punjab will be immortal. Offer yourselves as non-violent willing sacrifices" (দ্রষ্টব্য: Collins and Lapierre, *Freedom at Midnight* : Page 385)

(তিন) ইতিহাস বলে যে, ভারতে দীর্ঘ শাসনকালে যখনই কোনও হিন্দু রাজ্য বা মহল্লা মুসলমানদের হাতে আক্রান্ত হয়েছে, তখন শুধু যে হত্যা, লুণ্ঠন, ধ্বংস করেই আক্রমণকারীরা শান্ত হয়েছে তা নয়, হিন্দু নারীদের ধর্ষণ করা ছিল তাদের একটা রুটিনমাফিক কাজ। প্রাক্-স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা-উত্তরকালে আজ পর্যন্ত আক্রমণ ও অত্যাচারের এই ধারা একইভাবে অব্যাহত। কারণ, কোরান-এর নির্দেশ অনুযায়ী এই কাজ শুধু যে সঙ্গত তাই নয়, এই কাজ যে করে, সে আল্লার প্রিয়পাত্র হয়। এই ব্যাপারে হিন্দুদের কী করণীয়, তারা কি মা-বোনের ইজ্জত রক্ষার জন্য অস্ত্র হাতে নেবে? গান্ধীর উত্তর, কখনোই না। হিন্দুর করণীয় হল — "He would kiss the feet of the (Muslim) violator of the modesty of a sister" (দ্রষ্টব্য : নবজীবন পত্রিকা, ৬ জুলাই ১৯২৬)

(চার) দেশভাগের অব্যবহিত আগে হিন্দু ও শিখ রমণীরা যখন পশ্চিম পাঞ্জাবে বিপুলভাবে ধর্ষিতা হচ্ছে, তখন গান্ধীর বক্তব্য রীতিমত চমকপ্রদ। তিনি বলেছেন — "If a Muslim expressed his desire to rape a Hindu or a Sikh lady, she should never refuse him but cooperate with him. She should lie down like a dead with her tongue in between her teeth." (*Freedom at Midnight* by Collins and Lapierre, Page-479)

চাইলে আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় এরকম। কিন্তু বোধহয় তার প্রয়োজন নেই। যা দেওয়া হয়েছে, যথেষ্ট। এখন পাঠক, আপনিই বলুন, গীতা-র কোথায় অহিংসার এমন ঘৃণিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কোথাও এই মানসিকতার সামান্য ভগ্নাংশও পাবেন না। তবু গান্ধী দাবি করেন, গীতা তাঁর প্রাণের চেয়েও প্রিয়। যখন তিনি বিমর্ষ হন, তখন গীতা-ই নাকি তাঁর বিমর্ষতা দূর করে।

যে গীতা তাঁর এত প্রিয় গ্রন্থ, সেই গীতা-র উপদেশের এমন কদর্থ ভাবা যায় কি কখনো? এমন প্রশ্ন যে উঠতে পারে, গান্ধী সেকথা আগেভাগেই ভেবে রেখেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, গীতা-র বাণী তথা সামগ্রিকভাবে হিন্দুর তাবৎ ধর্মশাস্ত্রের শিক্ষার সঙ্গে তাঁর শিক্ষার একটা বিরাট পার্থক্য আছে। রামমোহন রায়, দয়ানন্দ সরস্বতীর মত বিখ্যাত সমাজসংস্কারকরা বলেছেন যে আমাদের

মূলধর্ম কলুষিত হয়ে গেছে। হিন্দুধর্মকে বাঁচাতে হলে সেই মূলে ফিরতে হবে। পক্ষান্তরে গান্ধী মনে করতেন, মূলে ফেরা নয়, মূল ধর্মের নূতন ব্যাখ্যা তাঁর ক্ষমতার উৎস। এই নূতন ব্যাখ্যার তাগিদে তিনি বলেছেন, গীতায় যে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, সেই যুদ্ধ বাইরের কোনও শত্রুর সঙ্গে নয়, এই শত্রু বাস করে আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে। এই নতুন ব্যাখ্যার তাগিদে কৃষ্ণচরিত্রের ঐতিহাসিকতা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। বলেছেন, গীতা-য় যে কৃষ্ণকে আমরা দেখি, তিনি কাল্পনিক — "Krishna of the Gita is perfection and right knowledge personified; but the picture is imaginary"; কৃষ্ণ চরিত্র সম্পর্কে এমন কথা যে ইতিপূর্বে কেউ বলেননি তা নয়। কৃষ্ণ ঐতিহাসিক চরিত্র নন, এমন কথাও বলা হয়েছে। এই পুস্তকে ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়েছি, একই মন্তব্য করা হয়েছে যিশু খ্রিস্টের ঐতিহাসিকতা নিয়ে। কিন্তু খ্রিস্টের ব্যাপারে এমন কথা যাঁরা বলেছেন, তাঁরা রাজনৈতিক নেতা নন। গান্ধী তা নন। তিনি রাজনীতি করেন, পাব্‌লিক নিয়ে কাজকারবার করতে হত তাঁকে। অতএব একটু রয়ে সয়ে, গুছিয়ে গাছিয়ে, ঢেকে ঢুকে বলাটা ভাল। তাই কৃষ্ণ চরিত্রকে কাল্পনিক বলেও তিনি একটু সামলে নিয়ে আবার বললেন — "This does not mean that Krishna, the adored of his people, never lived. But perfection is imagined. The idea of a perfect incarnation is an after growth."

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠতে পারে, কৃষ্ণচরিত্রের এত বড় ব্যাখ্যা দেওয়ার যোগ্যতা কি গান্ধীর আদৌ ছিল? হিন্দুশাস্ত্র এবং ধর্ম বিষয়ে এত সামান্য পড়াশোনা করে তাঁর স্পর্ধা হয় কিভাবে যে, গীতা ও কৃষ্ণচরিত্র নিয়ে এক্সপার্ট ওপিনিয়ন দেন? এর একটাই উত্তর, নিজেকে তিনি সববিষয়ে মহাজ্ঞানী ভাবতে শুরু করেছিলেন। বিশ্বাস করতেন, তিনি দ্বিতীয় ঈশ্বর। তাঁর অহংবোধ ও অহমিকা এই জায়গায় তুলে নিয়ে গিয়েছিল তাঁকে। তাই যে রাজধর্ম তথা ক্ষত্রিয় ধর্মের কর্তব্যের ব্যাখ্যা নিয়ে গীতা-র কথারম্ভ, সেই ধর্ম সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে অহিংসা নিয়ে একটা পাগলামির প্রদর্শনী চালিয়ে গিয়েছেন। আর তাঁর সেই পাগলামির মাশুল গুনতে হয়েছে হতভাগ্য দেশবাসীকে। যে দেশবাসীকে রক্ষা করা ছিল তাঁর প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। বলা বাহুল্য, গান্ধীর জীবদ্দশাতেই তাঁর তথাকথিত অহিংসার আদর্শ অচল পয়সার মত মূল্যহীন হয়ে গিয়েছিল। গীতা-র মত মহাগ্রন্থ না পড়েও পড়ার ভান করলে, না বুঝেও বোঝার ভান করলে এবং সর্বোপরি নিজের খেয়াল খুশিমত অর্থান্তর করলে এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। যা হওয়ার ছিল, তাই হয়েছে।

বর্ণবিদ্বেষী গান্ধী

সারা পৃথিবী জুড়ে গান্ধীকে দেখা হয় শান্তি, অহিংসা, সংযম ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতিমূর্তি হিসেবে। খ্রিস্টান ভক্তরা তাঁকে বলেছে - যিশু খ্রিস্টের পর পৃথিবীর মহত্তম সন্তান। হিন্দু ভক্তরা অবতারবাদী, তারা দশাবতারের সূচি থেকে কল্কিদেবকে হঠিয়ে দিয়ে সেখানে তাঁকে ঢুকিয়েছে। বলেছে, বিষ্ণুর দশম অবতার তিনি। যাঁরা এতটা গান্ধী প্রেমে হাবুডুবু খান নি, তাঁরা বলেন, গান্ধী ভগবান অবশ্যই নন, কিন্তু ভগবৎ-চরিত্রের সমস্ত গুণাবলী আছে তাঁর মধ্যে। এইজন্যেই তিনি মহাত্মা। এই বইয়ে আমরা আলোচনা করছি, কেন তিনি মহাত্মা নন। কেন তিনি দেবতা নন। যদি তিনি মহাত্মা হতেন, তাহলে মানুষে ভেদাভেদের যে মানসিকতা আমরা চারপাশে দেখি, সেটা তাঁর মধ্যে থাকার প্রশ্নই উঠত না। সবাইকে একই ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে তিনি দেখতেন। কিন্তু সত্যিই কি তাই দেখতেন তিনি? এবার সেই আলোচনা।

১৮৯৩ সালে দাদাভাই আব্দুল্লা কোম্পানির আইন বিষয়ক পরামর্শদাতা র চাকরি নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাতে যান গান্ধী। চাকরির মেয়াদ ছিল এক বছরের, কিন্তু তারপরেও তিনি থেকে যান সেখানে। মাঝে ১৮৯৬ সালে এবং ১৯০১ সালে অল্প কিছুদিনের জন্য ভারতে ফিরে আসেন, আবার চলে যান। পাকাপাকি ভাবে ভারতে ফিরে আসেন ১৯১৫ সালে। দীর্ঘ প্রায় একুশ বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় কাটিয়েছেন তিনি। এই সময়ে বিভিন্ন নামী ও দামী শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে হৃদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাঁর। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, দক্ষিণ আফ্রিকার মূলবাসী যারা, সেই কালো মানুষদের একজনের সঙ্গেও গান্ধীর কোনও মিত্রতা গড়ে ওঠেনি। বিশাল টলস্টয় ফার্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি, বন্ধু কালেনবাখের সঙ্গে মিলে, সেখানেও কোনও কৃষ্ণাঙ্গ কখনও থাকেন নি। অথচ, তাদের থাকাটা ছিল প্রথম ও প্রধান। বিদেশী মিশনারী বা সমাজ সংস্কারকরা যখন যেখানে গিয়েছেন সেখানে অনেক সংস্থা গঠন করেছেন যার সদস্য হত সেখানকার দেশীয়রা। এর উদাহরণ ভারতে অজস্র আছে, কিন্তু গান্ধী তা করেন নি। সচেতনভাবে তিনি দূরত্ব বজায় রেখেছেন কৃষ্ণাঙ্গদের সঙ্গে। কেন এটা করেছিলেন, সেই বিষয়টা আলোচনা করলে আমরা গান্ধী চরিত্রের বেশ কিছু অন্যরকম দিক দেখতে পাই। প্রেটোরিয়া এবং জোহানেস্‌বার্গের সাধারণ পাঠাগারে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রকাশিত গান্ধীর নিজস্ব পত্রিকা 'ইনডিয়ান ওপিনিয়ন'-এর সমস্ত সংখ্যা সযত্নে রক্ষিত আছে। সেইসব সংখ্যাতে, এছাড়া গান্ধী রচনাসংগ্রহে দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের

সম্পর্কে তাঁর যেসব কথা লিপিবদ্ধ আছে, সেগুলি পাঠ করলে গান্ধীকে একজন আদ্যোপান্ত বর্ণবিদ্বেষী না বললে মিথ্যাচার করা হবে। কেমন ছিল সেই বর্ণবিদ্বেষের চেহারা?

নোংরা কাফির (Raw Kaffir) : দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষদের বেশিরভাগই হল বানটু উপজাতির মানুষ। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশরা যাদের বলত, কাফির (উচ্চারণে আসে ক্যাফার)। যারা ভদ্র, উদারমানসিকতা সম্পন্ন ব্রিটিশ, তারা এই শব্দটিকে ব্যবহার করতেন না। এই কারণে করতেন না, কারণ তাঁরা মনে করতেন, মানুষকে তুচ্ছ করা হয়েছে, অপমান করা হয়েছে এই শব্দটির দ্বারা। গান্ধীর মধ্যে এই উদার মানসিকতার ছিটেফোঁটাও ছিল না। কৃষ্ণাঙ্গদের তিনি মনুষ্যেতর জীব বলে মনে করতেন। এই বিষয়ে কতটা বিদ্বেষমূলক ছিল তাঁর মানসিকতা, তার লিখিত প্রমাণ প্রথম মেলে ১৮৯৬ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের এক সভায় দেওয়া তাঁর এই ভাষণ থেকে। ওই সভায় দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়দের অধিকার রক্ষার সংগ্রাম প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন — 'Ours is one continued struggle against degradation sought to be inflicted upon us by the European, who desire to degrade us to the level of raw kaffir, whose occupation is hunting and whose sole ambition is to collect a certain number of cattle to buy a wife with, and then pass his life in indolence and nakedness.' (আমাদের সংগ্রাম হল নোংরা কাফিরদের স্তরে আমাদের যেভাবে নামিয়ে দিতে চেষ্টা করছে ইউরোপীয়রা, সেই চেষ্টার বিরুদ্ধে। এই কাফিরদের কাছে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল গোরু মোষের পরিমাণ বাড়ানো এবং তার জোরে একটা বউ কিনে আনা, তারপর সারাজীবন ন্যাংটো হয়ে অলসভাবে কাটানো।) তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেওয়া যায় যে, কৃষ্ণাঙ্গদের জীবনচর্যা গান্ধীর এই উক্তিরই অনুরূপ ছিল, তথাপি সে কথা এমন ভাবে বলাটা কি সভ্য মানসিকতার পরিচয় বহন করে? এই একই কারণ দেখিয়ে য়ুরোপীয়রা তো একদিন কম অবজ্ঞা করেনি ভারতীয়দের। তার বেলা? প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় গান্ধীর এই বক্তব্য বহুল প্রচারিত হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং তিন মাস পরে গান্ধী তাঁর পরিবার নিয়ে যখন ফিরেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায়, তখন ডারবান জাহাজঘাটায় বিরাট সংখ্যক কৃষ্ণাঙ্গ জনতা প্রতিবাদ জানানোর জন্য উপস্থিত হয়েছিল, তারা গান্ধীকে হাতের নাগালে পেয়ে রীতিমত মারধরও করেছিল। সে যাত্রায় গান্ধীকে বাঁচান ডারবানের পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট আর সি আলেকজান্ডার এবং তাঁর স্ত্রী। তাঁরা অনেক কষ্টে

গান্ধীকে উদ্ধার করে পারসী রুস্তমজী নামের এক ভদ্রলোকের দোকানের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। জনতা ঘিরে থাকে সেই দোকান। তখন আলেকজান্ডারের পরামর্শে গান্ধী তাঁর সাজপোশাক পাল্টে নেন। তার আগে জনতাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা করে সরকারি অফিসের এক কৃষ্ণাঙ্গ পিওনকে ডেকে এনেছিলেন পুলিশ সুপার। তার সঙ্গে হয় পোশাকের অদলবদল। শরীর নাহয় ঢাকা পড়ল, কিন্তু মুখ? সে ব্যবস্থাও হল। ভুষো কালিতে মুখ কালো করে কৃষ্ণাঙ্গ সেজে তবে পালান গান্ধী। পরে জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে আলেকজান্ডার বলেন যে, গান্ধী সেখানে আসেনইনি। বিক্ষোভকারীদের কয়েকজন প্রতিনিধিকে সরেজমিনে এসে দেখে যেতেও বলেন তিনি। তারা ঢুকেছিল গান্ধীকে খুঁজতে। কিন্তু পায়নি।

১৯০৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকার একটি আইন প্রণয়ন করে, শহরী এলাকার অশ্বেতাঙ্গদের জন্য। এই আইনে বলা হয়, সমস্ত অশ্বেতাঙ্গকে সরকারের কাছে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। এই প্রসঙ্গে ভারতীয়রা যাতে সরকারি এই ব্যবস্থার আওতার বাইরে থাকতে পারে, তার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের সঙ্গে ভারতীয়দের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে গান্ধী বলেন — 'It is one thing to register natives who would not work, and whom it is very difficult to find out if they absent themselves but it is another thing and most insulting — to expect decent, hard-working and respectable Indians, whose only fault is that they work too much, to have themselves registered and carry with them registration badges.'। অর্থাৎ এখানেও সেই এক কথা কৃষ্ণাঙ্গরা কত খারাপ আর ভারতীয়রা কত ভাল। হতেই পারে। কিন্তু ভারতীয়দের ভাল করতে গিয়ে কৃষ্ণাঙ্গদের অপমান করার কী কারণ এবং সেই কারণ কতটা সংকীর্ণতাবাদী— এই প্রশ্ন একবারও কেন এল না তাঁর মনে?

নাটাল কর্পোরেশন বিলের বিরোধিতা করতে গিয়ে ১৯০৫ সালের ১৮ মার্চ তারিখে গান্ধী তাঁর সংবাদপত্রে লিখলেন — 'Clause 200 makes provision for registration of persons belonging to uncivilized races, resident and employed within the Borough. One can understand the necessity of registration of Kaffirs who will not work but why should registration be required for indentured Indians who have become free and for the descendants about whom the general complaint is that they work too much?' অর্থাৎ এই আইন কাফিরদের জন্য অবশ্যই উচিত, কিন্তু ভারতীয়রা তো তা নয়। তাদের ক্ষেত্রে একমাত্র অভিযোগ, তারা বড় বেশি কাজ করে।

কাফিররা দয়া দেখাবার উপযুক্ত পাত্র নয় : 'দি ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন' পত্রিকার ১৯০৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর তারিখের সংখ্যায় গান্ধী একটি প্রবন্ধ লিখলেন। যার শিরোনাম — 'The Relative Value of the Native and the Indians in Natal'। সেখানে কৃষ্ণাঙ্গ জাতীয়তাবাদী নেতা রেভারেন্ড ডিউব-এর একটি বক্তব্যকে তুলোধোনা করার কাজে নেমে পড়েন গান্ধী। রেভারেন্ড ডিউব বলেছিলেন — দেশের উন্নতি করার ক্ষমতা আফ্রিকানদের আছে, যদি তারা সে সুযোগ পায়। এই নির্বিষ ও সাধারণ কথার বিরুদ্ধে কোনও বিস্ফোরক মন্তব্য করার প্রয়োজন ছিল না গান্ধীর, কিন্তু তাঁর বর্ণবিদ্বেষ এতটাই প্রবল ছিল যে, তিনি কলম ধরলেন এবং লিখলেন — 'A little judicious extra taxation would do no harm; in the majority of cases it compels the native to work for at least a few days a year.'। অর্থাৎ এখানেও কালো মানুষদের বিরুদ্ধে কাজ না করার সেই অভিযোগ এবং অভিযোগটা করতে গিয়ে যার বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন করছিলেন (যদিও তা কেবলমাত্র ভারতীয়দের জন্য), সেই ব্যাপারটাই ভুলে মেরে দিলেন। যদি এইটুকু বলে শেষ করতেন, তাও নাহয় কথা ছিল। কিন্তু তাঁর ঘৃণা যে কত গভীর ছিল, সেটা বোঝাতে গিয়ে লিখলেন — 'Now let us turn our attention to another and entirely unrepresented community - the Indians... while the native has been of little benefit to the state, it owes its prosperity largely to the Indians. While native loafers abound on every side, that species of humanity is almost unknown among Indians here.' কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি এতটা ঘৃণা সম্ভবত ঔপনিবেশিক ইউরোপীয়দেরও ছিল না।

কাফিরদের কেন পুলিশ করা হচ্ছে? : টাইম্স্ অফ লন্ডন পত্রিকার ১২ নভেম্বর, ১৯০৬ সংখ্যায় কাফির পুলিশদের বিরুদ্ধে গান্ধী অভিযোগ করেন যে এশীয়দের বিরুদ্ধে সরকারের আনা রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টের অপব্যবহার করছে এই কাফির পুলিশরা। ইনডিয়ান ওপিনিয়ন পত্রিকার ৮ জুন ১৯০৭ সংখ্যায় তিনি বললেন, এই আইনের আওতায় কাফির এবং কেপ বয়দেরও নিয়ে আসা উচিত ছিল এবং আক্ষেপ করলেন এই বলে যে, এই আইন — does not apply to Kaffirs and Cape Boys। তিনি আরও বললেন, সরকারের এই আইন একটি জঘন্য আইন (obnoxious law), কারণ এই আইনের বলে একটা কাফির পুলিশ একজন ভারতীয়কে আটকে রাখতে পারে। লিখলেন — 'At present, only the Permit Secretary is authorised to inspect a permit. Under the new Act, every Kaffir police constable can do so. Under

the new Act, a Kaffir police can ask for particulars of name and identity, and, if not satisfied, can take him to the police station.' যে পারমিট ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গান্ধীর আন্দোলন, তার গতিমুখ ঘুরে গেল কাফির পুলিশদের বিরুদ্ধে। পড়তে পড়তে মনে হয়, সাদা পুলিশ অর্থাৎ সাহেব পুলিশ গ্রেফতার করলে তত খারাপ লাগবে না, যত খারাপ লাগবে কালো পুলিশে গ্রেফতার করলে। কী অদ্ভুত মানসিকতা!

জুলু বিদ্রোহ ও গান্ধীর ভূমিকা : ১৯০৬ সালে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জুলু উপজাতির মানুষেরা যুদ্ধ ঘোষণা করে। গান্ধী এই যুদ্ধে অ্যাম্বুলেন্স বাহক হিসেবে নিজে যেমন কাজ করেন, তেমনি অনেক ভারতীয়কে সংঘবদ্ধ করে এই কাজে জড়িয়ে নেন। তখনও পৃথিবী জুড়ে সেভাবে রেড ক্রস ব্যবস্থার প্রচলন হয়নি। গান্ধী ব্রিটিশ সেনার পক্ষে যে অ্যাম্বুলেন্স বাহিনী ছিল, সেখানে যোগ দেন। সমালোচনা করার মত কাজ অবশ্যই এটা নয়। কিন্তু শুধু অ্যাম্বুলেন্স বাহকের কাজই কি তিনি করেছিলেন? নাকি যুদ্ধের অন্যান্য কাজও করেছিলেন তিনি ও তাঁর দলবল?

গান্ধী তাঁর আত্মজীবনীতে এই সম্পর্কে এক জুলু যোদ্ধার বর্ণনা দিয়েছেন এই ভাবে — কাফিরদের মধ্যে কে ব্রিটিশের অনুগত (বা দালাল), আর কে তা নয়, সেটা প্রথম দর্শনেই যাতে বোঝা যায়, তার জন্য সরকার আনুগত্যের প্রতীক হিসেবে Loyal Badge বুকে সেঁটে নেওয়াকে আবশ্যিক করেছিল। একদিন যুদ্ধক্ষেত্রে এরকম এক 'কাফির'কে দেখে ফেললেন গান্ধী যার বুকে ব্যাজ সাঁটা নেই। পরেরটুকু গান্ধীর আপন জবানীতে শোনা যাক — 'As we were struggling along, we met a Kaffir who did not wear the loyal badge. He was armed with an assegai (জুলু উপজাতিদের দ্বারা ব্যবহৃত কাঠের হাতলওয়ালা এক ধরণের বর্শা) and was hiding himself. However, we safely rejoined the troops on the further hill, whilst they were sweeping with their carbines the bushes below.' অহিংস-সাধক শ্রীযুক্ত মোহনদাস করমচন্দ্ গান্ধীর সৌজন্যে লুকিয়ে বাঁচতে পারল না হতভাগ্য জুলু সৈনিকটি। ব্রিটিশ সেনার কারবাইনের গুলিতে নিকেশ হয়ে গেল।

কিন্তু এতো গেল বিদ্রোহী জুলুদের বৃত্তান্ত। যারা অনুগত জুলু, তারা কি প্রশংসা পেয়েছে গান্ধীর কাছ থেকে? অবশ্যই নয়। কেননা, কাফির মাত্রই বিশ্বাসের অযোগ্য এবং অবাধ্য। এদের সম্পর্কে গান্ধী লিখেছেন —'The natives in our hands proved to be most unreliable and obstinate' এখানে 'আমাদের হাতে' (in

our hands) শব্দবন্ধটির কথা খেয়াল করতে হবে। গান্ধী এখানে স্বেচ্ছাসেবী অ্যাম্বুলেন্স বাহিনীর নেতা নন, তিনি শাসক ব্রিটিশ সৈন্যের একজন বলেই নিজেকে মনে করছেন। সেজন্যে বলেছেন — 'the natives in our hands'।

জুলু যুদ্ধের স্মৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে গান্ধী যে প্রচন্ড নিন্দনীয় কথাটি বলেছেন, তা হল — দুপুর বারোটার মধ্যে আমাদের কাজ শেষ হল। লড়বার জন্য একটি কাফিরও বেঁচে থাকল না আর। (However, at about 12 o'clock we finished the day's journey, with no Kaffirs to fight)। এই ব্রিটিশ প্রীতির পুরস্কার হিসেবে শাসকের কাছ থেকে মেডেল পেয়েছিলেন গান্ধী।

দক্ষিণ আফ্রিকার নাটালে গান্ধী প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস। এই সংগঠনের প্রাথমিক দাবিগুলির অন্যতম ছিল ডারবান ডাকঘরে প্রবেশের জন্য তৃতীয় একটি দরজার (entrance) ব্যবস্থা করা। তার আগে ছিল দুটি দরজা। একটি শ্বেতাঙ্গদের জন্য, অপরটি কৃষ্ণাঙ্গ ও ভারতীয়দের যৌথ ব্যবহারের জন্য। কিন্তু কালোদের সঙ্গে একসাথে প্রবেশের ব্যাপারে গান্ধীর আপত্তি ছিল। তাঁর সেই আপত্তি মেনে তৃতীয় দরজার ব্যবস্থা হয়।

১৯০৮ সালে ট্রান্সভাল শহরের কারাগারে বন্দি থাকেন গান্ধী। সেখানে তাঁর সহবন্দি ছিলেন কিছু কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ। তারা গান্ধীর কোনও ক্ষতি করেনি, তাঁর প্রচন্ড কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষের জন্য কোনওরকম অপমান করেনি। তবু সেই জেলখানায় প্রথম রাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে সেই কালো মানুষদের সম্পর্কে লিখেছিলেন — '(I had to spend the) first night in the company of some Kaffir criminals, wild looking, murderous, vicious, lewd and uncouth.' অর্থাৎ অপরাধী, বন্যদর্শন, খুনি, অসৎ চরিত্র, ইতর ও ছোটলোকদের মধ্যে তাঁকে রাতটা কাটাতে হয়েছিল। ভাষার এমন চমৎকার ব্যবহারই বুঝিয়ে দেয় কতখানি ঘৃণা তাঁর ছিল কালো মানুষদের প্রতি।

গান্ধীভক্তদের অনেকে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, গান্ধী যে আমলে দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলেন, তখন 'কাফির' শব্দটি বর্ণবিদ্বেষী বা খারাপ শব্দরূপে ব্যবহৃত হত না। এই ব্যবহার নাকি অনেক পরে শুরু হয়। এই ব্যাখ্যাটি যে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়, তার কারণ, 'কাফির' শব্দের নিহিত অর্থটি গান্ধীর ভালই জানা ছিল এবং শব্দটি যে অপমানসূচক, সে জ্ঞানও ছিল। অন্তত একটি ঘটনা থেকে এই কথা জানা যায়, যার বর্ণনা গান্ধী নিজেই দিয়েছেন। ঘটনাটি ছিল এইরকম — এক মৌলানা সাহেব এক শ্বেতাঙ্গ খ্রিস্টান ভদ্রলোককে কাফির বলে উল্লেখ করেছিলেন। মি. ডগলাস নামে ওই ভদ্রলোক ছিলেন মৌলানা সাহেবের ফার্মে

কর্মরত। কাফির বলার প্রতিবাদে চাকরি ছেড়ে দেন তিনি। এই ঘটনা এভাবে বিবৃত করেছেন গান্ধী — 'And finally, about Mr. Douglas, who... has tendered his resignation. The gentleman has been simply over-hasty. He took offence at the Maulana Saheb's use of the word Kaffir for a christian. I can understand his resentment. It would have been better if the word Kaffir were not used.'

অর্থাৎ কাফির শব্দের অর্থ ও ব্যবহার তিনি ভালো মতই জানতেন। এব্যাপারে আরও নিঃসন্দেহ হওয়া যায় তাঁর আরও একটি উক্তিতে — যেখানে তিনি বলছেন, কাফির শব্দ অপমানকর বটে, তবে চণ্ডাল শব্দটিও তো তাই। এর পরেও 'কাফির' বলার জন্য গান্ধীকে বর্ণবিদ্বেষী বলাটা কি অন্যায় হবে?

এই প্রসঙ্গের শেষ করব দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর সেই বিখ্যাত ট্রেন যাত্রার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে। কত লেখালেখি, কত নাটক, কত ছায়াছবি যে তৈরি হয়েছে এই ঘটনাটি নিয়ে তার শেষ নেই। কয়েক বছর আগে হলিউডের প্রখ্যাত সিনেমাওয়ালা রিচার্ড অ্যাটেনবরো ছবি তৈরি করেছেন গান্ধীকে নিয়ে, সেখানে এই ঘটনা দারুণভাবে দেখানো হয়েছে। দেখানো হয়েছে বর্ণবিদ্বেষী সাহেবদের বিরুধে কালো মানুষদের অধিকার রক্ষার জন্য কিভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন গান্ধী। কিভাবে হার-না-মানা লড়াই চালিয়েছেন তিনি।

এই প্রসঙ্গে বলতে হয়, ঘটনাটি সত্যিই ঘটেছিল সেদিন। কিন্তু কারণটা ছিল একদম অন্যরকম। কালো মানুষরা কেন ট্রেনের প্রথম শ্রেণীতে চড়তে পারবে না — গান্ধীর দাবি আদৌ তা ছিল না। তাঁর দাবি ছিল, কালো মানুষ নয়, উঁচু জাতের বনেদী ভারতীয়দেরও এই অধিকার দিতে হবে। বিশ্বাস করতে অসুবিধা হচ্ছে? তাহলে এই সম্পর্কে গান্ধীর নিজের উক্তি দিয়ে শেষ করি এই প্রসঙ্গ —

'You say that the magistrate's decision is unsatisfactory because it would enable a person however unclean, to travel by a tram, and that even the Kaffirs would be able to do so. But the majistrate's decision is quite different. The court declared that the Kaffirs have no legal right to travel by tram. And according to tram regulations those in an unclean dress or in a drunken state are prohibited from boarding a train. Thanks to the court's decision, only clean Indians or coloured people other than Kaffirs, can now travel in the trams.'

এই হচ্ছে মহাত্মার বিখ্যাত ট্রেন বৃত্তান্তের ইতিবৃত্ত। এরপর তাঁকে কতটা মহাত্মা বলতে পারবেন, সেই বিচারের ভার, পাঠক, আপনার ওপর।

গো-সংরক্ষণের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন অনেক কথা, কিছুই করেন নি

গো-সংরক্ষণের খুব বড় সমর্থক ছিলেন গান্ধীজি। গোরুকে তিনি বলেছেন — A poem of pity। একটি করুণার কবিতা। বলেছেন, গোরু হল কোটি কোটি ভারতবাসীর মা। গো-সংরক্ষণকে দেখেছেন ঈশ্বর-সৃষ্ট অবলা জাতির সুরক্ষা হিসেবে। এই সম্পর্কে যা তিনি বলেছেন, একবার দেখা যাক "The cow is the purest type of sub-human life. She pleads before us on behalf of the whole of the sub-human species for justice to it at the hands of man, the first among all that lives. She seems to speak us through her eyes; you are not appointed over us to kill us and eat our flesh or otherwise ill-treat us, but to be our friend and guardian. I worship it and I shall defend its worship against the whole world." মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে গোরু হচ্ছে পবিত্রতমজীব। আমাদের জীবনে তার অবদান অসীম। শিকার ছেড়ে কৃষিকাজ যখন ভারতীয়দের প্রধানতম জীবিকা হল, তখন থেকেই গো-সম্পদ রক্ষার তাগিদে গোরুকে আস্তে আস্তে দেবত্বে উন্নীত করা হয়েছে। ফলে যে গোমাংস একদা প্রধান খাদ্য ছিল হিন্দুর কাছে, যে গোবৎসকে বলি না দিলে যাগযজ্ঞ এবং অন্যান্য শুভকাজ সম্পন্ন হত না হিন্দুদের, সেই গোরুর পূজা শুরু করল হিন্দুরা। এটা অসম্ভব কোনও কথা নয়। সমাজের আচার-ব্যবহার, খাদ্যাভ্যাস, ধর্মবিশ্বাস এভাবে যুগে যুগে পাল্টায়। যখন থেকে হিন্দুদের কাছে গোরু দেবদেবীর স্থান পেল, তখন থেকে দেব-দেবীর মূর্তি রক্ষা করাটা যেমন কর্তব্য মনে করল হিন্দুরা, গো-রক্ষাকেও তারা তাদের ধর্মীয় কর্তব্য মনে করল। এই কর্তব্যবোধ এমন দৃঢ়ভাবে শিকড় ছড়াল হিন্দুর চেতনায় যে গোরক্ষাকে নিজের প্রাণ রক্ষার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ মনে করল একসময়। মুসলমান আক্রমণকারীরা এই দেশ দখল করতে এসে গোরুর প্রতি হিন্দুর এই সেন্টিমেন্টকে খুব কাজে লাগাল। হিন্দু রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে আগে গোবাহিনী রেখে তারা যুদ্ধ করতে নামত এমন কথাও জানা যায়। গোবাহিনী এইজন্যেই রাখা হত, যাতে গোহত্যার ভয়ে হিন্দুরা লড়াই না করতে পারে। যুদ্ধ জয়ের পর মুসলমান শাসকরা প্রথম নজর দিত হিন্দুর ধর্মস্থান অপবিত্র করার ও বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণের কাজে। এই দুটি কাজেও গোরুকে ব্যবহার করল তারা। গোরুকে জবাই করে তার রক্ত বিগ্রহের ওপর ছিটিয়ে দিয়ে মূর্তি অপবিত্র করা হত আর ধর্মান্তরকরণের প্রথম পদ্ধতিটাই ছিল গোমাংস খাওয়ানো।

গান্ধীজি যে এসব কথা জানতেন না, তা নয়। সেজন্যে বলেছেন — "Cow protection is the gift of Hinduism to the world. And Hinduism will live so long as there are Hindus to protect the cow. Hindus will be judged not by their TILAKS, not by the correct chanting of MANTRAS, not by their pilgrimages, not by their most punctitious observances of caste rules, but by their ability to protect the cow."

একজন সত্যিকারের হিন্দু হিসেবেই যে নিজের বিশ্বাস থেকে এই কথাগুলি তিনি বলেছেন, সে সম্পর্কে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু একজন রাষ্ট্রনেতার কাছ থেকে ভাষণ শোনাটা তো বড় কথা নয়, তাঁর কাছ থেকে দিগ্-দর্শন পাওয়াটাও তো জরুরি। যে কথাগুলি তিনি গো-সংরক্ষণের ব্যাপারে বলেছেন, সে কথাগুলি তাঁর আগে হাজার হাজার মুনি-ঋষি বলে গেছেন। শুধু মুনি-ঋষিদের কথাই বা বলব কেন, একথা তো জানে এবং বলে সাধারণ হিন্দুও। তাদের সঙ্গে গান্ধীজির তফাৎটা কোথায়? তফাৎটা এখানেই যে তিনি ভারত রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর কাছে মানুষ শুধু কর্তব্যের ফিরিস্তি শুনতে চায় না, কর্তব্য কিভাবে পালন করা যাবে, সেই কথাও শুনতে চায়।

গান্ধী ভালভাবেই জানতেন যে, ভারতে খ্রিস্টানদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। তাদের বেশিরভাগ খুব বেশিদিন হয়নি যে, ধর্মান্তরিত হয়েছে। এখনও তাদের অনেকের মধ্যে ভারতীয় হিন্দুর খাদ্যাভ্যাস বজায় আছে। সেই খাদ্যাভ্যাসে গোমাংস বর্জিত। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কিছু উপজাতিরা গোমাংস খায় বটে, তবে তাদের সংখ্যা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। মুসলমানরাই গোমাংসের প্রধান খাদক। গান্ধীর মূল পরামর্শ ছিল মুসলমানদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং তাদের বোঝানোযে, হিন্দু ভাইদের মানসিকতার কথা ভেবে তারা যেন গোমাংস বর্জন করে এবং গোহত্যা না করে। এপর্যন্ত ঠিক ছিল। তারপর যে কথা তিনি বললেন, তাতে বোঝা গেল, তাঁর আদর্শবাদকে ইচ্ছাকৃত কপটাচারের নমুনা বলে যদি কেউ অভিহিত করে, তাকে দোষ দেওয়া যাবে না। তাঁর আদর্শবাদ কোনও শক্ত বাস্তব পটভূমি র ওপর দাঁড়িয়ে নেই।

তখন খিলাফৎ আন্দোলনে সবে মাত্র সমর্থন দিয়েছে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। কংগ্রেসের তৎকালীন সমস্ত নেতার প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে শুধুমাত্র

গান্ধীর ইচ্ছায় এই সমর্থন দেওয়া। এমনকি মহম্মদ আলি জিন্নাহ্-রও মত ছিল না এই আন্দোলনে। কিন্তু গান্ধীর কথা অমান্য করবে কে? গো-সংরক্ষণ আন্দোলনকে তিনি জুড়ে দিলেন খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে। বললেন, 'The way to save the cow is not to kill or quarrel with the Musoulmans, the way to save the cow is to die in the act of saving the Khilafat without mentioning the cow.' অর্থাৎ, গোরক্ষার নাম নিয়ো না, খিলাফৎ রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জন দাও। ফলে খিলাফৎ আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধী গোরক্ষা বিষয়ক পরামর্শও ব্যর্থ হল।

ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকার ২৮.৭.১৯২১ সংখ্যায় গো-সংরক্ষণ বিষয়ে আরও যে সব পরামর্শ দিয়েছেন তিনি, সেগুলি নিয়ে আলোচনা করলে বোঝা যাবে যে কতটা অবাস্তব সেই সব পরামর্শ। শুধু যে অবাস্তব, তা নয়, গান্ধীর স্ববিরোধিতা এবং কপটাচারের রাজনীতিরও প্রমাণ পাওয়া যাবে সেখানে।

ক) 'Hinduism requires its votaries to immolate themselves for the sake of their riligion, i.e., for the sake of saving the cow. The question is how many Hindus are ready wihout bargaining with the Musoulmans to die for them and for their religion.' এখানে তিনি যেটা বললেন, সেটা হল গোরক্ষার জন্য হিন্দুদের আত্মোৎসর্গ করতে হবে। দেখাতে হবে যে, মুসলমানদের জন্য এবং ইসলাম ধর্মের জন্য হিন্দুরা নিঃস্বার্থভাবে মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত। এই নিঃস্বার্থ মৃত্যুবরণের ক্ষেত্র কোথায়? তা হল খিলাফৎ আন্দোলন। — Khilafat is a just cause and that to help them (Musoulmans) in a good cause is to serve India.

খ) আইন করে গোহত্যা বন্ধ করা যাবে না। কারণ বিরাট সংখ্যক শিক্ষিত মানুষের মতের বিরুদ্ধে কিংবা সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তি যখন ধর্মের আড়ালে বিরোধিতা চালায় কোনও আইনের, সেই আইন কখনো কাজে লাগানো যায় না (No legislation which is opposed by an intelligent and organised public opinion, or under cover of religion by a fanatical minority, can ever succeed.) এতো অত্যন্ত সাংঘাতিক কথা! আইন করে কোনও কিছু বন্ধ করা যায় না, কারণ ধর্মীয় মৌলবাদীরা না চাইলে আইন কাজে লাগানো যায় না। প্রসঙ্গত বলা ভাল, স্বাধীন ভারতে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ, কেরল এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি রাজ্য ছাড়া ভারতের অন্যত্র গোহত্যা নিষিদ্ধ হয়েছে আইনের বলেই।

গ) যে গোরুকে পোষা আর্থিক দিক থেকে লোকসানের মনে হয়, তাকে কিভাবে রক্ষা করা যাবে, সে সম্পর্কে একগুচ্ছ পরামর্শ দিচ্ছেন বটে, পরক্ষণে নিজেই তার বিরোধিতা করে বলছেন — 'It will not be possible to save those animals that are a burden on the land or, perhaps, even man if he is a burden.' অর্থাৎ শুধু গোরু নয়, মানুষও বুড়ো হয়ে গেলে সংসারের বোঝাস্বরূপ হয়ে যায়।

ঘ) বৃদ্ধা গোমাতা বা আর্থিক দিকে লোকসানের কারণ হচ্ছে যেসব গোমাতা, তাদের হত্যা না করে বাঁচানোর উপায় সম্পর্কে তাঁর দেওয়া পরামর্শগুলো এরকম —

(এক) গোরু এবং তার বাছুরকে হিন্দুরা আরও যত্ন করবে;

(দুই) বিজ্ঞানসম্মতভাবে গোপালনের ব্যবস্থা করবে;

(তিন) পশ্চিমের দেশে যে পদ্ধতিতে এঁড়ে বাছুরের অণ্ডকোষ কেটে শক্তি বাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়, সেই পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে এবং দেশী পদ্ধতি বাতিল করতে হবে;

(চার) গোরুদের যথেষ্ট সংখ্যক বৃদ্ধাশ্রমের (পিঁজরাপোল) ব্যবস্থা করতে হবে।

গান্ধীজির মতে, এই ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করলে প্রাথমিক কাজটা হয়ে গেছে বলে ধরা হবে। তখন মুসলিমরা স্বেচ্ছায় গোপালনের প্রয়োজনীয়তা বুঝে এবং তাদের হিন্দু ভাইদের মনের ইচ্ছা বুঝে গোহত্যা বন্ধ করবে। এরপর আসছে তাঁর দ্বিতীয় পর্বের পরামর্শ।

(এক) যেসব গোরু বিক্রির জন্য বাজারে আনা হবে, রাষ্ট্র বাজারমূল্যের চেয়ে বেশি দাম দিয়ে সেই সমস্ত গোরু কিনে নেবে;

(দুই) সমস্ত বড় বড় শহরে গোপালনের জন্য রাষ্ট্র পরিচালিত গোপালন কেন্দ্র খুলতে হবে, যাতে শস্তা এবং অবিচ্ছিন্ন দুধ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকে।

(তিন) মৃত গোরুর চামড়া, হাড় ইত্যাদির সুব্যবহারের জন্য রাষ্ট্র যথেষ্ট সংখ্যক ট্যানারি ইত্যাদি খুলবে। মরা গোরু বাছুরও রাষ্ট্রকে কিনতে হবে।

(চার) রাষ্ট্র আদর্শ গোশালা তৈরি করে জনসাধারণকে গোপালনের ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান দেওয়ার ব্যবস্থা করবে।

(পাঁচ) গোখাদ্যের জন্য গোরুর মালিকদের যথেষ্ট পরিমানে জমির ব্যবস্থা করবে সরকার।

(ছয়) ডেয়ারি ডেভেলপমেন্টের জন্য আলাদা বিভাগের ব্যবস্থা করবে সরকার।

এইসব পরামর্শগুলির আদৌ বাস্তবায়ন সম্ভব কিনা কিংবা সম্ভব হলেও রাষ্ট্রের পক্ষে এতসব খরচ করা সম্ভব কিনা সেই সংশয় গান্ধীজির মনে ছিল। তাই পরামর্শদানের শেষে বলেছেন — "This is no doubt consists a heavy burden, but it is a burden which all States, but above all, a Hindu State should gladly bear."

Hindu State কথাটি পড়ে আপনি কি একটু চমকে উঠলেন? এতক্ষণ তো হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কথা ভেবে, বিশেষ করে মুসলমানদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে তিনি তাঁর বক্তব্য রাখছিলেন এবং পরামর্শ দিচ্ছিলেন। হঠাৎ করে 'হিন্দু রাষ্ট্র'-এর কথা এল কেন?

এল, কারণ একটাই। তাঁর কপটাচার। তিনি বুঝেছিলেন, গো-সংরক্ষণের জন্য মুসলমানের মাথাব্যথা নেই। এটা সম্পূর্ণভাবে হিন্দুর ধর্মীয় আবেগ। সেই আবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে হিন্দুর কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াবার প্রয়োজন ছিল তাঁর। গো-সংরক্ষণ বিষয়ে লেখালেখি করে তাঁর সেই উদ্দেশ্যটা সফল হয়েছিল। দেশের হিন্দু জনসাধারণ তাঁকে নিজেদের 'মেসাইয়া' বলে গ্রহণ করেছিল। ধূর্ত গান্ধী এটাই চেয়েছিলেন। গোরু থাকল কি গেল, তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না। লেখালেখির বাইরে কাজের কাজও কিছু করেন নি। এমন কি সে বছরের বক্‌র-ই-ঈদের আগে অমৃতসরের হাকিম আজমল খান গোহত্যা না করতে দিয়ে যে বড় কাজ করেছিলেন, গান্ধীজি তার এক শতাংশ কোথাও করেননি, করার চেষ্টাও করেন নি। গো রক্ষণের আবেগ উসকে দিয়ে হিন্দুদের নিয়ে রাজনীতি করেছেন, অন্যদিকে গোমাংস খাওয়ার অধিকার মুসলমানের আছে এবং আইন করে সেই অধিকার নিয়ে নেওয়া যায় না, একথা বলে মুসলমানদের নিয়ে রাজনীতি করার চেষ্টা করেছেন। মুসলমানরা তাঁর গুণগ্রাহী হয়নি এবং তাঁর রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। কিন্তু হিন্দুরা তাঁকে তাঁর প্রাপ্যের চেয়ে সহস্র গুণ বেশি মর্যাদা দিয়েছে। গো-সংরক্ষণ এভাবে হয়ে উঠেছে গান্ধীর কপটাচারের এক বড় নমুনা।

অহিংসা, সত্যাগ্রহ ও গান্ধী

. গান্ধীর মূল পরিচয় কোনটি ? এই প্রশ্নের উত্তরে অবিসংবাদিতভাবে উঠে আসবে যে উত্তরটি, তা হল, তিনি অহিংসার সাধক। অন্যান্য পরিচয়কে অতিক্রম করে এই উত্তরটি সর্বাগ্রে উচ্চারিত হওয়ার কারণ, ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর হিংসা জর্জর পৃথিবীতে গান্ধী-অনুসৃত এবং গান্ধীর দ্বারা বিপুলভাবে উচ্চারিত এই শব্দটির মাধ্যমে মানুষ পেয়েছিল বেঁচে থাকার এক নতুন অর্থ। আর সেজন্যেই গান্ধী হয়ে উঠেছিলেন অহিংসার বিকল্প। যেন গান্ধী মনে অহিংসা এবং অহিংসা মানে গান্ধী। অনেকে দৃঢ়ভাবে এমনটাও বিশ্বাস করে যে, অহিংসা মন্ত্রের উদ্‌গাতা তিনি। যদিও, এমন ধারণাটি সর্বাংশে ভুল। আমাদের এই ভারতবর্ষে খ্রিষ্টের জন্মের বহুবছর আগেই মন্দ্রিত হয়েছে অহিংসার বাণী। এই ভারতবর্ষের বিখ্যাত নৃপতি সম্রাট অশোক শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয়, রাজনৈতিক জীবনেও অহিংসাকে অনুসরণ করেছেন দৃঢ় বিশ্বাসে। সুতরাং গান্ধীই প্রথম রাজনীতিবিদ যিনি অহিংসাকে জীবনবেদ হিসাবে মেনে নিয়েছেন—এই ধারণাটি ইতিহাসের বিচারে ভুল। তবে এটা অনস্বীকার্য যে, গান্ধীর মাধ্যমেই হিংসায় উন্মত্ত পৃথীতে অহিংসা আবার মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে। কতদূর তাকে অনুসরণ করতে পেরেছে মানুষ, সেটি অন্য প্রশ্ন। তবে, তা যে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এখন, অহিংসার চিরায়ত ধারনার সঙ্গে গান্ধীর কোথায় মিল, কোথায় অমিল, গান্ধী তাঁর জীবনে অহিংসাকে কতদূর অনুসরণ করতে পেরেছেন—এই বিষয়গুলি আমাদের আপাত বিচার্য বিষয়। সেটা দেখব আমরা, তবে তার আগে অহিংসার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে দু-চারটি কথা বলা দরকার।

বিশাল জীবজগতের তথা ঈশ্বরসৃষ্ট এই পৃথিবীর পারিপার্শ্বিকতার কারও কোনও ক্ষতি না করা, এমনকি, ক্ষতির চিন্তা না করা হল অহিংসার প্রাথমিক শর্ত। ক্ষতিসাধন না করার বিষয়টি যে শুধু অন্য জীবের প্রতি প্রযুক্ত হবে, তা নয়, এর মধ্যে নিজেকেও ধরতে হবে। অর্থাৎ কোনও কিছুর দ্বারা কেউ যদি নিজের ক্ষতিও করার চেষ্টা করে, তাকেও হিংসার প্রকাশ হিসেবে ধরতে হবে। এই বিশ্বাসের মূলে আছে ঈশ্বরের আপন অহিংস সত্তা। আজ থেকে প্রায় ছয় শত বছর আগে পৃথিবীতে এসেছিলেন জৈনদের চব্বিশতম তীর্থঙ্কর ভগবান মহাবীর। অহিংসা-মন্ত্রের মূল উদ্‌গাতা হিসেবে তাঁকে মান্য করা হয়। অহিংসার ধারণাটি আরও পুষ্ট হয় বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ভগবান বুদ্ধের দ্বারা। বুদ্ধদেবের

প্রচারিত বৌদ্ধধর্মেরও ভিত্তি ছিল অহিংসা। অহিংসার শক্তি যে কতটা বিপুল হতে পারে তার প্রমাণ চণ্ডাশোক থেকে ধর্মাশোকে পরিবর্তনের কাহিনি। যা গল্পকথা নয়, একান্তভাবেই বাস্তব। কিন্তু শুধু জৈনধর্ম বা বৌদ্ধধর্ম নয়, পৃথিবীর সমস্ত ধর্মমতেই অহিংসার শ্রেষ্ঠত্ব কমবেশি উচ্চারিত হয়েছে। হিন্দুদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থেও যেমন তা বলা হয়েছে, তেমন বলা হয়েছে ইহুদিদের, খ্রিষ্টানদের ও অন্যান্য অনেক ধর্মগ্রন্থেও। ছান্দোগ্য উপনিষদে যেমন বলা হয়েছে সর্বভূতে প্রেম ও অহিংসার কথা, তেমন খ্রিষ্ট ধর্মেও বলা হয়েছে সবাইকে এমনকি, শত্রুকেও ভালবাসতে।

প্রাচীন ধর্মচর্যায় অহিংসার ভূমিকা ছেড়ে আসা যাক বর্তমান পৃথিবীর অহিংসা মন্ত্রোচ্চারণের প্রসঙ্গে। বর্তমান যুগের অহিংস-সাধকদের কথা উঠলে যে নামগুলি প্রথমেই মনে আসে, তাঁরা হলেন সুবিখ্যাত রুশলেখক-দার্শনিক লিও টলস্টয়, আমেরিকার মার্টিন লুথার কিং (জুনিয়র) এবং ভারতের মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

এই তিনজনের মধ্যে আবার গান্ধীকে ধরা হয় রাজনৈতিক আন্দোলনে অহিংসার আদর্শকে প্রয়োগ করার পথপ্রদর্শক হিসেবে। বিশেষ করে ভারতে অহিংস আন্দোলনের জনক শিরোপাটি তাঁকেই দেওয়া হয়। তথ্যটি ঐতিহাসিক ভাবে ভুল। ভারতে অহিংস আন্দোলনের সূচনা গান্ধীর অনেক আগেই যিনি করেছিলেন, তিনি একজন শিখ। নাম রাম সিং। ১৮৬১ সালে ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত ওয়াকফ্ অ্যাক্টে (Waqf Act, 1861) অন্যায়ভাবে গুরুদ্বারগুলির পরিচালনার ভার শিখদের হাতে না দিয়ে হিন্দু উদাসী মহান্তদের হাতে দেওয়া হয়। যদিও, হিন্দুদের ক্ষেত্রে ও মুসলমানদের ক্ষেত্রে এই ভার তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের হাতে দেওয়া হয়েছিল। এই আইনের বিরুদ্ধে রাম সিংহের নেতৃত্বে শিখরা দীর্ঘ আন্দোলন করে। আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। গান্ধীর নামের সঙ্গে চরকা কাটা ও বিদেশি বস্ত্র বর্জন করার যে আন্দোলনের ওতপ্রোত সম্পর্ক, রাম সিং সেই দুটি কাজ করেছিলেন ১৮৭০ সালেই। আজ যে নামধারী শিখদের কথা আমরা জানি, তার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এই রাম সিং নামধারী। ব্রিটিশরা তাঁকে হত্যা করে আন্দোলন দমন করতে চেয়েছিল বটে, তবে পারেনি।

১৯২০ সালে গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস প্রথম অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়। এই আন্দোলন ছিল খেতাব ফেরত দেওয়া (Surrendering of all titles), বিভিন্ন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সাম্মানিক পদ প্রত্যাখ্যান করা ইত্যাদি। আন্দোলনের

এই নতুন ধাঁচটি শুধু যে কংগ্রেসিদের ভাল লাগল তা নয়, মানুষও বেশ পছন্দ করল। গান্ধীর খেতাব প্রত্যাখ্যান আন্দোলনে শুধু যে ব্রিটিশের দেওয়া খেতাব ফেরত দেওয়া শুরু হল, তা নয়। অনেকে তাঁদের নামের যুক্ত পদবীর একটা অংশও ফেলে দিতে লাগলেন। আমার চাকুরিজীবন সুন্দরবনের যে হাটগাছা কে.সি.ইনস্টিটিউশনে শিক্ষকতা দিয়ে শুরু, তার প্রধান শিক্ষক ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁর পদবীর শেষাংশ অর্থাৎ 'গুপ্ত'কে বাদ দিয়ে হয়ে গিয়েছিলেন দাশ।

১৯২২ সালের মার্চ মাসে আমেদাবাদ সেশন্‌স্ কোর্টের শুনানিতে 'গান্ধী বলেছিলেন—আমার বিশ্বাসের প্রথম কথা এবং আমার ধর্মের শেষ কথা হল অহিংসা (Non-Violence is the first article of my faith and the last article of my creed)। যেহেতু গান্ধী রাজনীতিবিদ ছিলেন, তাই এই বিশ্বাস-অনুযায়ী তিনি রাজনৈতিক সংগ্রামে অহিংসাকে একটি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করলেন। এই সঙ্গে রাজনীতি অতিক্রম করে আধ্যাত্মিক (spiritual) ও লোকহিতের (humanitarian) লক্ষ্যেও অহিংসাকে ব্যবহার করতে চাইলেন। এই ছোট্ট পরিসরে চেষ্টা করব এই ব্যাপারে গান্ধীর চিন্তাধারা ও কাজকর্ম তাঁর আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল কিনা। আমরা এটাও দেখব, এই পথে তাঁর সাফল্য ও ব্যর্থতা কতখানি ছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকার ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে গান্ধীর নেতৃত্বে যে আন্দোলনগুলি হয়েছিল, সেগুলি সবই অহিংসার পথে। দু-একটি ছোটখাট ব্যাপারে সামান্য সাফল্য পেলেও বড় কিছু সাফল্য এখানে পাননি তিনি। তার মধ্যে আবার বোয়র যুদ্ধে ও জুলুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশদের সমর্থনে নামার ফলে তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকার সাফল্য নিয়ে সরব হওয়ার খুব একটা অবকাশ নেই। এমনকি, অহিংস সাধনার পরীক্ষাগার (Laboratory) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ফিনিক্স ফার্ম এবং টলস্টয় ফার্মও সেই অর্থে সফল হতে পারেনি। এই পর্যায়ে জোহানেসবার্গের ট্রেনের ঘটনা তাঁকে বিখ্যাত করেছিল বটে, তবে তার মধ্যে বর্ণবিদ্বেষের গন্ধটা আবার রীতিমত বেশি ছিল।

গান্ধী জীবনের বড় ক্যানভাস হল ভারত। ১৯১৫ সালের জানুয়ারিতে পাকাপাকিভাবে দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে আসার পর গান্ধী বেশ দ্রুততার সঙ্গে কংগ্রেসের ক্ষমতা দখল করলেন। দখলের পর প্রথম যে কাজটি করলেন, তা হল, বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশকে সাহায্য করা। সৈন্য সংগ্রহ ও অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করে ব্রিটিশের ধন্যবাদের পাত্র হলেন। বলা বাহুল্য, গান্ধীর তথাকথিত অহিংস নীতির সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর এই সমর্থনদানকে মেলানো যায় না।

এরপর যুদ্ধ থামলে রাউলাট অ্যাক্ট্ চালু করল ব্রিটিশ। ১৯১৯ সালে। এই আইনের বলে যে কোনও ভারতীয়কে যখন খুশি গ্রেফ্‌তার করা ও বিনাবিচারে জেলে রাখার ব্যবস্থা হল। এর প্রতিবাদে গান্ধী হরতাল ডাকলেন। দিল্লিতে সফল হল হরতাল। কিন্তু সর্বত্র অহিংস থাকল না। বহু জায়গাতে আন্দোলন হিংসাশ্রয়ী হয়ে উঠল। বিশেষ করে পাঞ্জাবে। গান্ধীর ধারণা হল, ভারতীয়রা এখনও অহিংস পথে চলতে শেখেনি। অতএব হরতাল তুলে নিলেন তিনি। এর পরপরই ঘটে পাঞ্জাবের কুখ্যাত জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড। গান্ধীর অহিংস আন্দোলন আবার ধাক্কা খেল।

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ ধ্বংস করেছে অটোমান সাম্রাজ্যকে, যা ছিল পৃথিবীর একমাত্র মুসলিম শক্তিধর দেশ। খলিফা ছিল যার শাসক। এর প্রতিবাদে খিলাফত আন্দোলন গড়ে ওঠে। গান্ধী এই আন্দোলনকে সমর্থন জানালেন ১৯২০ সালে। তবে এই সমর্থন অহিংস পথে। ব্রিটিশ কড়া হাতে দমন করল এই আন্দোলন। এই আন্দোলনেরই একটা অংশ ছিল মোপলা বিদ্রোহ। যার কথা আলাদাভাবে বলা হয়েছে এই বইয়ে। খিলাফত আন্দোলন গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের আর এক ব্যর্থতা।

খিলাফত আন্দোলনের পর এল চৌরিচৌরা অসহযোগ আন্দোলন। এখানেও ব্রিটিশ সরকারের দমনপীড়নের প্রতিক্রিয়ায় হিংসাশ্রয়ী হয়ে ওঠে জনতা। পরিণামে গান্ধী আবার তুলে নিলেন আন্দোলন। অতএব এখানেও ব্যর্থতা।

এতগুলো ব্যর্থতার চাপে গান্ধী বেশ কয়েকবছর আন্দোলনের নাম নিলেন না। তাঁর পরবর্তী বড় প্রোগ্রাম হল ১৯৩০ সালের ডাণ্ডি যাত্রা, যার আর এক নাম লবণ সত্যাগ্রহ। সত্যাগ্রহ শুরুর আগে তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড আরউইনকে তাঁর আন্দোলনের কথা একটি চিঠিতে জানালেন। সেখানে তিনি বললেন, একজন গড় ভারতবাসীর দৈনিক আয় যেখানে মাত্র দু আনা, সেখানে ভাইসরয় সাহেবের দৈনিক আয় সাতশত টাকা। এই ব্যক্তিগত উদাহরণটি টেনে আনার জন্য তিনি দুঃখিত বটে, তবে এই বেদনাদায়ক সত্যকে উল্লেখ করছেন ভারতবাসীর দুঃখের কথা বোঝাবার জন্য এবং সরকার বাহাদুরের কাছে নতজানু হয়ে ('On bended knees') প্রার্থনা করছেন যাতে এই অন্যায় দূর করা হয়। লর্ড আরউইন গান্ধীর নতজানু প্রার্থনার কড়া উত্তর দেয়ার পর গান্ধী লবণ সত্যাগ্রহ শুরু করলেন। ১২ই মার্চ ১৯৩০। সঙ্গে আটাত্তর জন সঙ্গী। ৫ই এপ্রিল ডান্ডি পৌঁছে এক মুঠো লবণ (natural salt) তুলে নিলেন, সরোজিনী নাইডু তাই দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন -'পেরেছেন, তিনি পেরেছেন।' গান্ধী আইন ভাঙার

সঙ্গে সঙ্গে জনতা চতুর্দিকে লবণ সংগ্রহে মেতে উঠল এবং মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে লবণ আইন অমান্যকারীরা জেলখানা ভরিয়ে তুলল। গ্রেফতার হলেন গান্ধীও। সারা পৃথিবী জুড়ে হইহই পড়ে গেল। গান্ধীর বিপুল প্রচার হল। কিন্তু আদতে কোনও লাভ হল কি ? একদমই না। যেহেতু এই আন্দোলন হিংসাশ্রয়ী হয়নি, তাই সফল বলা যায় আপাতভাবে। লবণ সত্যাগ্রহের সঙ্গে অন্যান্য অসহযোগ শুরু হলেও বেশি দূর এগোতে পারেনি সেই আন্দোলন। আর ইংরেজ সরকারের লবণ আইন ? সেটাও কিন্তু বহাল তবিয়তে চালু ছিল ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নেহরু এই আইন রদ করেন। তাহলে কি বলা যাবে যে, গান্ধীর এই আন্দোলনটি সফল ? বিচারের ভার পাঠক, আপনার হাতে।

লবণ আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ব্রিটিশের ডাক পেয়ে স্বাধীনতার ব্যাপারে কথা বলতে বিলাত যান গান্ধী। নিষ্ফল সেই যাত্রা। এরপর আন্দোলনে দীর্ঘ বিরতি। এর পর আবার গণ-আন্দোলনে ফিরে এলেন গান্ধী ১৯৪২ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে তখন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কথা দিয়ে কথা রাখেনি ব্রিটিশ। এবার তাই গান্ধী শিক্ষা দেওয়ার কথা ভাবলেন। ব্রিটিশের দুর্দশা বাড়াবেন ভেবে শুরু করলেন আর এক অসহযোগ আন্দোলন, যা পরিচিত ভারত ছাড়ো বা কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট নামে। কিন্তু সহজে ভাঙার পাত্র নয় ব্রিটিশ। ততোধিক সক্রিয়তায় ধ্বংস করে দিল এই আন্দোলন। নেতাদের, মায় গান্ধীকেও পুরে দিল জেলে। ভেঙে গেল গান্ধীর লড়াই।

সাতচল্লিশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি পর্যন্ত গান্ধীর তরফ থেকে অহিংসার আর কোনও উপাখ্যান আসেনি মানুষের সামনে।

চতুর্থ অধ্যায়

গান্ধীর রাজনীতি : কপটাচারের নয়া দলিল

ভারত স্বাধীন হয়েছে তাঁরই সংগ্রামের শক্তিতে — গান্ধী সম্পর্কে আপামর ভারতবাসী এটাই জানে। 'একমাত্র তিনিই সত্য, আর সব মিথ্যা' — গান্ধীভক্তদের প্রবল ঢক্কা নিনাদে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সারাৎসার এই একটি মাত্র বাক্য। সংগ্রামের ইতিহাসে যে তরুণ-বিপ্লবীরা হাসতে হাসতে ফাঁসিকাঠে দিয়েছে তাদের প্রাণ বিসর্জন, তাঁরা নাকি স্বাধীনতার সংগ্রামকে পিছিয়ে দিয়ে গিয়েছিল — গান্ধীভক্তদের এটাই দাবি। বলা বাহুল্য, এই দাবির ক্ষেত্রটি তৈরি করে দিয়ে গিয়েছেন স্বয়ং গান্ধী-ই। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু সংবাদ শুনে তিনি বলেছিলেন — 'misguided' অর্থাৎ পথভ্রষ্ট। আমাদের আলোচনা নেতাজি কিংবা অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের অবদান নিয়ে নয়, আমাদের আলোচনা গান্ধীর রাজনীতি নিয়ে, সেই রাজনীতির বাস্তবতা নিয়ে, সেই বাস্তবতার আড়ালে কোনও কপটাচার ছিল কিনা, সেই বিষয়গুলি নিয়ে। দেখব, সত্যপন্থী গান্ধী তাঁর ঘোষিত রাজনীতির বাইরে অন্য কোনও রাজনীতি কখনো করেছেন কিনা। দেখব, কপটাচারী হিসেবে সাধারণভাবে রাজনীতিবিদ্‌দের যে দুর্নাম আছে, তার ঊর্ধ্বে উঠে রাজনীতিতে সত্যকারের সততার কোনও অনুসরণযোগ্য ছাপ তিনি রাখতে পেরেছেন কিনা। স্বভাবতই বিষয়-নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গান্ধী-রাজনীতির যে দিকগুলি সমালোচিত হওয়ার যোগ্য, সেই দিকগুলিই আমরা গ্রহণ করেছি আমাদের আলোচনায়।

এক এক করে বলব সেইসব দিকের কথা। শুরুটা করা যাক —

দেশভাগ ও গান্ধীর ভূমিকা

দেশভাগের জন্য দায়ী কে? যদি একাধিক ব্যক্তির ওপর এই দায় বর্তায়, তবে তাদের মধ্যে কি গান্ধীর নাম আছে? বিষয়টির সঙ্গে গান্ধীর নামটা জড়ানোতে বহু গান্ধীভক্ত বিরক্ত হবেন। কেননা যে মানুষটি উচ্চকণ্ঠে বলেছিলেন — দেশ ভাগ হলে তা হবে আমার মৃতদেহের ওপর দিয়ে, বলেছিলেন — vivisect me before you vivisect India, তাঁর ওপর কখনও এই দোষ চাপানো যায়? ধর্মে সইবে সেটা?

দোষ চাপানো যায় কিনা, সেই বিষয়ে আলোচনা করব বটে, তবে সেইসব গান্ধীভক্তদের উদ্দেশে একটা কথা বলব প্রথমে। তা হল, গান্ধী অবশ্যই বলেছিলেন, যে তাঁর মৃতদেহের ওপর দিয়ে ভাগ হবে ভারত। তা কিন্তু হয়নি। দেশ ভাগ হয়েছে এবং তা হয়েছে গান্ধী বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকতেই। আরও বড় কথা, ১৯৪৬-৪৭-এর সেই টালমাটাল সময়ে দেশভাগ রোধ করার জন্য গান্ধী এমন কোনও কাজ করেননি যার দ্বারা বোঝা যায় যে, দেশভাগের বিরুদ্ধে তিনি মরণপণ লড়াই করেছেন কিংবা অন্তত লড়াইয়ের একটা ক্ষেত্র তৈরি করেছেন। যে গান্ধী কথায় কথায় অনশন করতে পিছুপা হতেন না, তিনি এতবড় একটি বিষয়ের বিরুদ্ধে একটি বারের জন্য অনশনে বসলেন না! এই বইয়ের অন্যত্র গান্ধীর অনশনের একটি খতিয়ান দিয়েছি। সেখানে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে। আপাতত এইটুকু বলি, ২০ অক্টোবর ১৯৪৬ তারিখে একদিনের জন্য অনশন এবং ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ তারিখে দেশভাগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এক দিনের অনশন। এই দুটি মাত্র অনশন ছাড়া ওই দুবছরে কোনও অনশনই করেননি তিনি। ছেচল্লিশের অনশনের কারণ ছিল — মুসলিম লীগকে একটি চিঠি তিনি পাঠিয়েছিলেন, সেই চিঠি নকল করার (copy) সময় তাঁর আশ্রমের এক কর্মী একটি ভুল করে। সেই ঘটনার প্রতিবাদে অনশন। আমি অনেক চেষ্টা করেছি খুঁজে পেতে যে ভুলটা কী এমন ভয়ঙ্কর ছিল যে, তার জন্য বৃদ্ধ মহাত্মাকে অনশনে বসতে হল! কিন্তু খুঁজে পাইনি। এমন প্রশ্নও মনে এসেছে যে, নিজের দোয অপরের ঘাড়ে চাপাবার জন্য রাজনীতিকরা যে খেলা খেলে থাকেন চিরকাল, সেরকম কোনও খেলা তিনি খেলেন নি তো? নিজের দোষ সাধারণ এক কর্মীর ঘাড়ে চাপিয়ে মান রক্ষার চেষ্টা? উত্তর পাইনি। অতএব একটি প্রশ্নচিহ্ন রেখে সমাপ্ত করতে হয় সেই প্রসঙ্গ।

আর ১৫ আগষ্ট ১৯৪৭-এর অনশন! সেই অনশনকে মুখরক্ষার জন্য বলব, নাকি মানুষকে ধাপ্পা দেওয়ার জন্য? এ যেন সেই বহুশ্রুত বাংলা প্রবাদ — গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা। কী লাভ ছিল সেই অনশনে? আগের রাতে (১৪ আগষ্ট) পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে, ভারতের জন্ম হচ্ছে সেদিন। উৎসবের সমস্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়ে গেছে দিল্লিতে, এমন সময়ে এই অনশন করে কার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন তিনি? তাতে কার লাভ এবং কী লাভ! আরও বড় প্রশ্ন — গান্ধী জীবনভর যত অনশন চালিয়েছেন তার পিছনে একটা দাবি থাকত, আত্মশুদ্ধির কথা থাকত, প্রতিবাদ বড় একটা থাকত না। এখানে প্রতিবাদে নেমে পড়লেন কেন হঠাৎ? এইজন্যেই বলেছি, মুখরক্ষার কথা, মানুষকে ধাপ্পা দেওয়ার কথা।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলি। অনেকে বলেন, বার্ধক্যের কারণে শরীর অশক্ত হওয়ায় গান্ধী আর অনশনের চাপ সহ্য করতে পারছিলেন না, তাছাড়া তাঁর সঙ্গীসাথীরাও তাঁকে অনশনে বসতে নিরন্তর বাধা দিয়ে গিয়েছেন, তাই তিনি শেষ বয়সে অনশনে বসতে পারতেন না। যাঁরা এমন কথা বলেন, তাঁদের উদ্দেশে বলি, বাধা পেয়ে পিছু হঠার পাত্র তিনি কোনওকালেই ছিলেন না। যেটা করবেন ভাবতেন, তার জন্য এগিয়ে চলতেন। সুতরাং অনশনের সিদ্ধান্ত যদি তিনি নিতেন, কেউ তাঁকে আটকাতে পারত না। যেমন আটকাতে পারেনি ১৯৪৮ সালের ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু করা অনশন থেকে। পরিকল্পনা ছিল, দাবিপূরণ না হলে আমৃত্যু করবেন সেই অনশন। তাঁর এই হুমকির কাছে ভারত সরকার মাথা নত করে দেয় ছ'দিনের মধ্যে। অতএব ছ'দিন পরে তিনি তুলে নেন অনশন। কী ছিল সেই অনশনের কারণ? কারণ ছিল পাকিস্তানকে পঞ্চান্ন কোটি টাকা দেওয়া আর ভারতের মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা।

অতএব দেশভাগের বিরুদ্ধে মহাত্মা কী বলেছেন, সেইটাকে বেদবাক্য হিসেবে মেনে না নিয়ে এই ব্যাপারে কী কাজ তিনি করেছিলেন, সেটা দেখাই ভাল।

ভারতের ইতিহাস বইতে দেশভাগের খলনায়ক হিসেবে দেখানো হয়েছে মুখ্যত একটি মানুষকে। যাঁর নাম মহম্মদ আলি জিন্নাহ্। আর রাজনৈতিক দল হিসেবে সব দোষ চাপানো হয়েছে মুসলিম লীগের ওপর। সেই সঙ্গে দোষ চাপানো হয়েছে ব্রিটিশের ঘাড়েও। তার divide and rule পলিসির জন্য। এই অভিযোগটি যে একান্তভাবে সরলীকৃত ও ইতিহাসবিচ্যুত একটি অভিযোগ — সেটি ইতিহাসের সামান্য কয়েকটি পৃষ্ঠা ওল্টালে আমরা বুঝতে পারব।

১৯৪২-এর বসন্তে বর্মার (বর্তমান মায়নামার) ভিতর দিয়ে এসে ভারত সীমান্ত আক্রমণ করল জাপান। ব্রিটিশ বিপদের সংকেত পেল। বিশ্বযুদ্ধের সেই পর্যায়ে মিত্রবাহিনীর অবস্থা রীতিমত সঙ্গীন। ভারতের আভ্যন্তরীন পরিস্থিতি যাতে হাতের বাইরে না যায়, তার জন্য প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তিকে মাথায় রেখে নির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাব দিয়ে পাঠালেন স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স্‌কে। ক্রিপ্সের এই দৌত্য ইতিহাসে ক্রিপ্স্ মিশন, ১৯৪২ নামে পরিচিত। তাঁর প্রস্তাবে ছিল — এক, যুদ্ধের পরে যত শীঘ্র সম্ভব ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে ভারতীয় ইউনিয়নকে যুক্ত করে নেওয়া হবে; এবং দুই, একটি রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র-গঠনকর পরিষদ (Constituent Assembly) প্রতিষ্ঠা করা হবে, যে পরিষদ নির্বাচিত হবে প্রাদেশিক আইনসভার (Provincial Legislatures) সদস্যদের দ্বারা। এভাবে গঠিত রাষ্ট্রীয় পরিষদ অতঃপর ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনায়

বসবে এবং শাসন বিষয়ক বিশদ একটি চুক্তি সম্পাদন করবে। নেহরু ও কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারা এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। মুসলিম লীগও বিরোধিতা করেনি। কিন্তু গান্ধী এই প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করলেন। ফলে ব্যর্থ হয় ক্রিপ্‌স্ মিশন। গান্ধী শুধু প্রস্তাবের বিরোধিতা করেই ক্ষান্ত থাকেননি, তিনি তারপরই ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু করলেন এবং প্রাদেশিক আইনসভাগুলি থেকে কংগ্রেসিদের বেরিয়ে আসতে বললেন। যদি ক্রিপ্‌স্ মিশন ব্যর্থ না হত, তাহলে খণ্ডিত ভারত নিয়ে স্বাধীনতা পাওয়ার প্রশ্ন উঠত না। অতএব পুরো ঘটনাটির জন্য একটি মাত্র মানুষকেই দায়ী করা যায়, তিনি গান্ধী।

এরপর আসা যাক, ১৯৪৬ সালের ক্যাবিনেট মিশন দ্বারা প্রস্তাবিত গ্রুপিং প্ল্যান প্রসঙ্গে। ভারতকে অখন্ড রেখে স্বাধীনতা দেওয়ার এই ব্রিটিশ প্রস্তাবকে মেনে নিয়েছিল কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ উভয় দলই। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল:

এক, ধর্মের ভিত্তিতে ভারতকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করা হবে এবং এই প্রদেশগুলিকে নিয়ে ডমিনিয়ন অফ ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

দুই, ধর্মের ভিত্তিতে দুটি গ্রুপিং করা হবে। মুসলিমদের নিয়ে দুটি গ্রুপ থাকবে। বালুচিস্তান, সিন্ধু, পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে একটি গ্রুপ এবং বাংলা ও আসামকে নিয়ে আর একটি গ্রুপ। হিন্দু প্রধান মধ্যভারত, পশ্চিমভারত এবং দক্ষিণ ভারতকে নিয়ে হবে আর একটি গ্রুপ।

তিন, প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয় এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়া বাকি সব ব্যাপারে প্রদেশ বা গ্রুপগুলি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী থাকবে।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ দুটো দলই মেনে নিয়েছিল এই প্রস্তাব। দেশকে অবিচ্ছিন্ন রেখে স্বাধীনতা প্রাপ্তির এটা ছিল শেষ সুযোগ। মুসলিম লীগের একটা বড় অংশের সায় ছিল না এই প্রস্তাবে, তবু তাদের মেনে নিতে বাধ্য করেছিলেন জিন্নাহ্। এই প্রস্তাবটি ছিল ১৬ মে তারিখের। সব মেনে নেওয়ার পর ১০ জুলাই ১৯৪৬ তারিখে বোম্বাইতে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে হঠাৎই নেহরু ঘোষণা করে দিলেন যে, কংগ্রেস যখন Constituent Assembly-তে বসবে, তখন কোনও পূর্ব শর্ত মানবে না। একথা বলার আগে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কোনও মিটিং ডাকা তো দূরের কথা, কোনও সদস্যের সঙ্গে আলোচনাও নেহরু করেননি। জিন্না প্রচন্ড ক্ষুণ্ণ হলেন এই কথায় এবং ঘোষণা করে দিলেন, গ্রুপিং প্ল্যান থেকে মুসলিম লীগ তার সম্মতি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। ভারতকে অখণ্ড রেখে স্বাধীনতা প্রাপ্তির শেষ সুযোগটি এভাবে ভেস্তে গেল। এই ভেস্তে যাওয়ার জন্য দায়ী কে? মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর ইন্ডিয়া উইন্‌স ফ্রিডম গ্রন্থে

এই অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করেছেন নেহরুকে এবং এই জন্যে গ্রন্থের যে তিরিশটি পাতায় এই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন, শর্ত দিয়ে গিয়েছিলেন, আগামী তিরিশ বছর যেন সেই পাতাগুলি অপ্রকাশিত থাকে। কারণটি আর কিছু নয়, গণরোষের হাত থেকে নেহরু ও কংগ্রেস দলটিকে বাঁচানোর চেষ্টাই ছিল তাঁর মাথায়।

কিন্তু এই দায় একা নেহরুর ঘাড়ে চাপানোটা কতদূর ইতিহাসসম্মত? মনে রাখতে হবে ক্যাবিনেট মিশনের এই প্রস্তাব আসামাত্র গান্ধী বলেছিলেন— Worst than partition of India। অর্থাৎ ধর্মের ভিত্তিতে গ্রুপিং-এর এই প্রস্তাব দেশভাগের থেকেও খারাপ। দেশের ব্যাপক সংখ্যক মানুষ আজ কি তা মনে করে? দেশ যদি হিন্দুস্তান-পাকিস্তানে ভাগ না হত, তবে আর কিছু না হোক, সমরসজ্জার পিছনে যে বিপুল অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে, তার প্রশ্নই থাকত না। অন্যান্য আরও যেসব সমস্যা — বিশেষ করে কাশ্মীর সমস্যা — তারও উদ্ভব হত না। দেশভাগের পরিণামে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ যেভাবে গেল তাও যেত না। যে কোটি কোটি মানুষ বাস্তুহারা হল, তাদের এভাবে হারাতে হত না দেশ।

ক্যাবিনেট মিশনের এই প্রস্তাবকে ব্যর্থ করে দেওয়াটা হল অবিভক্ত ভারত পরিকল্পনার কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দেওয়ার সামিল। এর জন্য আপাতভাবে দায়ী নেহরু। কিন্তু মুখ্য চক্রী হলেন গান্ধী। এর পরেও কি বলব যে, তিনি দেশভাগ চাননি? ১৯৪৬-এর এই গ্রুপিং প্ল্যান ভেস্তে যাওয়ার পর লর্ড ওয়াভেলের জায়গায় নতুন ভাইসরয় হলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। তিনি দায়িত্ব নিয়েছিলেন ১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারিতে। তিন মাসের মধ্যে নূতন প্ল্যান তৈরি করলেন। এই প্ল্যানকে বলা হয় মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান বা ৩ জুন প্ল্যান। এখানে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের প্রস্তাব রাখা হল। যাতে কংগ্রেস দল এই প্রস্তাবের বিরোধিতা না করে, তার জন্য মাউন্টব্যাটেন ব্যাকডোর পলিটিক্স শুরু করে দিলেন নেহরুর সঙ্গে। ইংরেজদের প্রতি নেহরুর অন্তরের টান এবং ইংরেজি ভাষার প্রতি নেহরুর প্রচন্ড ভালবাসা (প্রসঙ্গত, গান্ধী নিজে এব্যাপারে বলেছিলেন — 'জহর স্বপ্নের মধ্যেও ইংরেজিতে কথা বলে') — এই দুটি বিষয়কে কাজে লাগালেন মাউন্টব্যাটেন। সেই সঙ্গে অনুঘটক হিসেবে জুড়ে দিলেন নিজের পত্নী এডুইনাকে। এডুইনা-জওহর প্রেমকাহিনি সুবিদিত, তবে এই প্রসঙ্গে তার বিস্তারিত আলোচনা অপ্রয়োজনীয়। মোদ্দা কথাটা হল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রত্যক্ষভাবে ভারতের শাসন ক্ষমতা নিজেদের হাত থেকে ছেড়ে দিতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল ইংরেজ এবং যত শীঘ্র সেটা সম্ভব হয়, তার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। তাই লর্ড ওয়াভেলের গ্রুপিং প্ল্যান ভেস্তে যাওয়ার পর বিন্দুমাত্র কাল হরণ না করে পাঠাল মাউন্টব্যাটেনকে। ব্রিটিশ চাইছিল, ১৯৪৮-এর আগস্ট মাসের মধ্যে ভারত থেকে চলে যেতে। অতএব মাউন্টব্যাটেনের দেশবিভাগের পরিকল্পনা এই মরিয়া ভাবনা থেকে উদ্ভূত।

বিরোধিতা ছাড়াই জওহরলাল রাজি হয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গে চলে এলেন সর্দার প্যাটেল। প্যাটেল ভেবেছিলেন, ভারত স্বাধীন হলে — তা খণ্ডিত হলেও — তিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন। সমর্থনের পাল্লাও ভারি ছিল তাঁর দিকে। এঁদের দুজন যেই মাউন্টব্যাটেন প্ল্যানকে মেনে নিলেন, তখন মাউন্টব্যাটেন গেলেন গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে। তারিখটা ছিল ২ জুন, ১৯৪৭। পরদিন (৩ জুন, ১৯৪৭) কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে কিনা সে ব্যাপারে সভা ছিল। সেই সভায় গান্ধীর পক্ষ থেকে যাতে কোনও বিরোধ না করা হয়, তার জন্য আগেভাগেই মাউন্টব্যাটেন গিয়েছিলেন গান্ধীর কাছে, তাঁর সম্মতি আদায় করতে।

কিন্তু গান্ধী যে সম্মত হয়ে বসে আছেন, সেটা আদৌ জানতেন না মাউন্টব্যাটেন। জানলে কষ্ট করে হয়তো যেতেন না। সেটা ছিল এক সোমবার। গান্ধীর সাপ্তাহিক মৌনব্রতের দিন। মাউন্টব্যাটেন তাঁকে বললেন —'I hope you will not oppose my plan.' মৌনব্রতী গান্ধী একটুকরো কাগজ তুলে নিলেন হাতে, তারপর লিখলেন সেখানে — 'Have I ever opposed you?'

এই কাগজের টুকরোটি মাউন্টব্যাটেনের নামাঙ্কিত সংগ্রহশালায় সযত্নে সংরক্ষিত আছে এখনও। পরদিন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের বেশিরভাগ সদস্য মাউন্টব্যাটেন প্ল্যানের বিরুদ্ধে মত দিলেন। তাদের ভরসা ছিলেন গান্ধী। ভেবেছিলেন, মহাত্মা নিশ্চয় মেনে নেবেন না দেশভাগের এই প্রস্তাব। সবশেষে গান্ধী উঠলেন বক্তৃতা দিতে এবং তারপর নানান ধানাইপানাই করে যে বক্তব্যটি রাখলেন, তা মাউন্টব্যাটেন প্ল্যানকে সমর্থন করে।

কিন্তু এটা তো গেল দেশভাগের ব্যাপারে গান্ধী কী করেছিলেন, তার বর্ণনা। তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম, ঘটনার টানাপোড়েন ঠিকমত বুঝতে পারেননি বলে নাহয় ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। এমনটা যে হতে পারে, সেটা হয়তো বুঝতে পারেননি তিনি। নাহয় মেনেই নিলাম সেই সম্ভাবনা। কিন্তু যে মানুষটি তাঁর মৃতদেহের ওপর দিয়ে ভারতভাগের কথা বলেন, এমন আন্তরিকভাবে দেশকে ঐক্যবন্ধ রাখার কথা বলেন, তিনি যদি এই ঘোষিত অবস্থানের একশ আশি ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলেন, তাহলে কোন্‌টিকে সত্যি বলে ধরব আমরা? ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগকে তিনি সমর্থন করতেন, না তার বিরোধিতা করতেন — কোন্‌ চোখে তাঁকে দেখব আমরা? দেশভাগ সম্পর্কে গান্ধীর এই দ্বিচারিতার প্রসঙ্গে বলব এবার।

১৯৪০ সালের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করল মুসলিম লীগ। সরকারিভাবে কংগ্রেস কোনও প্রতিক্রিয়া দিল না। তবু মুসলিম

লীগের এই প্রস্তাব গ্রহণের দশ দিনের মাথায় গান্ধী তাঁর 'হরিজন' পত্রিকার ৬ এপ্রিল (১৯৪০) সংখ্যায় লিখলেন — 'ভারতের অন্য যে কোনও সম্প্রদায়ের মানুষের মত মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে। আমরা একটা একান্নবর্তী পরিবারে আছি এবং এই পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার প্রত্যেকের।' (Like other groups of people in the country, Muslims also have the right of self-determination. We are living here as a joint family and hence any member has the right to get separated.) এই উক্তির সঙ্গে 'আমার মৃতদেহের ওপর দিয়ে ভারত বিচ্ছিন্ন হবে' এই গ্যালারি কাঁপানো কথার কি কোনও মিল খুঁজে পাওয়া যায়? প্রসঙ্গত, এই ঘটনার মাত্র কয়েকমাস আগে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু জিন্নাকে পত্র মারফত জানিয়েছিলেন যে, ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের কোনও প্রয়োজন নেই এবং তা তিনি করতেও দেবেন না। সুভাষ তখন সদ্য দ্বিতীয়বারের জন্য কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন এবং পাকিস্তানের দাবি সরকারি ভাবে লীগ নেয়নি তখনও।

শুধু এই একবার নয়, দু বছর পর ওই একই হরিজন পত্রিকার ১৮ এপ্রিল (১৯৪২) সংখ্যায় তিনি লিখলেন — 'সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা যদি বিশ্বাস করে যে তারা একটি আলাদা জাতি, তাহলে পৃথিবীর কেউই তাদের সেই বিশ্বাস পাল্টাতে পারবে না। তারা দেশভাগ চাইলে তা করতে হবে। হিন্দুরা যদি এটা পছন্দ না করে, তাহলে তারা এই চাওয়ার বিরোধিতা করতে পারে।'

তাঁর এই লিখিত বিবৃতি কি এটা প্রমাণ করে না যে, দেশভাগের বিরোধিতা করা তো দূরের কথা, তিনি তা সমর্থন করার পক্ষেই ক্রমশ এগিয়ে চলেছেন! তবু অভিনয়ে তখনও ক্ষান্ত দেন নি। আর এই অভিনয় চালিয়ে গিয়েছেন যেদিন দ্বিখণ্ডিত হল এই দেশ, সেইদিন পর্যন্ত।

এই প্রসঙ্গের শেষ করব দেশভাগ বিষয়ে গান্ধীর শেষ দিকের একটি মন্তব্যের উল্লেখ করে। দেশভাগ হল, অথচ, গান্ধীর মৃতদেহের ওপর দিয়ে তা হল না — এই বিষয়টি নিয়ে প্রতিদিন পাবলিকের বাক্যবাণে জর্জরিত হয়ে আর না থাকতে পেরে একদিন রেগে গেলেন গান্ধী। রাগের মাথায় তিনি যা বলেছিলেন, তা তাঁর শিষ্য প্যারেলাল নোট করে নিয়েছিলেন। গান্ধী তাঁর স্বভাবের বিরুদ্ধে গিয়ে বেশ চেঁচিয়ে বলেছিলেন — 'Should I kill myself to satisfy my critics?'

এই কথাটি ছাড়া তাঁর আর কিছু বলারও ছিল না সেদিন।

নেতাজিকে গুম করার চক্রান্তে গান্ধীরও সায় ছিল

১৮ আগষ্ট, ১৯৪৫-এ তাইওয়ানের তাইপেই বিমানবন্দরে এক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর। সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী 'মৃতদেহ' সেখানেই দাহ করা হয় এবং চিতা ভস্ম রক্ষিত থাকে জাপানের রেনকোজি মন্দিরে। ২৩ আগষ্ট, ১৯৪৫-এ এই সম্পর্কিত ঘোষণা করে জাপান সরকার। টোকিওতে নেতাজি সম্পর্কে সরকারি ভাষ্য এটাই। কিন্তু এই সরকারি ভাষ্যে বিশ্বাস রাখেনি দেশের মানুষ। মানুষের দাবির সামনে সত্য ঘটনা জানার জন্য তদন্ত কমিশন বসেছে একাধিক। প্রথম তদন্ত কমিশনের নাম শাহ্ নওয়াজ কমিশন। গঠিত হয় ১৯৫৬ সালে। নেতাজির একদা সহকর্মী ও অতীব বিশ্বাসভাজন শাহ্ নওয়াজের নেতৃত্বে বসে এই কমিশন। কমিশনের রায়ে মেনে নেওয়া হয় যে, সেদিনের বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির সত্যই মৃত্যু হয়েছিল। কমিশনের অন্যতম সদস্য এবং নেতাজির দাদা সুরেশচন্দ্র বসু অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করেছিলেন এবং রিপোর্টে সেটি নথিভুক্ত হয়। পার্লামেন্টে সেই রিপোর্ট রাখা হলে তার বেশিরভাগ অংশই সরকার গ্রহণ করে।

ভারতের জনতা সেই রিপোর্ট গ্রহণ করেনি। তারা মনে করেছিল, এই রিপোর্টে সত্যকে প্রকাশ করা হয়নি। তাই তাদের চাপে ১৯৭০ সালে পাঞ্জাব হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্র প্রধান বিচারপতি জাস্টিস জি.ডি. খোসলার নেতৃত্বে আরও একটি তদন্ত কমিশন বসান জওহরলাল কন্যা ইন্দিরা গান্ধী। শাহ্নওয়াজ কমিশনের ধাঁচেই জমা পড়ল খোসলা কমিশন এবং সরকার সেটি মেনেও নিল।

তবু মানুযের সন্দেহের নিরসন হল না। তারা ভালভাবে ও নিরপেক্ষ ভাবে তদন্ত করার দাবি জানাতে থাকল। নেহরু ও তাঁর দল কংগ্রেসের পরিচালিত সরকার ঐতিহাসিক কারণে নেতাজি মৃত্যুরহস্যের উন্মোচন যে করতে চায় না, সে ব্যাপারে মানুষের সন্দেহ দৃঢ় হতে থাকল। তারা চাইল, একটা দল-নিরপেক্ষ তথা রাজনীতি-নিরপেক্ষ তদন্ত হোক এ ব্যাপারে।

সেই সুযোগ এল ১৯৯৮ সালে। অটলবিহারী বাজপেয়ির প্রধানমন্ত্রিত্ব কালে। ১৯৯৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন বিধানসভার পক্ষ থেকে সমস্ত সদস্যদের দ্বারা গৃহীত এক সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে কেন্দ্রীয় সরকারকে নেতাজি মৃত্যু রহস্য উন্মোচনের জন্য একটি নূতন তদন্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। প্রায় সমসময়ে এক জনস্বার্থের মামলায় কলকাতা হাইকোর্টও এব্যাপারে নতুনভাবে তদন্ত করার জন্য আদেশ দেয় কেন্দ্রীয় সরকারকে। কেন্দ্রে তখন অটলবিহারী বাজপেয়ির

নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত এন ডি এ সরকার। তারা অবসরপ্রাপ্ত জাস্টিস মনোজ মুখার্জির অধীনে এক কমিশন বসাল। কমিশনের মূল বিচার্য বিষয় ছিল পাঁচটি —

(১) নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু জীবিত, না মৃত?

(২) যদি মৃত হন, তবে কথিত বিমান দুর্ঘটনায় সেই মৃত্যু ঘটেছিল কি?

(৩) জাপানের মন্দিরে রক্ষিত চিতাভস্ম কি নেতাজির?

(৪) যদি সেই বিমানদুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু না হয়ে থাকে, তবে কবে, কোথায় ও কিভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল?

(৫) যদি তিনি জীবিত থাকেন, তবে কোথায় ও কিভাবে তিনি জীবিত আছেন?

দীর্ঘ প্রায় আট বছর তদন্ত করার পর ২০০৬ সালে জাস্টিস মুখার্জি তাঁর রিপোর্ট পেশ করেন সরকারের কাছে ও সেই রিপোর্ট পার্লামেন্টে পেশ হয় সেই বছরেই। রিপোর্টে জাস্টিস মুখার্জি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেন যে, একমাত্র তাইওয়ানের সরকার ছাড়া বাকি সরকারগুলি যেমন, ব্রিটিশ, রুশ, জাপান এবং বিশেষভাবে ভারতের সরকার সর্বব্যাপারে কমিশনের সঙ্গে চূড়ান্ত অসহযোগিতা করেছে। নেতাজি সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফাইল দেখতে দেওয়া তো দূরের কথা, ছুঁতে পর্যন্ত দেওয়া হয়নি কমিশনকে। রাশিয়া জানিয়েছিল, নেতাজি সম্পর্কিত ফাইল আছে সোভিয়েত আমলের কুখ্যাত গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবি-র মহাফেজখানায় (archive)। কিন্তু কমিশনের সদস্যদের অনুমতি দেয়নি সেখানে যাওয়ার। একই অবস্থা ব্রিটেন ও জাপানের। জাপানের পক্ষ থেকে এই গোপনীয়তার আশ্রয় কেন? তাহলে কি সুভাষের অন্তর্ধান ষড়যন্ত্রে তারাও লিপ্ত ছিল রুশ-ব্রিটেনের সঙ্গে? সন্দেহটা উড়িয়ে দেওয়ার নয়। আর স্বাধীন ভারতের স্বাধীন সরকার কী ভূমিকা পালন করেছিল? তারা Evidence Act-এর ১২৩ ও ১২৪ ধারা অনুযায়ী এবং ভারতীয় সংবিধানের ৭৪ (২) ধারা অনুযায়ী নেতাজি সম্পর্কিত বিপুল দস্তাবেজ দেখার অনুমতিই দিল না কমিশনকে। আগেই বলেছি, একমাত্র তাইওয়ান সরকার যথাসাধ্য সাহায্য করেছিল। তারাই জানায় যে, সমগ্র তাইওয়ানে ১৯৪৫ সালের ১৮ আগষ্ট কোনও বিমান দুর্ঘটনা ঘটেনি! যাই হোক, এই কমিশনের রিপোর্ট আসতে আসতে তো অটলবিহারী বাজপেয়ির সরকার ক্ষমতা থেকে সরে গেল; এসে গেল ইউ পি এ তথা কংগ্রেস সরকার। তারা এই রিপোর্ট অগ্রাহ্য করল। মনোজ মুখার্জি কমিটির সুপারিশে জানানো হল ----

(এক) নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু বর্তমানে মৃত।

(দুই) ১৯৪৫-এর সেই বিমান দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান নি, সম্ভবত, তিনি সোভিয়েত দেশে (বর্তমানে রাশিয়া) উড়ে গিয়েছিলেন।

(তিন) জাপানের রেনকোজি মন্দিরে রক্ষিত চিতাভস্ম নেতাজির নয়।

(চার) প্রমাণের অভাবে পরবর্তীকালে কোথায়, কখন ও কিভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, তা পরিষ্কার ভাবে বলা সম্ভব নয়।

(পাঁচ) যেহেতু তাঁকে মৃত বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে তাই কোথায় আছেন তিনি, এই প্রশ্ন অবান্তর।

কেন্দ্রিয় সরকার এই রিপোর্ট অগ্রাহ্য করল বটে, তবে দেশ তথা বিদেশের বিপুল সংখ্যক নেতাজি-অনুরাগীদের সন্দেহটা সত্যি বলে প্রমাণিত হল এতদিনে। তা হল, ১৯৪৫-এর সেই বিমান দুর্ঘটনা ছিল আত্মগোপনের বা camouflage -এর জন্য একটা চাল মাত্র। অন্য কোথাও পালাবার জন্য এর দরকার হয়েছিল। এখন প্রশ্ন, দরকারটা কার হয়েছিল? নেতাজির একক সিদ্ধান্ত কি ছিল এটি? নাকি রুশ-জাপানের সঙ্গে মিলে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি? নাকি তাঁকে ছাড়াই কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল? যেভাবে জাপান এবং রাশিয়া এবং সেইসঙ্গে ব্রিটেন এব্যাপারে কঠোরতম গোপনীয়তার আশ্রয় নিয়ে চলেছে আজ পর্যন্ত, তাতে এই সন্দেহটাই দৃঢ় হয় যে, বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জাপান নিজেকে বাঁচাবার জন্য নেতাজিকে তুলে দিয়েছিল সোভিয়েতের হাতে। হয়তো তাতে নেতাজিরও সায় ছিল। এবং এই তথ্য খুব ভালোভাবেই জানত ব্রিটেন। আর ব্রিটেনের কাছে সেই তথ্য থাকা মানে গান্ধী-নেহরুদের কাছেও সেই তথ্য থাকা। দেশকে দুভাগ করে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য ব্রিটিশরা তখন মরিয়া। একথাও তারা বলেছিল যে, কংগ্রেস দল যদি খণ্ডিত স্বাধীনতা নিতে না চায়, তবে জেলাশাসকদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে তারা চলে যাবে এদেশ ছেড়ে।

এই সময়ে গান্ধীর একটি কথা ঘোর সন্দেহের উদ্রেক করে। তথাকথিত দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু সংবাদ শুনে শিষ্যা রাজকুমারী অমৃত কাউরকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন গান্ধী — 'Subhas Bose has died. Well. He was undoubtedly a patriot, though misguided.' এই well শব্দটি যথেষ্ট বিশ্লেষণের দাবি রাখে। নেতাজির মৃত্যুসংবাদ যে তাঁর কাছে কোনও শোকসংবাদ ছিল না, তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তাই বলে এমন হৃদয়হীনের মত উক্তি! Subhas Bose has died. Well! আসলে প্রাথমিক ভাবে নেতাজির অন্তর্ধানের পশ্চাতে সোভিয়েত-ব্রিটেন-জাপানের কী চুক্তি হয়েছিল, সেটা

জানতেন না এখানকার কংগ্রেসি নেতৃত্ব। তাঁরা দুর্ঘটনার খবর সত্যি বলেই ধরেছিলেন। সেই ভুল ভাঙে দু বছরের মাথায় — ১৯৪৭ সালের জুন মাসে। যখন মাউন্টব্যাটেনের দ্বিতীয় প্ল্যান অনুযায়ী ধর্মের ভিত্তিতে দেশকে দ্বিখণ্ডিত করে স্বাধীনতার প্রস্তাব দেওয়া হয়। কংগ্রেসের মধ্যে একটা বড় অংশ এভাবে স্বাধীনতা পাওয়ার বিরুদ্ধে ছিলেন। গান্ধীর আসল আকার ততদিনে তরল পদার্থসুলভ হয়ে গেছে। পাত্রের আকারই তাঁর আকার — যেখানে যেমন সেখানে তেমন। জহরলাল আর প্যাটেলের সামনে ভারত ভাগের পক্ষে, আবার রাজাগোপালাচারি-পি ডি ট্যাণ্ডন ইত্যাদিদের সামনে ভারতভাগের বিপক্ষে।

এই পরিস্থিতিতে মোক্ষম দাওয়াইটি দিলেন মাউন্টব্যাটেন। বললেন, আর দেরি করলে আপনারা নন, অন্য কোনও ব্যক্তি এসে সব দখল করে নেবে। আপনারা কি তাই চান?

এবার আক্ষরিক অর্থে জোঁকের মুখে নুন। মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে সেই বৈঠকের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ অবশ্যই সযত্নে রক্ষিত করেছিল ব্রিটিশ। কারণ, তারা এসব ব্যাপারে খুব পরিপাটি। সেইসব দলিল-দস্তাবেজ এখন গোপনীয়। কারও তা দেখার অধিকার নেই। এই সব দস্তাবেজের কিছু অংশ রক্ষিত আমাদের স্বাধীন ভারতের স্বরাষ্ট্র দপ্তরেও। বারংবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও যা জাস্টিস মুখার্জিকে দেখায়নি স্বরাষ্ট্র দপ্তর। প্রশ্নটা অবশ্যই ওঠে, কেন দেখানো হয়নি সেইসব দলিল? কেন বলা হল বড় স্পর্শকাতর (sensitive) বিষয় আছে সেখানে! স্পর্শে কাতর হয় একটি লতা, যার নাম লজ্জাবতী। এটা কি সেই ধরণের স্পর্শকাতরতা? যে হাত লাগলে পাতা বুঁজে যাবে! তাই হাত লাগানো যাবে না? আদৌ তা নয়, এখানে আছে এমন কিছু বিস্ফোরক তথ্য যা নেতাজিকে নিয়ে তিন শক্তি রুশ-ব্রিটেন-জাপানের গোপন চুক্তি শুধু নয়, তৎকালিন ভারতের ক্ষমতার আসনে যারা বসে ছিলেন, তাঁদের চেহারাটাও উলঙ্গ করে দিতে পারে। তাই এই কঠোর গোপনীয়তা।

ফিরে আসি গান্ধী-মাউন্টব্যাটেন বৈঠকের কথায়। কিন্তু কল্পনা মিশিয়ে সেদিনের বৈঠকের ছবি আঁকা ছাড়া কোনও উপায় নেই। তাই ঐতিহাসিক বিষয়ে কল্পনার আশ্রয় নেওয়াটা অপরাধ হলেও করতে হচ্ছে।

মাউন্টব্যাটেনের ওই কথার পর গান্ধী জানতে চেয়েছিলেন, অন্য ব্যক্তি বলতে কার কথা বোঝাচ্ছেন আপনি?

সুভাষ চন্দ্র বোস। সাফ উত্তর দিয়েছিলেন মাউন্টব্যাটেন।

সে কি! আঁতকে উঠেছিলেন গান্ধী — সে তো দু বছর আগেই মরেছে।

ভুল খবর। জাপানকে বাধ্য করা হয়েছিল ওই খবরটা প্রচার করতে। সুভাষ বোস এখনও বেঁচে আছে।

বাঁচিয়ে রাখার কী দরকার ছিল? ল্যাঠা তো ওইদিনেই চুকিয়ে দেওয়া যেত।

মাউন্টব্যাটেন হেসেছিলেন — ব্রিটিশের একটা নিয়ম আছে ল্যাঠা চুকানোর বেলায়। তা হল, যে অপরাধী মরে যাচ্ছে, তাকে সেবা-শুশ্রূষা করে বাঁচাও, তারপর বিচার করো, তারপর ফাঁসিতে চড়াও।

গান্ধী একটু ভাবলেন। তারপর বললেন — কোথায় আছে সে?

ধরে নিতে পারেন আমাদেরই কাছে। সোবিয়েত আপাতত আমাদের বন্ধু। যুদ্ধ যখন শুরু হয়েছিল তখন রাশিয়া আমাদের সঙ্গে ছিল না, পরে তারা এসেছে আমাদের সঙ্গে। আমাদের স্বার্থেই তারা সুভাষকে রেখেছে সেখানে। আমরা তার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি। যে কোনওদিন তাকে নিয়ে এসে দিল্লির লালকেল্লায় হাজির করতে পারি। তখনকী হবে আপনার, কী হবে আপনার প্রিয় জহরলালের — কল্পনা করতে পারেন?

সুতরাং ঘুরে গেলেন গান্ধী। ৩ জুন ১৯৪৭ তারিখে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি দেশভাগের সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলল। গান্ধী মৌন থাকলেন। এরপর ১৪ জুনের (১৯৪৭) এ আই সি সি বৈঠক। গান্ধী ভাষণ দিলেন সেখানে — 'I always opposed partition and no one can deny that. However, a situation has now created where there is no alternative. Political realism demands the acceptance of the Mountbatten Plan on partition and I would appeal to the members to accept it.' গান্ধীর এই খোলাখুলি আহ্বানের ফলে দেশভাগের প্রস্তাব ২৯-১৫ ভোটে পাশ হল এবং এভাবে মেনে নেওয়া হল দেশভাগ। এল স্বাধীনতা। ক্ষমতায় এলেন জহরলাল-প্যাটেলরা। কিন্তু তাঁদের মাথার ওপর রইলেন গান্ধী। 'জাতির জনক' উপাধিটি এই সময়ে পেলেন গান্ধী। স্বাধীনতা-উৎসব উদ্‌যাপনে যোগ না দিয়ে প্রতিবাদ জানাতে গান্ধী তখন কলকাতায়। সেখানে দূত এল নেহরু-প্যাটেলের চিঠি নিয়ে। সেই চিঠিতে গান্ধীকে তাঁরা লিখেছিলেন — ' আপনি জাতির জনক (Father of the Nation), আপনি না থাকলে কি স্বাধীনতা আসতে পারে? দিল্লি আসুন দয়া করে।'

গান্ধী অবশ্য দিল্লি যান নি সেদিন। তার জন্য উৎসব আটকে থাকেনি যদিও। পরে গান্ধী ঠিকই এসেছিলেন দিল্লিতে এবং নতুন সরকারের 'Extra Constitutional Power'-ও হয়ে উঠেছিলেন। সেই সময় দেশ জুড়ে নেতাজির অন্তর্ধান

রহস্য নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। যদিও, তখনও সাংবিধানিক প্রধান হয়ে আছেন মাউন্টব্যাটেন, তবু গান্ধী যদি চাইতেন, তবে কি নেতাজি অন্তর্ধান রহস্যের জট খোলার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারতেন না? অবশ্যই পারতেন। কিন্তু তা তিনি চাননি।

প্রসঙ্গত, জাস্টিস মুখার্জি কমিশনের অনুসন্ধানে যে বিষয়গুলি নিঃসন্দিগ্ধভাবে উঠে আসে, তার মধ্যে একটি হল, এক ভূতপূর্ব রুশ জেনারেল কমিশনের কাছে শপথ নিয়ে বলেছিলেন (swore under oath) যে ১৯৪৬ সালে যে নেতাজি বেঁচে ছিলেন এবং রাশিয়াতে ছিলেন — এই সম্পর্কে সোবিয়েত মন্ত্রিসভার এক ক্যাবিনেট পেপারে স্পষ্টভাবে লেখা ছিল আর তিনি তা স্বচক্ষে দেখেছিলেন। মুখার্জি কমিশন বেশ কিছু তথ্য পেয়েছে, যার দ্বারা বলা যায় বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে নেতাজি সাইবেরিয়াতে বন্দী জীবন কাটাচ্ছিলেন। নেহরু সরকারের সোবিয়েত-প্রীতির একটা বড় কারণ ছিল নেতাজি। তাঁর ভয় দেখিয়ে নেহরুকে নিজেদের পক্ষে টেনেছিল সোবিয়েত ইউনিয়ন। এই ব্ল্যাকমেলের কাছে হার মানেন নেহরু। গদি বাঁচাবার জন্য।

গান্ধীর অনশন ছিল ব্ল্যাকমেলের রাজনীতি

একটা কথা বহুল প্রচলিত যে, গান্ধী অনশন করতেন ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে। তিনি অনশন করতেন ব্রিটিশের সুমতি জাগানোর জন্য। সাধারণভাবে ভারতবাসীর বিশ্বাস, লড়াই করতে নেমে নিজের শরীর সম্পর্কে, স্বাস্থ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ছিলেন গান্ধী। শরীর ভেঙে পড়ছে জেনেও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অনশন চালিয়ে গিয়েছেন তিনি।

প্রশ্ন হল, কথাটা কি ঠিক? নাকি প্রচার? যদি অংশত ঠিক হয়, তবে তার পরিমাণ কতটা? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে অনশন বিষয়টি বলতে কী বোঝায় এবং গান্ধী তাঁর অনশন বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন,সেই হদিশ করাটা প্রথমে জরুরি।

অনশন ভারতীয় হিন্দু সমাজে একটি অতি প্রচলিত প্রথা। প্রচলিত এবং পরিচিতও বটে। অবশ্য তা অনশন নামে নয়, উপবাস নামে। বছরের বেশ কিছুদিন উপবাসে থাকা ধর্মপ্রাণ হিন্দুর অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। বর্তমানের চিকিৎসা শাস্ত্রবিদ্‌দের অনেকে বলেন, মাঝে মাঝে এক-আধটা উপবাস দিলে শরীর ভাল থাকে, পাচনতন্ত্রের একটু বিশ্রামপ্রাপ্তি হয়। আবার অন্য এক দল বলেন, শরীর

হল সর্বদা চলমান একটি যন্ত্র। পেট্রল ছাড়া যেমন গাড়ির ইঞ্জিন চলে না, খাদ্য না পেলে তেমন শরীরের ইঞ্জিন চলে না। সাধু সন্ন্যাসীরা সাধনার অঙ্গ হিসেবে উপবাস করতেন বটে, তবে সেখানেও কাম-ক্রোধ ইত্যাদি ষড়রিপুকে দমিত করে রাখার একটা কারণও যে থাকত না, এমন নয়। প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ গ্রন্থে এক তান্ত্রিক মাতার বর্ণনা দিয়েছেন, যিনি আদি রিপু কামকে দমন করার জন্য উপবাস করতেন। এছাড়াও কামের ইচ্ছাকে দমন করতে আরও কিছু শারীরিক কষ্ট স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতেন। হিন্দু ঘরের বিধবাদের জন্য উপবাস ও নিষিদ্ধ খাদ্যদ্রব্যের দীর্ঘ তালিকা এইজন্যেই নির্দিষ্ট ছিল যাতে, তাদের শরীর কোনও রকমে উত্তপ্ত না হয়।

গান্ধীর রাজনীতি তথা আদর্শে একটা বড় ভূমিকা ছিল উপবাস বা অনশনের। সাধারণভাবে অনশনের সময় তিনি মৌনব্রত পালন করতেন। তবে এমন উদাহরণও আছে, যখন অনশনের সময় কথা বলেছেন তিনি। কিন্তু ভারতের বহুল প্রচলিত 'উপবাস' শব্দটিকে বাদ দিয়ে 'অনশন' শব্দটিকে গান্ধী ব্যবহার করলেন কেন? অনশনের প্রতিশব্দ হল উপবাস, অনাহার। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে অনশন হল — ন (অন্) + অশন। অশন শব্দের অর্থ আহার। উপবাস শব্দের ব্যুৎপত্তি উপ + বস (ধাতু) + অ, যার অর্থ আহারে বিরতি। একই অর্থ অনাহার শব্দটির — ন (অন্) + আহার, অর্থাৎ আহার বর্জন করা। এই তিনটি শব্দের মধ্য থেকে 'অনশন' শব্দটি গান্ধী বেছে নিয়েছিলেন সম্ভবত এই কারণেই যে ধর্মীয় 'উপবাস' বা 'অনাহার'-এর কারণ থেকে আলাদা করে নিজের আহার বর্জনের বিষয়টি মানুষের দৃষ্টিগোচরে আনার জন্য। ধর্ম থেকে রাজনীতিকে আলাদা করার জন্য এবং সেই সঙ্গে অনশনের অন্য কিছু কারণকেও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

যদিও সাধারণভাবে মানুষের বিশ্বাস এই যে, ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে তিনি অনশনে বসতেন, কিন্তু আসলে দেখা যায়, এটি অন্যতম কারণ হতে পারে অবশ্যই, কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। এমনকি, প্রধানতম কারণও নয়। অনশনের জন্য ব্যবহৃত সাধারণ কারণগুলি ছিল এরকম —

১) প্রবৃত্তি দমন ও মানসিক দৃঢ়তা বাড়ানোর একটি পদ্ধতি;

২) দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা নিজেকে কলুষমুক্ত করার একটি উপায়;

৩) ব্রিটিশদের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার একটি অস্ত্র;

৪) অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর একটি পন্থা — যে পন্থা তাঁকে স্বয়ং ঈশ্বর দিয়েছেন। (I have undertaken fast at God's call for the eradication of untouchability, root and branch)

৫) মানবতাকে কলুষিত যারা করছে, তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের একটি পথ। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ও সম্প্রীতির সপক্ষে তাঁর অনশন এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত;

৬) নিজের দাবি-দাওয়া আদায়ের একটি অস্ত্র।

এই লক্ষ্যগুলিকে সামনে রেখে গান্ধী তাঁর অনশনব্রত চালিয়েছেন। ১৯১৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসকালে তাঁর প্রথম অনশন — যখন তাঁর বয়স প্রায় চুয়াল্লিশ, আর তাঁর শেষ অনশন ১৯৪৮ সালে, মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে। জীবনের এই দীর্ঘ চৌত্রিশটি বছর ধরে তিনি সর্বমোট ২৯টি পর্যায়ে ১৩৪ দিন অনশনে কাটিয়েছেন। কবে, কখন, কী কারণে তিনি অনশন করেছেন এবং কতদিন ধরে করেছেন সেই অনশন — তার একটি বিবরণ প্রথমে দিচ্ছি। তারপর আমরা যাব বিশ্লেষণে। দেখব, অনশনের পিছনে তাঁর যে রাজনীতি ছিল, তার আসল চেহারা কীরকম ছিল, দেখব সাধারণের বিশ্বাসের সঙ্গে কতটা খাপ খায়।

বর্ষানুক্রমিক হিসেবে এক নজরে গান্ধীর অনশন

বর্ষ/ তারিখ	ব্যাপ্তি	অনশনের কারণ
১৯১৩	(৭ দিনের জন্য)	ফিনিক্স ফার্মের দুই বাসিন্দার গর্হিত আচরণের বিরুদ্ধে।
১৯১৪	(১৪ দিনের জন্য)	ঐ
১/৬/১৯১৫	(১ দিনের জন্য)	আশ্রমের বালকরা মিথ্যা কথা বলেছিল।
১১/৯/১৯১৫	(১ বেলার জন্য)	একজন হরিজন ভর্তি হয়েছিল, আশ্রমিকরা আপত্তি জানালে সন্ধ্যার আহার বর্জন করেন তিনি।
১৫/৩/১৯১৮	(১ দিনের জন্য)	আমেদাবাদের মিলের শ্রমিকদের বেতনবৃদ্ধির দাবিতে।
৬/৪/১৯১৯	(১ দিনের জন্য)	অনশনের মধ্য দিয়ে জীবনের প্রথম সত্যাগ্রহ শুরু করেন।

১৩/৪/১৯১৯	(৩ দিনের জন্য)	জালিয়ানওয়ালা বাগের ঘটনার প্রতিবাদে। (তৎসহ বোম্বে ও আমেদাবাদের গণ্ডগোলের পরিপ্রেক্ষিতে)।
১৯/৪/ ১৯২১	(৩ দিনের জন্য)	বোম্বেতে গণ্ডগোলের প্রতিবাদে (সাম্প্রদায়িক গোলমাল)
২৮/১১/১৯২১	(১ দিনের জন্য)	স্বরাজের দাবিতে। এর পর থেকে প্রতি সপ্তাহের প্রতি সোমবার এক দিনের জন্য অনশনের সিদ্ধান্ত নেন।
১২/২/১৯২২	(৫ দিনের জন্য)	চৌরিচৌরার সহিংস সত্যাগ্রহীদের বিরুদ্ধে। আমৃত্যু অনশন করবেন বলে ঠিক করেছিলেন।
১৭/৯/১৯২৪	(২১ দিনের জন্য)	সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য।
২৪/১১/১৯২৫	(৭ দিনের জন্য)	আশ্রমের কিছু বালক-বালিকার মধ্যে যৌন সম্পর্ক ঘটছে — এটা প্রকাশ হওয়ায়।
২২/৬/ ১৯২৮	(৩ দিনের জন্য)	এক আশ্রমিকের চরিত্রস্খলনের বিরুদ্ধে।
২০/৯/১৯৩২	(৬ দিনের জন্য)	হরিজনদের জন্য আলাদা নির্বাচন কেন্দ্র তৈরির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে।
৩/১২/১৯৩২	(১ দিনের জন্য)	সরকার তাঁকে শৌচালয় পরিষ্কার করতে নিষেধ করেছিল বলে।
৮/৫/ ১৯৩৩	(২১ দিনের জন্য)	নিজেকে এবং সহকর্মীদেরকে পবিত্রকরণ (purification) করার জন্য আমৃত্যু অনশন।
১৬/৮/১৯৩৩	(৭ দিনের জন্য)	জেলখানায় শৌচালয় পরিষ্কার করতে দেওয়ার দাবিতে।
৭/৮/১৯৩৪	(৭ দিনের জন্য)	এক হরিজন বিদ্বেষীকে তাঁর এক সমর্থক লাঠি দিয়ে মারায় (এবং কম্যুনাল অ্যাওয়ার্ড-এর মাধ্যমে হরিজনদের হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রতিবাদে

		আমৃত্যু অনশন)।
৩/৩/১৯৩৯	(৪ দিনের জন্য)	রাজকোটের শাসক প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করায়।
১২/১১/১৯৪০	(২ দিনের জন্য)	আশ্রমের দু-তিনটি সাধারণ জিনিস খোয়া যাওয়ায়।
৫/৫/১৯৪১	(৩ দিনের জন্য)	বোম্বে এবং আমেদাবাদে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হওয়ায়।
২৯/৬/১৯৪১	(১ দিনের জন্য)	সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য।
১০/৩/১৯৪৩	(১ দিনের জন্য)	সরকার কর্তৃক কংগ্রেসের ঘাড়ে ভারত ছাড় আন্দোলনের সময়কালীন গণ্ডগোলের দায় চাপানোয়।
৩০/১১/১৯৪৪	(১ দিনের জন্য)	(সম্ভবত) আশ্রমে তাঁর ব্রহ্মচর্য নিয়ে কথা ওঠায়।
২০/১০/১৯৪৬	(১ দিনের জন্য)	মুসলিম লীগকে লেখা একটি চিঠি নকল করার সময় এক কর্মী একটা ভুল করেন, তার প্রতিবাদে।
১৫/৮/১৯৪৭	(১ দিনের জন্য)	দেশভাগের বিরুদ্ধে (কলকাতায়)
১/৯/১৯৪৭	(৩ দিনের জন্য)	সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য। আমৃত্যু অনশনের ভাবনা।
১১/১০/১৯৪৭	(১ দিনের জন্য)	বিক্রম শতাব্দীর ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী এটি তাঁর জন্মদিন। উদ্‌যাপনের পরিবর্তে অনশন। মূল কারণ সম্প্রীতি রক্ষা।
১৩/১/১৯৪৮	(৬ দিনের জন্য)	পাকিস্তান ও মুসলিমদের স্বার্থরক্ষার দাবিতে

(তথ্যসূত্রঃ — Years of Fasts of Mahatma Gandhi
www.gandhi-manibhavan.org/about gandhi/chronology)

উপরের এই তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকার সময় জার্মানি-ইহুদি বন্ধু হেরমান কালেনবাখের সঙ্গে যৌথভাবে প্রতিষ্ঠিত ফিনিক্স ফার্মের দুই আবাসিকের গর্হিত আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এবং যাতে তারা সুপথে ফিরে আসে, তার জন্য ১৯১৩ সালে গান্ধী তাঁর জীবনের প্রথম অনশন পর্ব শুরু করেন যা চলেছিল সাত দিন। তাঁর সেই অনশন যে ফলপ্রসূ

হয়নি তার প্রমাণ — ওই একই কারণে পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯১৪ সালে আবার তিনি অনশনে বসেন। এবার চোদ্দ দিন। যতদূর জানা যায়, গর্হিত আচরণটি ছিল যৌনতা সংক্রান্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, কালেনবাখ ও গান্ধীর সম্পর্কেও যৌনতা ছিল — এরকম কথা ফার্মের অন্য আবাসিকদের অনেকে বিশ্বাস করত। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখাব যে, এই অভিযোগ কতদূর সত্য। তবু চোদ্দ দিনের অনশন দেখে মনে হয়, ব্যথিত গান্ধী তাঁর আশ্রমিকদের আত্মিক উন্নতির পাশাপাশি তাঁর নিজের মধ্যেও শক্তি সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। যাই হোক, আশ্রমিকদের কলুষতা মুক্ত করার জন্য ১.৬.১৯১৫ তারিখে একদিনের জন্য অনশনে বসেন গান্ধী। এই তিনবারের অনশন দক্ষিণ আফ্রিকাতে। ভারতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত এক আশ্রমের কয়েকজন আবাসিক এই ধরণের গর্হিত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লে ২৪.১১.১৯২৫ থেকে সাতদিনের জন্য অনশন করেন তিনি। এই আবাসিকদের মধ্যে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিলালও ছিল। এক আশ্রমিকের স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে সে। আবার ২২.৬.১৯২৮ থেকে একই ধরণের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিন দিনের অনশন করেন গান্ধী। আশ্রমের দু-একজন আবাসিকের মধ্যে চুরির প্রবণতা দেখা দেওয়ায় ২২.১২.১৯৪৯ থেকে দুদিন অনশনে বসেন। অর্থাৎ আশ্রমিক ও সহকর্মীদের আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মোট ছয় পর্যায়ে চৌত্রিশ দিন অনশন করেন।

দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে নিজেকে কলুষমুক্ত করার জন্য এবং নিজের অন্তরের শক্তি বাড়াবার জন্য ৮.৫.১৯৩৩-এ অনশনে বসেন তিনি। সেই অনশন চলে একুশ দিন। গান্ধীর জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘ অনশন। অনেকে যদিও এই অনশনটিতে তাঁর রাজনৈতিক চাপের অনশন বলে মনে করেন। কেউ কেউ আবার বলেন হরিজনদের স্বার্থে এই অনশন। এমন কথাও উঠেছে, গান্ধী-আরউইন চুক্তির বিফলতার বিরুধে এই অনশন ছিল প্রতিবাদ। হয়তো অনেকগুলি কারণে মিলে মিশে শুরু হয়েছিল এই অনশন, তবু বেশির ভাগ গান্ধী ভক্তের মতে গান্ধী-আরউইন চুক্তির ব্যর্থতায় যখন তিনি মানসিকভাবে কিছুটা ভেঙে পড়েছেন, তখন মানসিক শক্তি ফিরিয়ে আনার জন্য ছিল এই অনশন। এই পর্যায়ে তাঁর অন্য অনশনগুলি ছিল — ১৬.৮.১৯৩৩-এ শুরু করা সাতদিনের অনশন — দাবি ছিল, জেলখানায় শৌচালয় পরিষ্কার করার কাজটি তিনি নিজে করবেন। একই কারণে এর আগে ৩.১২.১৯৩২ তারিখে একদিনের অনশন করেন। ৩০.১১.১৯৪৪-এ একদিনের জন্য অনশন করেন তাঁর ব্রহ্মচর্য নিয়ে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছিল, তাতে ব্যথিত হয়ে। অর্থাৎ মোট চারটি পর্যায়ে

মোট ত্রিশ দিন অনশন চালান তিনি।

হরিজনদের সপক্ষে এবং অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের লক্ষে তিনি প্রথম অনশনে বসেন ১১.৯.১৯১৫ তারিখে। একবেলার জন্য। তারপর ২০.৯.১৯৩২ থেকে ছয়দিনের জন্য এবং ৭.৮.১৯৩৪ থেকে সাতদিনের জন্য। অর্থাৎ তিনটি পর্যায়ে মোট চোদ্দ দিন অনশন করেছেন তিনি এই ব্যাপারে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির লক্ষে ১৯.৪.১৯২১ থেকে তিনদিনের জন্য এবং ১৭.৯.১৯২৪ থেকে একুশ দিনের অনশন করেন তিনি। এছাড়া ৫.৫.১৯৪১ তারিখ থেকে তিনদিনের জন্য অনশনও পালন করেন বোম্বে এবং আমেদাবাদের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের বিরুদ্ধে। ২৯.৬.১৯৪১-এ একদিনের জন্য, ১.৯.১৯৪৭-এ তিনদিনের জন্য (যদিও ঘোষিত পরিকল্পনা ছিল আমৃত্যু অনশন) — এই অনশনগুলিকে এই পর্বে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সব মিলিয়ে এই পর্যায়ে পাঁচবারে মোট একত্রিশ দিন অনশন করেন তিনি।

সামাজিক ও অরাজনৈতিক কারণে অনশন করেছেন ১৫.৩.১৯১৮ তারিখে একদিনের জন্য (আমেদাবাদের মিল শ্রমিকদের বেতনবৃদ্ধির দাবিতে), ৬.৪.১৯১৯ তারিখে সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রথম শুরু করার স্মারক হিসেবে একদিনের জন্য, ৩.৩.১৯৩৯ থেকে চার দিনের জন্য, ২০.১০.১৯৪৬ তারিখে একদিনের জন্য এবং ১১.১০.১৯৪৭-এ একদিনের জন্য। অর্থাৎ সর্বমোট পাঁচটি পর্যায়ে আট দিন অনশন করেছেন তিনি এই পর্বে।

রাজনৈতিক দাবিদাওয়া, যার বেশিরভাগ থাকত সংগঠনের অন্দরের ব্যাপার নিয়ে, সেইসব বিষয় নিয়ে অনশন তিনি প্রথম করেন চৌরাচৌরির ঘটনায় সত্যাগ্রহীদের হিংসার পথ নেওয়ার প্রতিবাদে। ১২.২.১৯২২ থেকে শুরু করে পাঁচদিন তিনি অনশন করেন এইজন্য। এছাড়া ১৫.৮.১৯৪৭-এ অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতা লাভের দিন দেশভাগের কারণে দুঃখ জানাবার জন্য তিনি একদিনের অনশনে বসেন। ১৩.১.১৯৪৮ থেকে শুরু করা তাঁর ছয়দিনের অনশনটি ছিল তাঁর জীবনের শেষ অনশন। সুতরাং এই পর্যায়ে মোট তিনটি বার তিনি অনশন করেছেন বারো দিনের জন্য।

আর সর্বশেষে সরকারের বিরুদ্ধে করা তাঁর অনশনগুলির কথা বলি। ১৩.৪.১৯১৯ তারিখে জালিওয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে তিনদিনের জন্য অনশন করেন তিনি, এমনটি বহু গান্ধী শিষ্যের মত। এব্যাপারে একটা বড় 'কিন্তু' আছে। এবিষয়ে একটু পরে আলোকপাত করা যাবে। এর পরে ২৮.১১.১৯২১ তারিখে একদিনের জন্য অনশন করেন। এই সঙ্গে ঠিক করেন

যে, এরপর থেকে প্রতি সপ্তাহের সোমবারে তিনি অনশনে থাকবেন। এরপর ১০.৩.১৯৪৩-এ তাঁর অনশন শুরু হয় ভারত ছাড় আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে। ভারত ছাড় অথবা কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট ব্যর্থ হওয়ার পর যখন সরকার বাহাদুর আন্দোলনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত সরকারি সম্পত্তি নষ্ট হওয়ার দায় চাপালেন কংগ্রেসের তথা গান্ধীর ঘাড়ে, তখন প্রতিবাদ জানাবার জন্য গান্ধী অনশনে বসেন। এই পর্বে তার মানে মোট তিনটি পর্যায়ে পাঁচ দিন অনশন চালান তিনি।

অর্থাৎ পর্যায়গত বিচারে গান্ধীর অনশনের ছবিটা ছিল এরকম —

(এক) আশ্রমিকদের সৎপথে নিয়ে আসার জন্য	৬ বার,	৩৪ দিন
(দুই) আত্মশুদ্ধির জন্য	৪ বার,	৩০ দিন
(তিন) হরিজনদের সপক্ষে ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য	৩ বার,	১৪ দিন
(চার) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির লক্ষ্যে	৫ বার,	৩১ দিন
(পাঁচ) সামাজিক ও বাহ্যত অরাজনৈতিক কারণে	৫ বার,	৮ দিন
(ছয়) রাজনৈতিক দাবি দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে	৩ বার,	১২ দিন
(সাত) ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে	৩ বার,	৫ দিন
সর্বমোট	২৯ বার,	১৩৪ দিন।

উপরে দেওয়া অনশনের এই কারণগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব গান্ধী কোন্ বিষয়গুলিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। দেখা যাচ্ছে, সব চেয়ে বেশিদিন তিনি অনশন করেছেন আশ্রমিকদের সুপথে ফিরিয়ে আনার বিষয়টির জন্য। ছয়টি পর্যায়ে মোট চৌত্রিশ দিন। এরপর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির লক্ষ্যে। মোট একত্রিশ দিন। তারপর আত্মশুদ্ধির বিষয়, মোট ত্রিশ দিন অনশন করেছেন। হরিজনদের উন্নতির স্থান তার পরে, মোট চোদ্দ দিন। রাজনৈতিক দাবি আদায়ের জন্য বারো দিন। সামাজিক ও অরাজনৈতিক কারণে আটদিন এবং সবচেয়ে কম ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অনশন। মাত্র পাঁচ দিন।

অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কিংবা সরকারের দমনমূলক নীতির বিরুদ্ধে অনশন করেছেন তিনি সবচেয়ে কম। অথচ, অনাহারে থেকে সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথাই বেশি প্রচারিত। বোঝা মুশকিল নয় যে, গান্ধী নামক মিথকে আরও গগনস্পর্শী করার জন্য এই পরিকল্পনা। অথচ পর্যায়ের এবং দিনের সংখ্যার হিসাব দেখলে দেখা যাবে, দেশের আপামর জনতার সঙ্গে যেসব ঘটনার সম্পর্ক নেই, সেই আশ্রমিকদের চরিত্রস্খলন নিয়ে সবচেয়ে বেশি চৌত্রিশ দিন অনশন করেছেন তিনি। দ্বিতীয় স্থানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য অনশন। মোট

একত্রিশ দিন। তৃতীয় স্থান আত্মশুদ্ধির জন্য — ত্রিশ দিন। চতুর্থ স্থানে হরিজনদের বিষয় নিয়ে মোট চোদ্দদিন। পঞ্চম স্থানে রাজনৈতিক কারণ — বারো দিন। ষষ্ঠ স্থানে অরাজনৈতিক কারণের জন্য — মোট আট দিন এবং সর্বশেষ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে, মাত্র পাঁচদিন।

এদের মধ্যে অন্য পর্যায়গুলিকে অর্থাৎ আশ্রমিকদের মন্দ কাজ থেকে বিরত করা, নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ (purification) করা, বিবিধ কারণের জন্য করা অনশন এবং হরিজনদের প্রতি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য গৃহীত অনশন কার্যক্রমগুলিকে বাদ দিয়ে তাঁর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিরক্ষার জন্য, রাজনৈতিক দাবিদাওয়া পূরণ করার জন্য ও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে করা অনশনগুলিকে বিচার করে দেখা যায় যে, প্রতিটি ব্যাপারে তিনি অনশনকে ব্যবহার করেছেন চাপ সৃষ্টির কৌশল হিসেবে। অনশনে বসে এই কথাটাই তিনি বলেছেন — হয় আমার দাবি মানো, নইলে আমার জীবনের আশা ছাড়ো।

প্রথমে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের বিরুদ্ধে গান্ধীর অনশনের কথা ধরা যাক। ভারতের বেশিরভাগ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে হয়ে থাকে। যদিও, বিক্ষিপ্তভাবে এই সংঘর্ষ কখনও কখনও হয়েছে খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেও। বোম্বেতে মুসলমান ও পারসিদের মধ্যে বহুবার দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৮৫৭ সালের দাঙ্গায় বেশ কয়েকজন পারসি সম্প্রদায়ের মানুষ নিহত হয়। কিন্তু ১৯২৪ সালে এমন বিরাট কোনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভারতে হয়নি যে, দীর্ঘ একুশ দিন গান্ধীকে অনশনে বসার দরকার হয়েছিল তার জন্য। কী ঘটেছিল ১৯২৪-এ?

এই উত্তর খুঁজতে গেলে যেতে হবে ১৯২১ সালের মোপলা বিদ্রোহে। এদেশের অনেক সেকুলার ইতিহাসবিদ মোপলাদের বিদ্রোহী কর্মকাণ্ডকে অত্যাচারিত মোপলাদের শৃঙ্খলমুক্তির সংগ্রাম বলে ঘোষণা করে দিয়েছেন বটে, কিন্তু শুরুতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াইটা থাকলেও পরে এটা হয়েছিল হিন্দুদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় যুদ্ধ। ইতিহাসে মুসলমান সম্প্রসারণবাদের যতগুলি লক্ষণ পৃথিবীর সর্বত্র দেখা যায়, তার সবগুলি ছিল মোপলাদের তথাকথিত শৃঙ্খলমুক্তির সংগ্রামে। হিন্দু বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, হিন্দুদের সম্পত্তি দখল করা, হিন্দুদের নির্বিচারে হত্যা করা, জোর করে ধর্মান্তরগ্রহণে বাধ্য করা, হিন্দু রমণীদের গণ-বলাৎকার করা, হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা — এই সবই ছিল মোপলাদের আক্রমণের ট্রেড মার্ক। খিলাফত আন্দোলন — যা গান্ধী প্রবলভাবে সমর্থন করেছিলেন এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে বাধ্য করেছিলেন সর্বশক্তি দিয়ে সমর্থন করার জন্য

— সেই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল কেরালার মালাবার অঞ্চলের এই স্থানগুলিতে। কিন্তু ১৯২১ সালে খিলাফত আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর ব্রিটিশ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে শুরু করে। ব্রিটিশের এই দমনমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মোপলারা বিদ্রোহ শুরু করে। তাদের সামনে ব্রিটিশ প্রশাসনকে সাময়িকভাবে পিছু হঠতে হয়। মোপলারা পুলিশ ফাঁড়ি, সরকারি বিভিন্ন দফতর, আদালত এবং সরকারের কোষাগার (treasury) দখল করে নেয়। তারপর সামনে থেকে ব্রিটিশ চলে যেতে আক্রমণের লক্ষবস্তু করে তোলে হিন্দুদের। তৎকালীন সরকারি সূত্র মতে দশ হাজারেরও বেশি হিন্দু নিহত হয়েছিল সেই সময়, এক লক্ষের বেশি হিন্দু ঘর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। দক্ষিণ মালাবার অঞ্চল, যা তৎকালীন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ছিল, সেখানকার ৫২০০ বর্গ কিলোমিটারব্যপী এলাকা মোপলা মুসলমানদের দখলে চলে যায় ও আক্ষরিক অর্থে হিন্দুশূন্য হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে — এভাবে হিন্দুশূন্য হওয়ার ফলে এই এলাকা সম্পূর্ণভাবে মুসলমান অধ্যুষিত হয়ে পড়ে এবং এই কারণে পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতে এই অঞ্চলে ধর্মভিত্তিক জেলা গঠন করে নাম দেওয়া হয় মোল্লাপুরম। সৌজন্যে ভারতের কম্যুনিস্টরা। তারা আরও একটি মহান কাজ করে — যে মোপলা মুসলমানরা একদা হিন্দুদের কচুকাটা করে চূড়ান্ত নৃশংস সাম্প্রদায়িকতার নজির রেখেছিল — তাদেরকে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা-যোদ্ধা হিসেবেও ঘোষণা করে কম্যুনিস্ট সরকার।

মোপলাদের এই বিদ্রোহের ভয়ঙ্করতার আঁচ পাওয়া যায় কংগ্রেসের একদা সভানেত্রী অ্যানি বেসান্তের লেখায় — 'They (Moplahs) murdered and plundered abundantly and killed or drove away all Hindus who would not apostatise... Malabar has taught us what Islamic rule still means, and we do not want to see another specimen of the Khilafat Raj in India.' (*The Future of Indian Politics: A Contribution to the Understanding of Present Day Problems* — Annie Besant)। এই ভয়ানক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের জন্য শুধু কংগ্রেস নয়, এক বিরাট সংখ্যক দেশবাসী দায়ী করেছিল গান্ধীকে। তাঁদের বক্তব্য ছিল — ভারতে খিলাফত আন্দোলনকে এনেছিলেন গান্ধী, সমর্থন করেছিলেন গান্ধী, মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার আগুনকে বাড়িয়েছিলেন গান্ধী। স্যার শংকরণ নায়ার এই কারণে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় গান্ধীকে তাঁর খিলাফত আন্দোলনের সমর্থনের জন্য শুধু সমালোচনা করে ক্ষান্ত হননি, গান্ধীকে তিনি 'নৈরাজ্যবাদী' (Anarchist) আখ্যাও দিয়েছিলেন। বলা প্রয়োজন, মোপলাদের এই হিন্দু নিধনের বিরুদ্ধে একটি শব্দও

গান্ধী লেখেন নি, একবারের জন্যও অনশনের কথা ভাবেন নি।

খিলাফত আন্দোলনে গান্ধীর সমর্থন এবং মোপলাদের হিন্দু নিধন যজ্ঞে গান্ধীর পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চুপ থাকাটাকে বহু মানুষ স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিতে পারেন নি। তাঁরা প্রত্যক্ষভাবেই গান্ধীর সমালোচনা করতে শুরু করলেন। এই পরিস্থিতিতে ১৯২৪ সালে আবার এক ধর্মীয় সংঘর্ষ শুরু হল তৎকালীন অবিভক্ত ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের (North-West Frontier Province) কোহট শহরে। ৯ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর — এই তিনদিনে মুসলমানদের হাতে ১৫৫ জন হিন্দু ও শিখ নিহত হয়। পুরো হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায় তাদের ঘর ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। বলা বাহুল্য, মোপলা আক্রমণের তুলনায় এই আক্রমণ ভয়ঙ্করতা ও ক্ষতির দিক দিয়ে কিছুই নয়। তবু সেবার গান্ধী অনশনের নাম উচ্চারণ না করলেও এবার করলেন। তা-ও গোলমাল থেমে যাওয়ার এক সপ্তাহ পর। স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন ওঠে, কেন এবার তিনি নামলেন অনশনে? এর কারণ সম্ভবত সম্প্রীতির লক্ষের চেয়ে তাঁর বড় লক্ষ ছিল ব্রিটিশ শাস্তির হাত থেকে কোহট দাঙ্গায় অভিযুক্ত মুসলমানদের বাঁচানো। কেননা, তাঁর সামনে মোপালা বিদ্রোহের পরিণতি এবং ব্রিটিশের হাতে দাঙ্গাকারীদের শাস্তির ব্যাপারটা টাটকা ছিল। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, এই ১৯২৪ সালের পয়লা মে তারিখে অনাহারক্লিষ্ট মোপলা ভাইদের সাহায্য করার জন্য হিন্দুদের কাছে আবেদন জানালেন গান্ধী। বলা বাহুল্য, তাঁর আবেদনে কর্ণপাত করেনি কেউ। মানুষের স্মৃতিতে মোপলাদের অত্যাচারের স্মৃতি তখনও টাটকা। ইতিমধ্যে ১৯২৩ সালে নাগপুরে লক্ষ্মীপূজার মিছিল নিয়ে দুই সম্প্রদায়ে দাঙ্গা বেধেছে। সেই দাঙ্গায় হিন্দুরা পরাজিত প্রতিপক্ষ ছিল না, বরং নাগপুরে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় মুসলমানরাই। ১৯২৩ সালে হিন্দুদের সেই প্রতিরোধে নেতৃত্ব দিয়েছিল হিন্দু মহাসভা। ১৯২৩-২৪ সালে ভারতের বহু শহরে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শুরু হয়। বোম্বে, দিল্লি, লাহোর, ভাগলপুর, আজমগড় ছাড়া আরও বহু শহরে দাঙ্গা শুরু হয় এবং লক্ষণীয় হল, এইসব জায়গাতে দাঙ্গা একতরফা হল না। হিন্দুরা প্রতিরোধ গড়ে তুলল। এই ব্যাপারটি গান্ধীকে ভাবিয়ে তুলল এবং তিনি সম্প্রীতির আহ্বান জানিয়ে অনশনে বসলেন। যদিও, তাঁর অনশনে কাজের কাজ কিছু হয়নি ও পরবর্তী বেশ কয়েকটি বছর দেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি রীতিমত গরম ছিল। গান্ধী বুঝলেন, অনশনের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান হবে না। কেননা, মুসলমানদের রাজনৈতিক মঞ্চ মুসলিম লীগ ততদিনে তার ভিত শক্ত করে ফেলেছে মুসলমানদের মধ্যে, আর হিন্দুরাও একতরফা মার

খেয়ে যেতে আর রাজি নয়। অতএব গান্ধীকে অনশন তুলতে হল।

পরবর্তী প্রায় ষোল বছর তিনি সম্প্রীতি রক্ষার নাম নিয়ে কোনও অনশনে আর নামেননি। যদিও হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা দিনকে দিন বাড়ছিল। এরপর সম্প্রীতি রক্ষায় একদিনের অনশন তিনি পালন করেন ২৯.৬.৪১ সালে। তার পরেরটি ১.৯.৪৭ তারিখে। এটি ছিল তিন দিন। মনে রাখতে হবে, দেশ তখন দুভাগ হয়েছে এবং সেই দ্বিখণ্ডিত দেশ স্বাধীনতা পেয়েছে। দেশভাগের পরিণামে কয়েক কোটি মানুষ গৃহচ্যুত হয়েছে, কয়েক লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছে। মানবতার যে ভয়ঙ্কর অবমাননা হয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। গান্ধী রীতিমত বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন। তাঁর কাছে অত্যাচারের খবর যে আসত না, তা নয়। তিনি জানতেন পাকিস্থানে হিন্দুদের কী অপরিসীম যন্ত্রণার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। এর আগে ১৯৪৬ সালে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং নামে কুখ্যাত গণহত্যার খবরও তিনি রাখতেন। সে বছরের নোয়াখালি দাঙ্গার খবরও তিনি জানতেন শুধু নয়, তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। তিনি গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু দাঙ্গা থেমে যাওয়ার পর। কয়েকটা মাস সেখানে ছিলেন। আশা করা গিয়েছিল, এই সময়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য তিনি অনশনে বসবেন। কিন্তু তা তিনি বসেন নি। তিনি অনশন করতে বসলেন দেশভাগের পর। সেখানেও এক আশ্চর্য কাণ্ড! বসলেন আমৃত্যু অনশনে (Fast unto Death); কিন্তু উঠে পড়লেন তিন দিনের মধ্যে। ইতিহাস বলবে, তাঁর অনশনে পাকিস্তানের মুসলমানদের হৃদয়ের পরিবর্তন হয়নি। তবে অবশ্যই ভারতের মুসলমানদের উপকার হয়েছিল। তারা পাকিস্তানে চলে না গিয়ে ভারতে থেকে যাওয়া সাব্যস্ত করেছিল। গান্ধী তাঁদের উদ্দেশে আবেদন দিয়েই রেখেছিলেন — মুসলমানরা চাইলে ভারতে থেকে যাবে। সরকার তাদের সমস্ত সুরক্ষা দেবে। নতুন ভারতের নতুন সরকারও মুসলমানদের প্রতি দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতি পালনে তৎপর ছিল। অতএব তিনদিন পরে অনশন প্রত্যাহার করায় গান্ধীর অভীষ্ট পূর্ণ হয়েছিল। আসলে, হিন্দুর সুরক্ষা চিন্তা তাঁর কাছে কখনোই প্রধান ছিল না, ছিল মুসলমানের সুরক্ষাচিন্তা। আর এই সুরক্ষার জন্যই ১৯৪৮ সালের ১৩ জানুয়ারি থেকে আবার তিনি অনশনে বসেন। এবার তাঁর দাবি ছিল — এক, পাকিস্তানকে দেশবিভাগের কারণে ক্ষতিপূরণ হিসেবে পঞ্চান্ন কোটি টাকা দিতে হবে; দুই, দিল্লির মেহরৌলি মসজিদ থেকে উদ্বাস্তু হিন্দুদের হঠিয়ে দিতে হবে; তিন, দিল্লি থেকে যেসব মুসলমান অন্যত্র চলে গেছে তাদের ফিরিয়ে আনতে হবে ও তাদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে হবে; এবং চার, মুসলমান সহ সব সম্প্রদায়ের মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

একটু লক্ষ করলেই পাঠক, আপনি বুঝতে পারবেন যে, চতুর্থ দাবিটি করার দরকার ছিল না, তবু করা হয়েছিল দাবিগুলিকে একটি ধর্মনিরপেক্ষতার খোলস পরাবার জন্য। বলা বাহুল্য, ভারত সরকার ছয়দিনের মাথায় এই সবগুলি দাবি মেনে নেয় এবং পাকিস্তানকে ওই পরিমাণ টাকাও দিয়ে দেয়।

এই চতুর্থ অনশন ছিল গান্ধীর মৃত্যুর কারণ এবং তাঁর হত্যাকারী নাথুরাম গড্‌সে তাঁর জবানবন্দিতে বলেছিলেন সে কথা যে, গান্ধীর এই হিন্দুবিরোধী ও ব্ল্যাকমেলের রাজনীতি অসহ্য হয়ে উঠেছিল তাঁর কাছে।

রাজনৈতিক দাবিদাওয়া পূরণের জন্য অনশনে বসাও তাঁর বড় চাল ছিল। এখানেও সেই ব্ল্যাকমেলের রাজনীতি। অবশ্য কোথাও কোথাও মুখরক্ষার ব্যাপারও ছিল। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ঘটার পর তিনি আদৌ অনাহারে বসে ছিলেন কিনা এ সম্পর্কে খোঁজ খবর করতে গিয়ে একটা অদ্ভুত ব্যাপার নজরে এল। একটু আগে গান্ধীর অনশনের যে তালিকা দিয়েছি, সেটা গান্ধীর সরকারি সাইট থেকে উদ্ধৃত করেছি। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ১৩ এপ্রিল ১৯১৯ তারিখে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি একদিনের জন্য অনশনে বসেন। তারিখটা অদ্ভুত লাগল দুটি কারণে। এক, ওইদিনেই ঘটেছিল সেই হত্যাকাণ্ড। আর দ্বিতীয় কারণ, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড যাতে প্রকাশ না পায় তার জন্য ইংরেজ সরকার এই খবরকে ব্ল্যাক আউট করেছিল। গান্ধী জীবনীতে পড়েছি, ঘটনা ঘটার বেশ কয়েক সপ্তাহ পর এই খবর পান তিনি। তাই যদি হয়, তাহলে ঘটনা ঘটার দিনই তিনি অনশন শুরু করলেন কীভাবে? বুঝতে পারলাম, গান্ধী চরিত্রের দোষত্রুটি ঢাকার জন্য তাঁর ভক্তদের এটা একটা নির্লজ্জ ও আপাদমস্তক মিথ্যা একটি প্রয়াস। আসলে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কিংবা ব্রিটিশের বিবেক জাগ্রত করার জন্য তিনি কোনও অনশনই করেননি। খবরটা পাওয়ার পর তিনি যা করেছিলেন — সেটা তাঁর মহাত্মা নামটির প্রতি সুবিচার তো করেই না, বরং তাঁর চরিত্রের একটা ঘৃণ্যদিককে বড় দৃষ্টিকটুভাবে ফুটিয়ে তোলে। খবর পাওয়ার পর তিনি ব্রিটিশ রাজ এবং সেদিন যারা ওই ময়দানে উপস্থিত হয়েছিল ও ওই ঘটনার পর যারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ে কিছু হিংসাশ্রয়ী কাজ করেছিল — এই দুটি পক্ষকেই সমান অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করেছিলেন এবং উভয়কে এক জায়গায় রেখে, এক ভাষায় নিন্দা করেছিলেন। আরও একটি স্মরণযোগ্য ঘটনা হল, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছিল যার নির্দেশে সেই জেনারেল ও ডায়ারকে ১৯৪০ সালে যে যুবক হত্যা করেছিল লণ্ডনে, সেই উধম সিংকে

খুনি-ডাকাত বলতেও দ্বিধা করেননি গান্ধী ও তাঁর মানসপুত্র জবাহরলাল নেহরু। গান্ধীর এই উক্তি সেদিন স্তম্ভিত করেছিল ভারতবাসীকে। উধম সিংকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয় সেই বছরেই। তাঁর প্রাণরক্ষার আবেদন করা তো দূরের কথা, উধম সিং সম্পর্কে এই অবিশ্বাস্য কুৎসিত ভাষাটি প্রয়োগ করেছিলেন গান্ধী তাঁর প্রাণদণ্ডের খবর পাওয়ার পরেই। ১৯৪০-এর পর ১৯৫২। ১২ বছর পর নেহরু তাঁর ভুল শুধরে নিয়ে উধম সিংকে 'অমর শহীদ' বলেছিলেন বটে, তবে ভুল স্বীকারের সুযোগ গান্ধী পাননি। তিনি ততদিনে পরপারে চলে গেছেন। তবে বেঁচে থাকলেও ভুল স্বীকার করতেন কিনা সন্দেহ। কারণ, ভুল স্বীকার করাটা এই মানুষটির অভিধানে কোনওদিন ছিল না।

অতএব জালিয়ানওয়ালাবাগের অনশনটি বাদ গেল। এই তিনদিন বাদ গেলে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই-এর জন্য অনশন বলতে থাকে মাত্র দুদিনের। যার একটি হল ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসের দশ তারিখের অনশনটি। সেখানে অনশনের পিছনে কারণটি ছিল — 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সময়ে দেশ জুড়ে যে সব গণ্ডগোল হয়েছিল, তার দায়ভাগ গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের ওপর সরকার চাপিয়ে দেওয়ায়, তার বিরুদ্ধে। অর্থাৎ, নিজের ওপর থেকে দোষ স্খালনের চেষ্টায়। বলা ভাল, কংগ্রেস কিন্তু এই আন্দোলনে নিজেকে জড়াতে চায়নি, গান্ধীর জেদাজেদির জন্যই এই আন্দোলনকে কংগ্রেস সমর্থন করতে বাধ্য হয়। ফলে ভারত ছাড় আন্দোলনের ব্যর্থতার দায় প্রাথমিকভাবে গান্ধীর একার ওপরেই বর্তায়। এই পরিপ্রেক্ষিতটাকে দেখে পাঠক, আপনি বিচার করুন, গান্ধীর অনশনে আদৌ কি ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ কোনওভাবে উপকৃত হয়েছিল?

চৌরিচৌরার সত্যাগ্রহ যখন পুলিশের আক্রমণের জবাবে কিছুটা হিংসাশ্রয়ী হয়ে উঠল, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে সত্যাগ্রহ তুলে নিলেন। কেননা, তিনি হিংসার পক্ষপাতী নন এবং তাঁর এই আন্দোলন হঠাৎ তুলে নেওয়ার ফলে ব্রিটিশ তাদের দমনমূলক কাজকর্ম তথা প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্যবস্থা বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ পেল। ১৭২ জন সত্যাগ্রহীকে গ্রেফ্তার করে ফাঁসিকাঠে ঝোলাল সরকার। চৌরিচৌরার ঘটনা নিয়ে আজও এদেশে সত্যিকারের কোনও বিশ্লেষণ হল না। গান্ধীর সমালোচকরা তাঁর আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে বিশাল ভুল বলে মনে করেন। তাঁরা বলেন, আন্দোলন যদি চালিয়ে যাওয়া হত, তবে স্বাধীনতা বেশি দূরে ছিল না— 'Swaraj was only one inch away'।

আর গান্ধী? তিনি নিজেও কম বিভ্রান্ত ছিলেন না। ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকার ১৬ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ The Crime of Chauri Chaura-তে সত্যাগ্রহীদের সম্পর্কে এমন কুমন্তব্য করা হয়েছিল যা বিপুল সমালোচনার

মুখে পড়েছিল।

এই হল গান্ধীর আদর্শবাদী অনশনের আসল চেহারা। প্রচুর ঢক্কানিনাদ সহযোগে যাকে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে গৌরবগাথায় মুড়ে দেওয়া হল, দেখা যাচ্ছে, আসলে সেটি গান্ধী-মিথ তৈরির একটা উপাদান ছাড়া কিছু নয়। আরও পরিষ্কার করে বললে গান্ধীর খামখেয়ালি মানসিকতার প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়।

আর একটা কথা। গান্ধীর ব্ল্যাকমেলের কাছে কংগ্রেস দল ও ভারতের জনগণ মাথা নোয়ালেও ব্রিটিশ কিন্তু মাথা নোয়ানো তো দূরের কথা বরং তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করত এই অনশনের সার্কাস। সেটা ১৯৪৩ সাল। চার্চিল ছিলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী। গান্ধী অনশনে বসেছেন, একদিনের অনশন। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে। চার্চিল মজা করে বলেছিলেন — "লোকটা লুকিয়ে লুকিয়ে নিশ্চয় কিছু খায়। কেন যে ওর অনশন ভাঙানোর চেষ্টা করে সবাই! ওকে মরতে দেওয়াই উচিত।" প্রসঙ্গত, এই চার্চিলই গান্ধী সম্পর্কে তার আগে বলেছিলেন — "এই অর্দ্ধ-উলঙ্গ ফকিরটি (half-naked fakir) বড় ধূর্ত। ভারতবাসীকে বোকা বানাবার জন্য সাহেবি পোষাক ছেড়ে এই পোষাক পরেছে?" বলা বাহুল্য, চার্চিলের এই ব্যাঙ্গোক্তি গান্ধী সম্পর্কে মানুষকে বিতৃষ্ণ তো করেই নি, বরং গান্ধীকে আরও জনপ্রিয় করে তুলেছিল।

পরিশেষে এই কথা বলা যায়, অনশন নামক এই ব্ল্যাকমেলের রাজনীতির কাছে ভারতের মানুষ বিভিন্ন সময়ে আত্মসমর্পণ করেছে অবশ্যই, কিন্তু ব্রিটিশ সিংহ তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছে। গান্ধীর অনশনের রাজনীতিতে দেশের উপকার এক বিন্দুও হয়নি, তা শুধু গান্ধীর মিথকে আকাশচুম্বী করেছে। সেই মিথ এখন ভেঙে পড়েছে তাসের ঘরের মত।

বন্দে মাতরম্ গীত ও গান্ধী

১৮৭৫ সালের এক ছুটির দিনে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ট্রেনে চেপে তাঁর পৈত্রিক বাড়ি কাঁঠালপাড়ায় যাচ্ছিলেন। ট্রেন পথের দুপাশে বিস্তৃত শ্যামল সবুজ শস্যক্ষেত্র দেখে মুগ্ধ হন তিনি। তাঁর কল্পনায় ধরা পড়ে দেশমাতৃকার রূপ। তখন এই গান লেখেন। তারপর ১৮৮২ সালে তিনি আনন্দমঠ উপন্যাস লেখেন। এই উপন্যাসে সন্ন্যাসী ভবানন্দের কণ্ঠে প্রথম গীত হয় বন্দে মাতরম্ বা মায়ের বন্দনা গান। কোন্ মা? এই প্রশ্নের উত্তরে ভবানন্দ উত্তর দিয়েছেন — 'আমরা অন্য মা মানি না — জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই

জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই — স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা মলয়জসমীরণ শীতলা, শস্যশ্যামলা—'

আনন্দমঠ উপন্যাসের এই গীত ব্রিটিশ নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্য যারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সেই বীর বিপ্লবীদের কাছে বেদমন্ত্র হয়ে উঠেছিল। ক্ষুদিরাম বসু থেকে ভগৎ সিং, রাজগুরু এবং হাজার হাজার বিপ্লবী বীর বন্দে মাতরম্ উচ্চারণ করতে করতে ফাঁসিকাঠে ঝুলেছেন। ১৮৯৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গীতে সুরারোপ করেন এবং সেই বছরের ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে এটি গান হিসেবে প্রথম গাওয়া হয়। প্রাক্-স্বাধীনতা সময়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সমস্ত অধিবেশনে বন্দে মাতরম্ গীত হয়েছে। 'বন্দে মাতরম্' এই ছোট্ট কিন্তু মহান শব্দবন্ধটি বিপ্লবীদের কাছে ছিল প্রেরণা আর ব্রিটিশের কাছে ছিল আতঙ্ক। সে আতঙ্ক এমন ছিল যে, এই কথাটি শুনলেই বিপ্লবীদের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হত তারা এবং দমনপীড়ন শুরু করত। কংগ্রেসি রাজনীতির সেই যুগে অহিংসার পথে চলতেন যারা, তারাও পরস্পরের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করতেন 'বন্দে মাতরম্' এই শব্দটি উচ্চারণের দ্বারা। প্রাক্-স্বাধীনতা সময়কালে আক্ষরিক অর্থে বন্দে মাতরম্ আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পেয়েছিল।

তবু বন্দে মাতরম্ ভারতের জাতীয় সঙ্গীত (National Anthem) হতে পারল না, কেবলমাত্র জাতীয় গান (National Song) হিসেবে থেকে গেল এবং অনেক পরে রচিত হলেও (১৯১৯ সাল), উৎসের বিচারে অনেক ধোঁয়াশাতে আচ্ছন্ন হলেও (রাজা পঞ্চম জর্জ এবং ইংলন্ডের রাণীর ভারত সফর উপলক্ষে রচিত ও গীত) এবং কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্গত প্রদেশগুলির উল্লেখ এই গানের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও (দেশীয় রাজাদের অধীনে থাকা কাশ্মীর, রাজস্থান ইত্যাদি প্রদেশের উল্লেখ নেই) 'জনগণমন অধিনায়ক' আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পেল। আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গ 'জনগণমন অধিনায়ক' নিয়ে নয়, আলোচনা করছি 'বন্দে মাতরম্' গীতটিকে নিয়ে। যে 'বন্দে মাতরম্' গানে এমন বিপুল ঐতিহ্য, এমন প্রবল দেশভক্তি আছে, যে গান মাতৃভূমির বন্দনার সঙ্গে একান্তভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সেই গানটিকে বাদ দেওয়া হল কেন জাতীয় সঙ্গীতের মনোনয়ন থেকে? কার বা কাদের পরামর্শে বাদ দেওয়া হল?

এব্যাপারে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর আপত্তির কথাই সবচেয়ে বেশি শোনা যায়। বাদ্যযন্ত্রে (Band) নাকি এই গান ভালভাবে

বাজানো যায় না — এই যুক্তি দেখিয়ে ছাঁটাই করা হয় বন্দে মাতরম্‌কে। কিন্তু আসল কারণ কি সেটাই? কেননা, দেখা গেছে, দক্ষ ব্যাণ্ডশিল্পীরা বন্দে মাতরম্‌কে ভালভাবেই বাজিয়ে যেতে পারেন এবং এখনও তা বাজিয়ে যাচ্ছেন।

অতএব আসল কারণ তা নয়। আসল কারণ অন্যত্র। আমরা সেই কারণকে দেখব এখন এবং এটাও দেখাব যে, এর পিছনে গান্ধীর কোনও ভূমিকা আছে কি না।

১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারত প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে — এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি মনোনয়ন করার কথাও ছিল সেদিন। তার আগে 'জাতীয় সঙ্গীত' নির্বাচন করার দরকার ছিল। এই সম্পর্কে আলোচনা যখন শুরু হল, তখন একটি আপত্তিই প্রত্যক্ষ ভাবে ওঠানো হয়েছিল, তা হল, জনগণমন গানটি যেমন ব্যাণ্ডে চমৎকার ভাবে বাজানো যায়, বন্দে মাতরম্ তা বাজানো যায় না। কিন্তু প্রখ্যাত যন্ত্রশিল্পী মাস্টার কৃষ্ণ রাও দূর করলেন সেই সমস্যা। তিনি Constituent Assembly-র সদস্যদের সামনে বাজিয়ে শোনালেন বন্দে মাতরম্ গান। ফলে আশা করা গিয়েছিল যে, বন্দে মাতরম্‌ই হবে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। এই আশা জোরালো হয়েছিল আরও একটা কারণে। তখনও পর্যন্ত গান্ধী তাঁর প্রতিটি সভায় বন্দে মাতরম্ অতি আবশ্যিকভাবে গাইতেন। ২৯ আগষ্ট ১৯৪৭ তারিখে এরকমই একটি সভায় বন্দে মাতরম্ গাওয়ার পর তিনি বলেছিলেন — 'Vande Mataram should be set to music so that millions can sing it together and fill the thrill. They should all sing in the same raga, with the same bhava. Shantiniketan or some other competent institution should design an acceptable raga.'। গান্ধীর এই ইচ্ছাকে মাথায়রেখে মাস্টার কৃষ্ণ রাও নিজেকে তৈরি করেছিলেন। গান্ধীর এই ইচ্ছাপ্রকাশ ছাড়া পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধান চন্দ্র রায়ও কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন যাতে বন্দে মাতরম্‌কে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তা যে হয়নি, বলা বাহুল্য, তা আমাদের কারও অজানা নয়। কিন্তু কেন এমনটা হল? এই বিষয়ে আচার্য জে.বি. কৃপালনী যা বলেছেন, সেটা বলা খুব প্রয়োজন। তিনি বলেছেন — 'It is, therefore, strange that after independence instead of this anthem (Vande Mataram), the present one, Janaganamana by our great poet Rabindranath Tagore, suddenly came to be recognised as our National Anthem. The adoption of a national song was never considered as it ought to have been by the Constitute Assembly.

It was only announced by Rajendra Babu, the first President of our Republic. National Anthems are not adopted by the nation like that. They are to be recognised by the people. Even as it is, only the first two paragraphs of Vande Mataram are sung. The rest of it is omitted, the reason obvioulsy being that the Muslims objected to the mention of the Indian Goddesses in the song though every Goddess is the personification of some divine virtues and all this is explained in the song itself. Even now it will be desirable to have Vande Mataram as the National Anthem along with Janaganamana.'

এখানেই বোঝা গেল বন্দে মাতরম্‌কে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে নির্বাচন না করার কারণ 'ব্যাণ্ডে বাজানো যায় না' — অবশ্যই নয়। আসল কারণ এই গানে মাতৃভূমির বন্দনা করা হয়েছে এবং সেই কারণে মুসলমানদের ধর্মীয় ভাবাবেগ আহত হতে পারে, এইজন্যেই বন্দে মাতরম্ মনোনীত হয়নি। এই পুরো সিদ্ধান্তটা চুপিসাড়ে গ্রহণ করা হয়েছিল। Constituent Assembly-র সদস্যদের মধ্যে আলোচনাই হয়নি। পণ্ডিত নেহরু ছিলেন পুরো কর্মকাণ্ডের নেপথ্য কারিগর। ভারতীয় প্রজাতন্ত্র গঠনের দিন প্রথম যে সিদ্ধান্তটি এতদ্বারা ঘোষিত হল, তা অবশ্যই ধর্মনিরপেক্ষতার নামে, কিন্তু আসলে এই কাজের দ্বারা ধর্মীয় তুষ্টিকরণকেই মান্যতা দেওয়া হল। বলা বাহুল্য, তার ঠিক দুবছর আগে গান্ধী নিহত হয়েছেন, সুতরাং নেহরু তখন অবিসংবাদিত ক্ষমতার অধিকারী, কে তাঁকে বোঝাবে? কিন্তু গান্ধীর জীবৎকালে এই গান নিয়ে কী ধরণের ব্যাপার ঘটেছিল এবং গান্ধী তখন কী করেছিলেন, সেটা দেখা যাক। সেটা দেখলে বোঝা যাবে যে, বন্দে মাতরম্ বর্জনে গান্ধীর ভূমিকাও নেহাৎ কম ছিল না।

১৯২২ সালে কংগ্রেসের মুসলিম নেতা যে সামান্য কয়েকজন ছিলেন, তাঁদের কতিপয়ের আগ্রহে ও চাপে মহম্মদ ইকবালের 'সারে জাঁহা সে আচ্ছা' গানটিকে বন্দে মাতরমের সঙ্গে গাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কংগ্রেস। এটা ছিল 'বন্দে মাতরম্'-এর গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়ার জন্য এক গভীর ষড়যন্ত্র। মুসলমানদের তোষণ করার পদ্ধতি ছিল সেটা। ইকবালের গানকে ঢুকিয়ে দিয়ে যে মুসলিম নেতারা ক্ষান্ত হয়ে গেলেন, তা নয়। প্রসঙ্গক্রমে, এই নেতাদের মধ্যে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং রফি আহ্‌মেদ কিদোয়াই ছিলেন না। তাঁরা বন্দে মাতরম গানটি গাইতেন সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে। যাই হোক, পরের বছর, অর্থাৎ ১৯২৩ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কাঁকিনাড়া সম্মেলনে 'বন্দে

মাতরম্’ নিয়ে আপত্তি তুললেন মৌলানা মহম্মদ আলি, যিনি গান্ধীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং তাঁর কথাতে খিলাফত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন গান্ধী। মৌলানা আলি বললেন যে, মুসলমানরা শুধুমাত্র আল্লাকেই মান্য করে। শুধুমাত্র তাঁর সামনে নতমস্তক হয়। আর কারও সামনে নতমস্তক হবে না। তাঁর আপত্তি অবশ্য গ্রাহ্য হয়নি, ‘সারে জাঁহাসে’র সঙ্গে বন্দে মাতরম্ও গাওয়া হয়েছিল এবং পুরো গানটিই গাওয়া হয়েছিল কারণ সেটাই ছিল নিয়ম। কিন্তু কংগ্রেসের কতিপয় মুসলমান নেতা এবং কংগ্রেসের বাইরের মুসলিম লীগ নেতারা ক্রমশই বন্দে মাতরমের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ উচ্চগ্রামে তোলা শুরু করল। ফলে ১৯৩৭ সালের কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে বন্দে মাতরমের অঙ্গচ্ছেদ করা বল। এই বৈঠকে জহরলাল, সুভাষচন্দ্র, গান্ধী সবাই ছিলেন। গান্ধী ও নেহরু বন্দেমাতরম্‌কে রক্ষা করার কোনও চেষ্টাই করেননি, বরং তাঁদের সব কাজ ছিল এই গানটির বিরুদ্ধে। যা করার একমাত্র করেছিলেন সুভাষচন্দ্র। ২৬ অক্টোবর ১৯৩৭-এ এই বৈঠক হওয়ার কথা। সেখানে বন্দে মাতরম্-এর ওপর খাঁড়া নেমে আসতে পারে এই আশঙ্কা করে সুভাষচন্দ্র একটি চিঠি লিখলেন রবীন্দ্রনাথকে। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন সমগ্র গানটির তাৎপর্য ও তার ঐতিহাসিক বাস্তবতা। জওহরলালকে জানালেনও তাঁর মত। তথাপি কাজের কাজ কিছু হল না। কংগ্রেসের নেতারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এবার থেকে বন্দে মাতরম্ গানের প্রথম দুটি স্তবকই মাত্র গাওয়া হবে। বলা হল, পরবর্তী স্তবকগুলির ব্যাপারে মুসলমানদের আপত্তির পরিমাণ বেশি, তাই সেগুলি বাদ যাওয়া বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু তাতেও বিবাদ থামল না। ১৯৩৮ সালে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হল যে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বার্থে পুরো গানটিকেই বাদ দেওয়া উচিত। এবার মুসলমানদের মন রাখতে অধিবেশনে কোরান ও বাইবেল সুর করে পড়ার ব্যবস্থা হল! পুরো ঘটনাক্রমের কোনও পর্যায়েই ‘বন্দে মাতরম্’-এর প্রতি গান্ধী তাঁর ভালবাসার কথা ঘুণাক্ষরে ব্যক্ত করেননি। বরং মুসলমানদের আপত্তির কথা মাথায় রেখে ‘বন্দে মাতরম্’ গীতটিকে নির্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা পাকা করলেন। এই ব্যবস্থাটা করা হল ১৯৩৯ সালে ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায়। এইভাবে চলতে চলতে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হল, স্বাধীনতা এল। তথাপি, ধর্মনিরপেক্ষতার বকলমে মুসলমান ভাবাবেগকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে বন্দে মাতরম্‌কে অশ্রদ্ধা করার ধারা চলতেই থাকল। ২৯ আগস্ট ১৯৪৭ তারিখে বন্দে মাতরম্ সম্পর্কে গান্ধীর ধারণার কথা একটু আগে বলেছি।

কিন্তু আশ্চর্য লাগে এটা ভেবে যে, তাঁর সেই উক্তির কয়েকটা দিন পরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে 'জনগণমন' গাওয়া হল। মনে রাখতে হবে, তখনও পর্যন্ত জাতীয় সঙ্গীত মনোনয়নের ব্যাপারে Constituent Assembly কোনও সিদ্ধান্ত কিন্তু গ্রহণ করেনি। পুরো ব্যাপারটার মূল দায় ছিল নেহরুর এবং তাঁর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সহমত পোষণ করেছিলেন গান্ধী।

আসলে বন্দে মাতরম্ সম্পর্কে গান্ধী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কথা বলেছেন। যখন যে কথাটিতে তাঁর স্বার্থসিদ্ধি হবে ভেবেছেন, তখনই বলেছেন সেই কথাটি। বন্দে মাতরম্ সম্পর্কে তাঁর ধারণার পরিবর্তন ও বিবর্তন কিভাবে ঘটেছে, তার কিছু প্রমাণ পাওয়া যাবে এখান থেকে।

২ ডিসেম্বর, ১৯০৫-এ দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রকাশিত তাঁর নিজস্ব পত্রিকা ইন্ডিয়ান ওপিনিয়নে লিখেছেন — 'The song... has proved so popular that it has come to be our National Anthem... Just as we worship our mother, so is this song a passionate prayer to India.'

১৯১৫ সালের ২৭ এপ্রিল তারিখে মাদ্রাজের এক সভা শুরু হয় এই গানটি দিয়ে। গান্ধী ছিলেন সেখানে। মুগ্ধকণ্ঠে বলেন — 'You have sung that beautiful song, on hearing which all of us sprang to our feet.'

অথচ, মুসলমানদের ক্রমাগত সমালোচনা ও বিরোধিতার মুখে 'বন্দে মাতরম্'-এর মর্যাদা রক্ষা যখন বিপন্ন হয়ে পড়ছে, তখন দৃঢ়ভাবে বন্দে মাতরমের পক্ষ সমর্থন করে বক্তব্য না রেখে এই গান্ধীই ১৯৩৯ সালের ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে এমন একটি প্রস্তাব রাখলেন যা স্তম্ভিত করে দিল সবাইকে। প্রস্তাবটি তিনি রাখলেন এবং সেই সঙ্গে প্রস্তাবের মাথায় লিখে দিলেন — 'Strictly Confidential. Not for publication'। নিজের প্রস্তাবটি জনসাধারণ কিভাবে নেবে, সেই সম্পর্কে তাঁর নিজেরই সন্দেহ ছিল বলে এই লুকোচুরি খেলা। কী লিখেছিলেন তিনি সেই প্রস্তাবে? তিনি লিখেছিলেন — 'As for the singing of the long established national song, Vande Mataram, the Congress, anticipating objections, has retained as national song only those stanzas to which no possible objection could be taken on religious or other grounds.' অর্থাৎ ধর্মীয় বিরোধিতার জন্য গানটির অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব তিনি দিলেন। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। আরও লিখলেন — 'But except at purely Congress gatherings it should be

left open to individuals whether they will stand up when the stanzas (first two stanzas) are sung. In the present state of things, in local Board and Assembly meetings which their (i.e. Muslims) members are obliged to attend, the singing of Vande Mataram should be discontinued.' তার অর্থ দাঁড়াল, এই দেশভক্তির গানটি গীত হওয়ার সময় কেউ উঠে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানাবে কিনা, সেটা তার নিজস্ব সিদ্ধান্তের ব্যাপার। এখানেই থামেননি তিনি। লোকাল বোর্ড, অ্যাসেম্বলি ইত্যাদি জায়গাতে যাতে এই গান না গাওয়া হয়, তার জন্য ওকালতিও করলেন।

বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের এতটা কঠোর বিরোধিতা অনেক মুসলমানও করেননি। মুসলমানদের কেউ কেউ এই গান গীত হওয়ার সময় পার্লামেন্টের বাইরে থেকে গিয়েছেন কিংবা সভাকক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছেন বটে, তবে তাদের সংখ্যা বড় নগণ্য। কিন্তু সেই নগণ্য সাংসদদের একজনও বলেননি যে, বন্দে মাতরম্‌কে আমাদের অ্যাসেম্বলি ইত্যাদি থেকে বাতিল করে দিতে হবে। যা গান্ধী অক্লেশে বলেছেন। এটি মহাত্মার আর একটি ধাপ্পা। আর এই ধাপ্পা ঠিকমতোই চিনতে পেরেছিলেন নাথুরাম গড্‌সে। তাই তিনি তাঁর জবানবন্দিতে উল্লেখ করেছিলেন গান্ধীর এই ন্যক্কারজনক ভূমিকার — 'Is is notorious that some Muslims disliked the celebrated song of Vande Mataram and the Mahatma forthwith stopped its singing or recital wherever he could... It continued to be sung at all Congress and other national gatherings but as soon as one Muslim objected to it, Gandhiji utterly disregarded the national sentiment behind it and persuaded the Congress also not to insist upon the singing as national song.'

এরপর বন্দে মাতরম্ গীতের বিষয়ে গান্ধীজির ভণ্ডামি নিয়ে আর কিছু বলা বোধহয় নিষ্প্রয়োজন।

গান্ধী : সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জনক

মুসলিম তোষণ যে গান্ধীর রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ,এই সত্য এখন ইতিহাস-মনস্ক পাঠকের কাছে অজানা নয়। এটাও মোটামুটি ভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, অহিংসার নামাবলী গায়ে চাপিয়েই সাম্প্রদায়িক তুষ্টি করনের কাজে দৃষ্টিকটুভাবে এগিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। বর্ষানুক্রমিক হিসেবে তাঁর এই তুষ্টিকরণের ইতিহাস আমরা বলব। তবে তার আগে দেখার চেষ্টা করব যে,

কবে কখন কিভাবে ও কেন এই রাজনীতি জন্ম নিল তাঁর মধ্যে।

অনেকে বলেন, কিশোর বয়স থেকে তাঁর মধ্যে একধরনের মুসলিমপ্রীতি ছিল। গান্ধীর এক দাদার এক মুসলমান বন্ধু ছিল, নাম শেখ মেহতাব। তার সঙ্গে কিশোর গান্ধীর খুব সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। এই শেখ মেহতার তাঁকে পাঁঠার মাংস খাওয়া শিখিয়েছিল। একবার নয়, বেশ কিছু বার। প্রথমবার খাওয়ার পর সারা রাত তাঁর মনে হয়েছিল যে, পেটের মধ্যে পাঁঠাটা ব্যা ব্যা করে ডাকছে। তিনি লিখেও গিয়েছেন সে কথা—'a live goat was bleating inside me', তথাপি মাংস খাওয়া ছাড়তে পারেন নি। কেননা, মাংস তাঁর কাছে সুস্বাদু লেগেছিল। তাছাড়া শেখ মেহতাব তাঁকে শিখিয়েছিল যে, মাংস শরীরে শক্তি যোগায়। সেই জন্যও মাংস ভক্ষণকে শ্রেয় মনে করেছিলেন তিনি। ঠিকও করেছিলেন যে, গোপনতা ছেড়ে খোলাখুলি ভাবে মাংস খাবেন (I have found my freedom. I will eat meat openly)। পরবর্তী জীবনে অবশ্য তিনি আবার নিরামিষে ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু শেখ মেহতাবের প্রভাব তাঁর মধ্যে থেকে বিলীন হয়নি। প্রসঙ্গত, এই বন্ধুটির সঙ্গে তিনি বেশ্যালয়েও গিয়েছিলেন। গান্ধীর মুসলিম-প্রীতিতে এই শেখ মেহতারের ভূমিকা আছে বলে অনেকের বিশ্বাস। এছাড়া যে কোম্পানির চাকুরি নিয়ে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকাতে যান ও যাদের সৌজন্যে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে নিজেকে রাজনীতিবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পান, সেই দাদা আব্দুল্লা শেঠ এণ্ড্ কোম্পানির মালিক দাদা আব্দুল্লা ছিলেন মুসলমান। এই মানুষটি না থাকলে প্রথমে মুম্বাই পরে রাজকোটের অকৃতকার্য ব্যারিস্টার গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকাতে যাওয়ার সুযোগ মিলত না এবং সেই সুযোগ না মিললে যে গান্ধীকে আমরা আজ জানি—সেই গান্ধী হওয়াও হয়ে উঠত না। এই জন্যেই কৃতজ্ঞ গান্ধী পরবর্তী জীবনে মুসলমানদের সম্পর্কে অত্যন্ত উদার হয়ে উঠেছিলেন।

আবার কেউ কেউ বলেন, প্রেম নয়, ভয় থেকেই এই ভালবাসার জন্ম। এই মতের বিশ্বাসীদের মধ্যে ডা. ভীমরাও আমবেদকরও আছেন। যে ঘটনার জন্য তাঁর এই বিশ্বাস, সেটা ঘটেছিল ১৯০৭ সালে। সে সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে মুসলমানরা সংখ্যায় হিন্দুদের থেকে বেশি না হলেও অর্থবলে তারা ছিল প্রবল। এই অর্থবলে বলীয়ান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মালিক মুসলমানদের ওপর সেখানকার ঔপনিবেশিক সরকার নানারকম বিধি নিষেধ, কর (tax) ইত্যাদি চালু করেছিল।

১৯০৬ সালে ট্রান্সভাল সরকার একটি নতুন প্রণয়ন করে। এই আইন

অনুযায়ী, আট বছরের ঊর্ধ্বে প্রতিটি ভারতীয়র জন্য একটি পাস (Pass) নিয়ে চলাচল করাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। এই আইনের বিরুদ্ধে সেখানকার ভারতীয়রা সরব হয়। গান্ধীর নেতৃত্বে প্রায় তিন হাজার ভারতীয় এক সভায় মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় যে, ভারতীয়রা এই পাশের জন্য আবেদন করবে না এবং তাদের নামও সরকারি খাতায় নথিবদ্ধ করবে না। সভায় আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, ভারতীয়দের ওপর এই বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদ জানাতে ও এই আইনকে রদ করতে গান্ধী ইংলণ্ডে যাবেন। সেইমত তিনি লণ্ডনে গেলেন ও সেখানে ব্রিটিশ সরকারের উপনিবেশ বিষয়ক সেক্রেটারি লর্ড এলগিনের সঙ্গে বৈঠক করলেন। লর্ড এলগিন রাজি হলেন এই আইন রদ করতে এবং গান্ধী ফিরে এলেন দক্ষিণ আফ্রিকাতে। কিন্তু ফিরে আসার পর দেখলেন যে, আইন উঠল তো না, বরং আরো কড়া হল। সেই সঙ্গে শুরু হল ভারতীয়দের যথেচ্ছ ধরপাকড়। চিন্তিত গান্ধী স্থানীয় সরকারের সঙ্গে আবার আলোচনায় বসলেন। এবার সরকার থেকে আশ্বাস দেওয়া হল যে, ভারতীয়দের পাস নিতে হবে না। তবে সরকারি খাতায় তাদের নাম নথিবদ্ধ করতে হবে। গান্ধী মেনে নিলেন এই প্রস্তাব এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনার বন্যা শুরু হল। সুযোগ বুঝে সরকারও বলে দিল যে, গান্ধীর সঙ্গে কোনো চুক্তিই তাদের হয়নি এবং আইন মোতাবেক ভারতীয়দের পাস নিতেই হবে। তবু সরকারের এই কৌশলে দমে না গিয়ে গান্ধী তাঁর নিজের নাম নথিভুক্ত করে আসেন।

এইরকম এক দিনে তাঁর ওপর আক্রমণ নেমে আসে। এই আক্রমণ চালাল সেখানকার ভারতীয় মুসলমানরা। মীর আলম নামে এক পাঠানের নেতৃত্বে মুসলমানরা তাঁর ওপর চড়াও হল এবং ভীষণভাবে মারধর করল গান্ধীকে। মাটিতে পড়ে গিয়েও রেহাই পাননি তিনি। কেউ তাঁকে লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছে তো কেউ তাঁকে ফুটবলের মত লাথি মারছে। শুধু যে মারধর করে ক্ষান্ত হল তা নয়, যাওয়ার আগে শাসিয়েও গেল যে, বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি মৃত্যু। সেটাই তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে।

এই ঘটনা গান্ধীকে মুসলমানদের বিষয়ে সতর্ক করে তুলল। ড. আম্বেদকরের মতে, ঘটনাটি গান্ধীর জীবনে একটা মাইলফলক হিসেবে থেকে গেল। এরপর থেকে মুসলমানদের সমালোচনা করা—এমনকি তারা ঘৃণিত অপরাধ করলেও মৌন থাকাকে জীবনের বেদমন্ত্র হিসেবে মেনে নিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, যা করলে মুসলমানরা খুশি, সেই কাজই তিনি করতে থাকলেন এবং নিজের এই তোষণের সমর্থনে কলম ধরাও শুরু করলেন।

মুসলমানদের মানসিকতা সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানপ্রাপ্ত গান্ধী দু বছর পর ১৯০৯

সালে প্রবাসী ভারতীয়দের দাবি-দাওয়া নিয়ে আবার ইংলণ্ডে যান। সেখানকার শাসকদের সঙ্গে কথা বলতে। সামান্য কিছু মৌখিক আশ্বাস ছাড়া মিলল না কিছু। তবে নতুন করে কোনও আক্রমণের মুখোমুখি হলেন না। ইতিমধ্যে পৃথিবী ব্যাপী প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘনিয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠেছে। চিন্তিত ব্রিটিশ সরকার সাব্যস্ত করল গান্ধীকে ভারতে পাঠিয়ে সেই আন্দোলনে রাশ টানতে। ততদিনে সত্যগ্রহ ও অহিংসা আন্দোলনের সুবাদে গান্ধী পরিচিত নাম। ইংরেজরা বুঝল, অহিংস গান্ধীর থেকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তাই ভারতে ফেরার পর গান্ধী কী করবেন আর কী করবেন না, সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ১৯১৪ সালে তাঁকে ডেকে পাঠাল ইংলণ্ডে। সেখানে আলোচনা শেষে তাঁকে সেখান থেকেই পাঠিয়ে দিল ভারতে। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর সুনাম ততদিনে রীতিমত ক্ষতিগ্রস্ত, চলে যেতে পারলে তিনিও বাঁচেন। তাই ভারতে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। জীবনে আর কোনওদিন দক্ষিণ আফ্রিকায় পা রাখেন নি। ভাবলে অবাক লাগে, যে দক্ষিণ আফ্রিকা ছিল তাঁর দীর্ঘ একুশ বছরের কর্মভূমি, যে দক্ষিণ আফ্রিকা তাঁকে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছিল জননেতা হিসেবে, সেখানে কী এমন ভয়ংকর ঘটনা ঘটেছিল যে, জীবনে আর গেলেন না সেখানে ! এমনকি তাঁর সাধেব ফিনিক্স ও টলস্টয় ফার্মের ভবিষ্যৎ কী হল—সেটাও দেখতে চাইলেন না একবার !

ব্রিটিশ তাঁকে ভারতে নিয়ে এল, নরমপন্থী নেতা গোপাল কৃষ্ণ গোখলের সঙ্গে তাঁকে জুড়ে দিয়ে কংগ্রেসের ক্ষমতা দখলের পথে চালিত করল, কিন্তু মহত্বাকাঙ্ক্ষী গান্ধী এত অল্পে তুষ্ট হওয়ার পাত্র নন। তাছাড়া কংগ্রেসের মধ্যেই ব্রিটিশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে জল ঘোলা হতে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতিতে গান্ধী এমন একটা কাজ করলেন যে কাজ ভারতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূচনা করল। সেটা হল খিলাফত আন্দোলনে সমর্থন প্রদান।

খিলাফত আন্দোলন ছিল আদতে সাম্রাজ্যবাদী ইসলামী (Pan Islamic) আন্দোলন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর অটোমান সাম্রাজ্য (নামান্তরে তুর্কী সাম্রাজ্য) খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাচ্ছিল। তুরস্কের মধ্যেও গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষেরা কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে খলিফা আব্দুল হামিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। এই বিদ্রোহকে দমন করার জন্য তুর্কী সম্রাট শুরু করলেন খিলাফত আন্দোলন, উদ্দেশ্য ছিল, নিজের সুলতান খলিফা পদের সুযোগ নিয়ে

পৃথিবীর সমস্ত দেশের মুসলমানদের খেপিয়ে তুলবেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে।

গান্ধীর কাছে এই আন্দোলন রাজনৈতিক ক্ষমতা বাড়াবার একটা সুযোগ নিয়ে উপস্থিত হল। কংগ্রেসের ভিতরে নিজেকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি খিলাফত আন্দোলনকে শুধু যে নিজে সমর্থন করলেন তাই নয় কংগ্রেসকেও বাধ্য করলেন সমর্থন দিতে। সমর্থনের কারণ দেখাতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে, এর ফলে দেশে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য দৃঢ় হবে, মুসলমানরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন ভাববে না। এমন কথাও বললেন যে, খিলাফৎ আন্দোলন হল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন। তাঁর এই ব্যাখ্যার তীব্র বিরোধিতা করে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, অ্যানি বেশান্ত, মতিলাল নেহরু, এবং আরও বহু কংগ্রেস সদস্য দল ছেড়ে দিলেন। এমন কি, জিন্নাও খিলাফত আন্দোলনের প্রতি এই সমর্থনের বিরোধিতা করে কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন চৌধুরী ফজল হুসেন ও লালা লাজপত রায়। লালা পরে কংগ্রেসে ফিরে যান, কিন্তু ১৯২০ সালের এই ঘটনার পর জিন্না এবং ফজল হুসেন আর কংগ্রেসে ফেরেন নি। জিন্না খিলাফত আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন এই বলে যে এই আন্দোলন পুরোপুরি সম্প্রদায়গত আন্দোলন। তাঁর কাছে খিলাফতী একটি দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান। ১৯২০ সালে লেখা এক চিঠিতে গান্ধীকে এই প্রসঙ্গে তাঁর ধারণা বিস্তারিত ভাবে জানিয়েও ছিলেন জিন্না। আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলেছিলেন—'The Khilafat Movement is bound to lead to disaster' মুসলিম লীগ এবং হিন্দু মহাসভাও বিরোধিতা করেছিল খিলাফত আন্দোলনের। কিন্তু নিজের রাজনৈতিক সুবিধার কথা ভেবে গান্ধী এই আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন এবং এভাবে বপন করেছিলেন সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বীজ।

এই বীজ যে কতটা ভয়ংকর হতে পারে, কত দ্রুত মহীরূহ হয়ে উঠতে পারে, সেটা দেখতে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হল না। কয়েক মাসের মধ্যে ১৯২১ সালের আগষ্ট মাসে সাম্প্রদায়িক তুষ্টিকরনের রাজনীতির বিষময় ফলের বহিঃপ্রকাশ ঘটল কেরলের মালাবার উপকূলে। যে ঘটনা ইতিহাসে মোপলা বিদ্রোহ (Moplah Rebellion) নামে কুখ্যাতি পেয়েছে। এই বইয়ের অন্যত্র সেই বিদ্রোহ কিভাবে ব্রিটিশ বিরোধিতা থেকে হিন্দু নিধন যজ্ঞে রূপান্তরিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে। দ্বিরুক্তি হওয়ার ভয়ে এখানে তা আর বলছি না। শুধু এটুকু জানিয়ে রাখছি যে, খিলাফত আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে গড়ে

ওঠা এই বিদ্রোহ শেষ হয়েছিল কয়েক হাজার হিন্দুকে হত্যা, কয়েক হাজার হিন্দু রমণীকে নির্বিচার ধর্ষণ, লক্ষাধিক হিন্দুকে বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ এবং কয়েকলক্ষ হিন্দুর ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে ও সম্পত্তি লুণ্ঠন করে নিজভূমি থেকে উৎখাত করার মধ্য দিয়ে। বিপ্লব শেষ হওয়ার পর এই উগ্র মৌলবাদী মোপলা মুসলমানদের উপর নেমে এসেছিল ব্রিটিশ শাসকের দেওয়া শাস্তি। পুরো এই ঘটনাক্রমে গান্ধী কী ভূমিকা পালন করেছিলেন, সেদিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারব যে, গান্ধীর সাম্প্রদায়িক তুষ্টিকরণ কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল। দেখতে পাব, সত্যের জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত পরম সত্যবাদী গান্ধী কীভাবে মিথ্যার কারবার করেছেন।

১৯২১ সালের আগষ্ট মাসে কেরলের মালাবার উপকূলের এই মোপ্‌লা মুসলমানরা (যারা আরবদের প্রত্যক্ষ বংশধর ছিল) ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ শুরু করে। এই ধর্মযুদ্ধ ছিল খিলাফত আন্দোলনের অংশ। অতর্কিত আক্রমণে প্রাথমিক ভাবে ইংরেজরা পরাস্ত হয়। কয়েক জন ইংরেজ রাজকর্মচারী নিহত হয়। সাময়িকভাবে পশ্চাদপসরণ করে তারা। জিহাদীরা সমগ্র অঞ্চলে খিলাফতী রাজ প্রতিষ্ঠিত করে। এরপর আন্দোলনের অভিমুখ পাল্টে যায়। আক্রান্ত হয় হিন্দুরা। আক্রমণের কারণ ছিল হিন্দুদের বিধর্মী পরিচয়। আমাদের দেশের সেকুলার ইতিহাসবিদ এবং রাজনীতিকরা বলেন, হিন্দুরা ছিল জমিদার আর মোপলারা ছিল কৃষক, সেই কারণে এই লড়াই ছিল জমিদারের বিরুদ্ধে কৃষকের শ্রেণি সংগ্রাম। এই মহাপণ্ডিতরা এই কথাটা মনে রাখেন না যে ভূস্বামী জমিদাররাই যদি আক্রমণের মূল লক্ষ হত, তবে সাধারণ ভূমিহীন হিন্দুদের ওপর আক্রমণ নেমে আসার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু তা হয়নি। ভূস্বামী উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে গরীব হিন্দুরা এমন কি তফসিলি জাতির হিন্দুরাও সমানভাবে আক্রান্ত হয়েছিল এই উগ্র মৌলবাদী মুসলমানদের হাতে। ধর্মযুদ্ধের মূল যেহেতু নিহিত থাকে ধর্মীয় প্রভুত্ব স্থাপনের মধ্যে, অতএব নৃশংসতার চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটল এই আক্রমণে। খিলাফতকে সমর্থন করার ফলে গান্ধীর কাছে প্রত্যাশা ছিল, তিনি মোপলাদের এই আক্রমণের বিরুদ্ধে নিদেন পক্ষে তাঁর ব্র্যাণ্ডের অহিংস লড়াইয়ে নামবেন। প্রতিবাদ আন্দোলন করবেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে সদ্যগঠিত প্রণয়ের জোরে আক্রমণ বন্ধের চেষ্টা করবেন। বিপুল ঢক্কানিনাদ সহকারে প্রচারিত হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির প্রচেষ্টাকে সফল করার জন্য যুগান্তকারী কোনও ব্যবস্থা নেবেন।

কতটা কী করেছিলেন, সেই কথা বলি। আর এই বলার জন্য সত্যের মুখ

চেয়ে ভারত সরকার দ্বারা প্রকাশিত মহাত্মা গান্ধীর নির্বাচিত রচনাবলীর (collected works of Mahatma Gandhi) মধ্যে মোপলা বিদ্রোহ এবং তাঁর ভূমিকা নিয়ে যেসব কথা তিনি লিখেছেন, তার ওপর ভিত্তি করেই আমাদের বিশ্লেষণ চলবে।

নবজীবন পত্রিকার ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯২১ সংখ্যায় গান্ধী একটা প্রবন্ধ লিখলেন— মোপ্‌লা বিদ্রোহ (Moplah outbreak)। এখানে তিনি লিখলেন—"It is not clear as yet what led to their present outburst. They are reported to have taken the lives of six officers, four Indians and two British. It is believed that some others also may have been killed. Five hundred Moplahs are believed to have been killed. It is also reported that they have resorted to arson and looting. Calicut and some areas to its north are under martial law at present. Thus for the time being progress has been arrested in Malabar and Government has its way. It is well versed in the art of suppressing such revolts. Many innocent men must bave been, and more will be killed. Who will come forward to blame the Government? And even if anyone does, what is the chance of the Government paying attention to him?" অর্থাৎ যা তিনি লিখলেন তার মর্মার্থ হল : কেন এই বিদ্রোহ শুরু হল, সেই কারণ স্পষ্ট নয়। সংবাদে প্রকাশ, চারজন ভারতীয় আধিকারিক ও দুজন ব্রিটিশকে মোপলারা হত্যা করেছে। মনে করা হচ্ছে, আরও কিছু মানুষের মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। মোপ্‌লাদের মধ্যেও পাঁচশ'জন নিহত হয়েছে বলে বিশ্বাস। জানা যাচ্ছে মোপলারা লুঠতরাজ ও ঘরবাড়ি জ্বালিয়েছে। কালিকট এবং তার উত্তরী এলাকায় কিছু জায়গায় বর্তমানে সামরিক আইন (martial law) লাগু করা হয়েছে। এর ফলে অবস্থার ক্রম-অবনতি ঠেকানো গেছে। বিদ্রোহ দমনের ব্যাপারে রাজশক্তির অভিজ্ঞতা কম নয় বলে আশংকা থাকেই যে, বহু নিরপরাধ মানুষ মারা গেছে এবং আরও অনেক মারা যাবে। কার সাহস আছে সরকারকে এজন্য অভিযুক্ত করবে? যদি কারও থাকেও সে সাহস, সরকার যে তাতে কর্ণপাত করবে—তা কে বলতে পারে?

এই কথা লেখার পর যথারীতি গান্ধী তাঁর স্বধর্ম অনুযায়ী বিপুল বাণী বর্ষণ করতে ভোলেন নি। সেই বাণী অহিংসার শক্তি নিয়ে, মালাবার উপকূলে কেন ব্যর্থ হল অহিংসার বাণী—তার কারণ ব্যাখ্যা নিয়ে এবং সবশেষে এমন ঘটনা ভবিষ্যতে যাতে না ঘটে সেই বিষয়ে কিভাবে সতর্ক থাকতে হবে—সেই বিষয়

নিয়ে। খুবই জ্ঞানগর্ভ বিবৃতি, সন্দেহ নেই। কিন্তু বিদ্রোহের ক্ষয়ক্ষতি বিষয়ে যে ছোট্ট ধারা বিবরণীটি তিনি দিলেন, সেইটাকে সামান্য কাটাছেঁড়া করলে এক অশ্রুতপূর্ব ধান্ধাবাজি ও সাম্প্রদায়িক তুষ্টিকরণের রাজনীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি মেনে নিয়েছেন যে, আক্রমণটা আসে মোপ্‌লা মুসলমানদের পক্ষ থেকে। কারণটা যে খিলাফত আন্দোলন তথা জিহাদ ও ধর্মযুদ্ধ—সেটা তাঁর অজানা থাকার কথা নয়। কিন্তু স্বীকার করলে দোষের দায়, তাঁর ঘাড়েও পড়ে। অতএব সে সম্পর্কে একটি কথাও বললেন না। তিনি জানালেন যে, মোপ্‌লারা দুজন ব্রিটিশ এবং চারজন ভারতীয়কে হত্যা করেছে। এই ভারতীয়রা যে হিন্দু সে উল্লেখ করলেন না। এছাড়াও বললেন, যে, আরো কিছু হত্যাও হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু তার পরে যে কথাটি বললেন, তাকে ভয়ংকর মিথ্যা ও ভীষণ রকমের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বললে কম বলা হয়। জানালেন যে, পাঁচ শ' মোপ্‌লা মুসলমান নিহত হয়েছে। তার মানে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল ? দাঁড়াল এই যে, মোপ্‌লাদের বিরুদ্ধ পক্ষে অর্থাৎ ব্রিটিশ ও হিন্দুদের পক্ষে ছয় জনের সঙ্গে আরও কয়েকজন মরতে পারে, কিন্তু মোপ্‌লাদের প্রাণহানি তার থেকে অনেক—অনেক বেশি, সংখ্যাটি পাঁচ শ। পড়লে ধারণা হওয়াটা অসঙ্গত নয় যে, মোপ্‌লারা ছিল দুর্বল পক্ষ, তাই তাদের ক্ষয়ক্ষতি এত বেশি। কিন্তু আসল ব্যাপারটা আদৌ তা ছিল না। বিদ্রোহের প্রথম পর্বে মোপ্‌লারা ছিল প্রবল পরাক্রান্ত আক্রমণকারী, তাদের আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে ব্রিটিশ পালিয়েছিল আর তারা পালাবার পর খিলাফতী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যদিও তা বেশি দিনের জন্য নয়। কিন্তু অল্প যে কয়টি দিন মোপ্‌লারা তাদের শাসন কায়েম রেখেছিল, সেই কয় দিনে কমপক্ষে পাঁচ হাজার হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছিল। গান্ধীর কাছে বিশেষ কারণেই সেই খবর ছিল না। আর পাঁচ শ মোপ্‌লার নিহত হওয়ার খবরটাও ছিল গান্ধীর উর্বরমস্তিষ্কপ্রসূত। মিথ্যার মজা আরো দেখুন। পাঁচ শ মোপ্‌লার মৃত্যুর খবর জানাবার পর সম্ভবত কিঞ্চিৎ বিবেকের তাড়া অনুভব করেছিলেন। তাই একটা ছোট্ট সত্যি কথা বলে ফেললেন—"It is also reported that they have resorted to arson and looting'। ব্যাপারটা কি একেবারে ফাল্‌তু কোয়ালিটির খিচুড়ি বানানো হল না ? মোপ্‌লারা হিন্দুদের (যদিও পরিষ্কার ভাবে গোটা প্রবন্ধের মধ্যে হিন্দুদের নাম-উচ্চারণ করলেন না) ঘরবাড়ি পোড়াল, সম্পত্তি লুঠ করল তারপর নিজেদের জীবন বিসর্জন দিল। ঘটনার এমন রিপোর্টিং কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ কখনও করতে পারে ? পারে না। কিন্তু গান্ধী

করলেন। এর পর আরও চমৎকার কিছু বক্তব্য পেশ করলেন। ব্রিটিশ শাসনের ওপর দোষ চাপালেন। নিরীহ মোপ্‌লাদের কপালে যে বড় রকমের দুর্গতি অপেক্ষা করে আছে, তার জন্য দুশ্চিন্তা প্রকাশ করলেন। পুরো প্রবন্ধটিতে এভাবে নির্লজ্জ মুসলমান-তোষণের চূড়ান্ত করলেন কিন্তু যে হাজার হাজার সাধারণ হিন্দুর মৃত্যু হল, তার জন্য তাঁর কলম থেকে একটি বাক্যও বেরোল না। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে পার্লামেন্টে প্রদত্ত কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকারের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের দেওয়া একটি পরিসংখ্যান। এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী গুজরাট দাঙ্গায় মৃত্যু হয়েছিল ৭৯০ জন মুসলমানের এবং ২৫৪ জন হিন্দুর। হিন্দুদের এই মরার খবর নিয়ে দেশের কোনও সেকুলার নেতার মুখে একটি বাক্য কখনও শুনেছেন কি? শুনবেন না। সবাই মুসলমানদের মৃত্যু নিয়ে শোকাহত। চোখে কালো কাপড়ের ফেট্টি বেঁধে সত্যকে দুমড়ে মুচড়ে পেশ করার এই ধারাটিকে বলা হয় তোষণ বা তুষ্টিকরণের ধারা। যার শুরুটা হয়েছিল গান্ধীর হাতে এবং সেই ট্র্যাডিশান আজও সমানে চলেছে।

কিন্তু মোপ্‌লা বিদ্রোহ ও হিন্দুনিধন যজ্ঞ নিয়ে গান্ধীর ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতার এখনো অনেক কথা বাকি আছে। সেগুলি না জানলে প্রয়োজনে গান্ধী যে কতটা মিথ্যাচারী হতে পারতেন, সেই পরিচয়ের পূর্ণ প্রকাশ হয় না। মোপ্‌লাদের সম্পর্কে গান্ধীর দ্বিতীয় প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল ১৯২১ সালের ২০ শে অক্টোবর সংখ্যার 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায়। ততদিনে মোপ্‌লাদের 'জাগরণের' আসল সংবাদ জেনে ফেলেছে সারা পৃথিবী। গান্ধীর মুসলিম প্রেম ও হিন্দুদের প্রতি বিতৃষ্ণা সর্বসমক্ষে চলে এসেছে। সমালোচিত হচ্ছেন তিনি বিপুলভাবে। এই প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় প্রবন্ধটি লিখলেন তিনি। নাম দিলেন—The Meaning of the Moplah Rising। এখানে তিনি লিখলেন—"The Moplah is a test for Hindus and Mussulmans. Can Hindus friendship survive the strain put upon it? Can Mussulmans in the deepest recesses of their hearts approve of the conduct of the Moplahs?......The Hindus must have the courage and the faith to feel that they can protect their religion in spite of such fanatical eruptions.......The Mussulmans must naturally feel the shame and humiliation of the Moplah conduct about forcible conversions and looting, and they must work away so silently and effectively that such things might become inpossible even on the part of the most fanatical about them. My belief is that the Hindus as a body have recieved the Moplah madness with equanimity and

the cultured Mussulmans are sincerely sorry for the Moplah's perversion of the teaching of the Prophet। চারদিকে মোপ্‌লাদের আক্রমণের বীভৎসতা নিয়ে এত সংবাদ চারদিকে তখন ছড়িয়ে পড়েছে যে, দু মাস আগের 'নিরীহ' মোপ্‌লাদের পক্ষ নিয়ে খুব একটা ওকালতি করা কষ্টকর হয়ে পড়েছিল গান্ধীর কাছে। তাই মোটামুটি পরিষ্কার করে বলে দিয়েছিলেন নৃশংসতার কথা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়েছিলেন এই ভেবে যে এর ফলে মুসলমানরা তাঁর বিরুদ্ধে যাবেন না তো ! অতএব মুসলমানরা যাতে মনে ব্যথা না পায় তার জন্য একটা দ্বিমুখী কৌশল নিলেন। এই কৌশলের একদিকে থাকল হিন্দুদের সমালোচনা, আর একদিকে থাকল মোপ্‌লাদের বাইরে যে অগণিত মুসলমান আছেন, তাঁদের সম্পর্কে প্রশংসাসূচক মন্তব্য। হিন্দুদের সম্পর্কে বললেন, এই অত্যাচার তারা শান্তভাবে (equanimity) গ্রহণ করেছে, আর মুসলমানদের ক্ষেত্রে বললেন, মোপ্‌লাদের আচরণে মুসলমানরা গভীরভাবে লজ্জিত ও দুঃখিত হয়েছে কেননা, অত্যাচারের এই নৃশংসতা হজরত মুহাম্মদের শিক্ষার বিরোধী। অর্থাৎ বাধ্য হয়ে মোপ্‌লাদের সমালোচনা করলেও সাধারণ ভাবে মুসলমানরা যাতে তাঁর প্রতি বিদ্বিষ্ট না হয়, তার জন্য তারা যে মনে মনে কতটা অনুতপ্ত সেই কথা বলে তাদের ম্যানেজ করলেন। প্রসঙ্গত, ইতিহাসে এমন কোনও প্রমাণ নেই যার দ্বারা বোঝা যায় যে, এই ঘটনায় মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া সাধারণ ভাবে মুসলমানরা আদৌ দুঃখ পেয়েছিল কিনা। এমন কোনও লেখা কোনও মুসলমান লেখেন নি। উল্টে মোপ্‌লাদের পক্ষ নিয়েই তারা সরব ছিল। আর অত্যাচার মুখ বুঁজে সহ্য করার কথা ? ঘরের মেয়েরা ধর্ষিতা হচ্ছে দেখে, ছেলেরা নিহত কিংবা ধর্মান্তরিত হচ্ছে দেখে কেউ কোনও দিন শান্ত থাকতে পারে ? এই কথাটি বলে তিনি হিন্দুদের কাটা ঘায়ে নুন ছিটিয়ে দিলেন।

এর পর ওই একই বছরের (১৯২১) ৮ই ডিসেম্বর ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় তিনি আর একটি প্রবন্ধ লিখলেন এই বিষয়ে—'মোপ্‌লা ট্রাজেডি'। এখানে ব্রিটিশ শাসকের হাতে মোপ্‌লাদের বন্দি হওয়া এবং তাদের ওপর নেমে আসা অত্যাচারের বর্ণনা দিয়ে মোপ্‌লাদের প্রতি সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করেছেন তিনি। মোপ্‌লা বিপ্লবীদের বন্দি করে ওয়াগনে ঠেসে পাঠাবার সময় কয়েকজন মারা যায়। তাদের পক্ষ নিয়ে গান্ধী কলম ধরেন। অত্যাচারের বিরুদ্ধে কলমধরাটা অন্যায় নয়। কিন্তু প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয়, এমন মানবিকতাবোধ হিন্দুরা যখন অত্যাচারিত হচ্ছিল, নিহত হচ্ছিল—তখন কোথায় ছিল গান্ধীর ?

'হিন্দুজ অ্যাণ্ড মোপ্‌লাজ' এই শিরোনামে ১৯২২ সালের ২৬শে জানুয়ারি একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় গান্ধীর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায়। এখানে তিনি মালাবারের অধিবাসী কেশব মেনন এবং অন্যদের লেখার প্রতিবাদ বা সমালোচনা করেন। কেশব মেনন এবং আরও বেশ কিছু হিন্দু মোপ্‌লাদের নৃশংসতা নিয়ে বেশ কিছু চিঠি লেখেন গান্ধীকে। একটি চিঠিতে তাঁরা লেখেন যে, "আমেদাবাদের খিলাফত সম্মেলনে সম্প্রতি মোপ্‌লাদের বিষয়ে কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে মৌলানা আব্দুল বারি সাহেবের পাঠানো একটি টেলিগ্রাম সারভেন্ট অব ক্যালকাটা পত্রিকার ২০শে ডিসেম্বর (১৯২১) সংখ্যায় ছাপা হয়েছে। সেখানে যা বলা হয়েছে, তা থেকে ধারণা হতে বাধ্য যে দেশের মুসলমানদের সঙ্গে মালাবারের বাইরের হিন্দুরাও এখানে কী ঘটেছে, সেই সম্পর্কে কিছুই জানেন না। আশা করা গিয়েছিল, আমাদের মুসলমান বন্ধুরা হতভাগ্য হিন্দুদের প্রতি অন্তত কিছু সহানুভূতি সূচক কথা বলবেন। কিন্তু তা না করে খিলাফত সম্মেলনে মোপ্‌লাদের গুণকীর্তন করা হল, ধর্মের জন্য যে কাজ তারা করেছে, তার জন্য তাদের অভিনন্দন জানানো হল এবং বিপুল সংখ্যক হিন্দু যে বর্বরতার সম্মুখীন হল তাকে নিন্দা করে, একটা কথাও বলা হল না। (বলা দরকার, এই খিলাফত সম্মেলনে সপার্ষদ গান্ধীও উপস্থিত ছিলেন)।" এরপরই গান্ধীর সত্যের প্রতি অবিচল আস্থার স্বরূপ নিয়ে প্রশ্ন তোলা হল চিঠিতে—"A true Satyagrahi has no option but to proclaim the truth........Truth is infinitely of more paramount importace than Hindu-Muslim unity or swaraj.........atrocities committed by the Moplahs on the Hindus are unfortunately too true." এই কথাগুলি একেবারে গান্ধীকে উদ্দেশ্য করে লেখা। সম্প্রীতির মুখ চেয়ে সত্যকে বলি দেওয়ার যে নীতি তিনি অনুসরণ করেছিলেন, তাকে সমালোচনা করে লেখা।

এই প্রসঙ্গে গান্ধীর প্রিয়পাত্র মৌলানা হস্‌রত্‌ মোহানির ভূমিকারও তীব্র সমালোচনা করা হয়। মৌলানা মোহানি ছিলেন মোপ্‌লাদের কট্টর সমর্থক। তিনি হিন্দুদের ওপর আক্রমণকে সমর্থন করেছিলেন এই যুক্তিতে যে, হিন্দুরা নাকি ব্রিটিশদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে মোপ্‌লাদের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেয়। আর মোপ্‌লারা যে নৃশংসতা দেখিয়েছিল, তা-ও নাকি ছিল তাদের ওপর নেমে আসা অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া।

মোহানির এই কথাগুলি ছিল নির্জলা মিথ্যা। কিন্তু আমাদের সত্যবাদী ও

সত্যপন্থী গান্ধী তাঁর জবাবী চিঠিতে যা লিখলেন, তাকে চমকপ্রদ বললেও কম বলা হয়। তিনি লিখলেন—'Maulana Hasrat Mohani is one of our courageous men. He is strong and unbending.' এরপর অত্যন্ত মৃদুভাবে মৌলানাকে কিঞ্চিৎ সমালোচনা করলেন বটে, কিন্তু সেই সমালোচনার ওপর জলও ঢেলে দিলেন এই বলে যে, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের পথে মৌলানার বিরাট ভূমিকা আছে এবং—'There is no greater nationalist nor a greater lover of Hindu-Muslim unity than the Maulana.' এত কথা লিখতে পারলেন গান্ধী, কিন্তু চিঠির উত্তরে এটা জানাতে পারলেন না যে কেন খিলাফত সম্মেলনে হিন্দুবিরোধী আক্রমণের সামান্য নিন্দা পর্যন্ত করা হল না। উল্টে যা তিনি করলেন, তা তাঁর মুসলিম তুষ্টিকরণের ইতিহাসে একটি চূড়ান্ত নিন্দাযোগ্য বিষয় হিসেবে বেঁচে থাকবে। সমস্ত কিছুর জন্য তিনি হিন্দুদেরও দোষী সাব্যস্ত করলেন। তুলে নিয়ে এলেন বস্তাপচা কিছু অভিযোগ—"Hindus must find out the causes of Moplah fanaticism. They will find that they are not without blame. They have hitherto not cared for the Moplah. They have either treated him as a serf or dreaded him. They have not treated him as a friend or neighbour, to be reformed or respected. It is no use now becoming angry with the Moplahs or the Mussulmans in general."

চমৎকার এই গান্ধী-বাণী পড়লে মনে হয়, মালাবারের সমস্ত হিন্দুরা ছিল ভূস্বামী-জমিদার আর সমস্ত মুসলমানরা ছিল ভূমিহীন খেতমজুর। মিথ্যারও একটা সীমা থাকে, গান্ধী সেই সীমাও পেরিয়েছিলেন।

সীমা পেরিয়েছিলেন তিনি আরও অনেক দিকে। মোপ্‌লা মুসলমানদের পক্ষ সমর্থন করে নিজে তো বহুবার বক্তব্য রেখেছেনই, টেনে এনেছেন অন্য মুসলমানদেরও। তাদের লেখা চিঠিপত্র, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ছেপেছেন নিজের ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায়। এরকমই একটি চিঠি ছাপা হল পত্রিকাটির পয়লা মে ১৯২৪ সংখ্যাতে। পত্রের লেখক জনৈক ইয়াকুব হাসান। সেখানে বলা হল, মোপ্‌লারা নতুন কিছু করেনি, একই পরিস্থিতিতে পড়লে হিন্দু এবং খ্রিষ্টানরা যা করত, তারা তাই করেছে। এরপর ইয়াকুব হাসান আবেদন জানালেন হিন্দু ভাইদের কাছে—ব্রিটিশের প্রতিহিংসার কারণে মোপ্‌লাদের এখন বড় দুর্দিন। হিন্দু ভাইরা যেন তাদের অন্ন দিয়ে বস্ত্র দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে।

এমন মর্মস্পর্শী চিঠি পেয়ে গান্ধী কেঁদে ভাসালেন। ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় ওই সংখ্যায় মোপ্‌লাদের প্রতি সাহায্যের আবেদন জানিয়ে ঘোষণা করলেন,

দুর্গত মোপ্‌লাদের দুর্গতি দূরকল্পে তিনি অনশনে বসবেন। এবং বসলেনও। হিন্দুরা যখন কচুকাটা হচ্ছে, গ্রামকে গ্রাম হিন্দু বসতি যখন উজাড় হয়ে যাচ্ছে, তখন যাঁর মুখে একটি কথা ছিল না, অনশনের চিন্তাও তখন যাঁর মাথায় আসেনি, তাঁর হঠাৎ উদ্বেল হয়ে অনশনে বসে পড়াটা ছিল মুসলিম তুষ্টিকরণের চরম প্রকাশ। তাঁর অনশনের রাজনীতির এই হল আসল চেহারা।

মোপ্‌লা প্রসঙ্গ ছেড়ে এবার আসা থাক স্বামী শ্রদ্ধানন্দের নিহত হওয়া ও সেই ব্যাপারে গান্ধীর মুসলমান তোষণের আর এক ঘৃণিত প্রকাশ সম্পর্কিত আলোচনায়। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ছিলেন আর্য সমাজের একজন ধর্মপ্রচারক। তিনি হিন্দুধর্মের প্রচলিত পথের বাইরে গিয়ে ধর্মান্তরিত হিন্দুরা যাতে স্বধর্মে ফিরে আসতে পারে তার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। যেসব হিন্দু নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করে মুসলমান (বা খ্রিষ্টান ইত্যাদি) হয়েছিলেন, তারা যদি স্বেচ্ছায় তাদের বর্তমান ধর্ম ছেড়ে আবার হিন্দু হতে ইচ্ছা করেন, তবে একটা শুদ্ধিযজ্ঞের মাধ্যমে স্বামীজি তাঁদের পুনরায় হিন্দু করছিলেন। এই ফিরে আসাটা ছিল একেবারেই স্বেচ্ছা প্রণোদিত। এই নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রমটি ঘটেছিল গান্ধীর অনুরোধে। গান্ধীর জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিলাল বাবার উপর রেগে গিয়ে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হন। রাগের অনেক কারণ ছিল। তবে যে কারণটি অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়েছিল, তা হল, স্ত্রীর মৃত্যুর পর হরিলাল পুনর্বিবাহ করতে চেয়েছিলেন। গান্ধীর তাতে আপত্তি ছিল। তিনি মত দেননি। সেই রাগে তিনি ধর্মান্তর গ্রহণ করেন। হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই এই মন্ত্রের সবচেয়ে বড় সমর্থক গান্ধীর মাথায় আকাশ হয়তো ভেঙে পড়েনি এই ঘটনায়, তবে তিনি খুব চিন্তায় পড়েছিলেন। চিন্তায় পড়ে ছুটেছিলেন স্বামীজির কাছে। কাতর আবেদন জানিয়েছিলেন—ছেলেকে হিন্দুত্বে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য। শ্রদ্ধানন্দ ফিরিয়ে দেননি গান্ধীকে, যদিও, যে ধর্মান্তরগ্রহণ করবে তার অনুরোধ এবং ইচ্ছা ছাড়া তিনি শুদ্ধিযজ্ঞের ব্যবস্থাই করতেন না। তিনি হরিলালের সঙ্গে দেখা করলেন, কথা বললেন এবং তাঁর কাজে সফলও হলেন। এহেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ যখন নিহত হলেন, তখন গান্ধী কী করেছিলেন, সেটা আলোচনা করলে গান্ধী চরিত্রের আর এক গভীরতর অন্ধকার দিকের হদিশ আমরা পাব।

বলা বাহুল্য, স্বামীজির এই ধর্মান্তরকরণকে ভাল চোখে দেখল না মুসলমানরা। তারা চিরকাল অন্য ধর্ম থেকে ভাঙিয়ে নিয়ে নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়েছে। আর হিন্দু ধর্মের রক্ষণশীলতা এমন ভয়ংকর ধরনের ছিল যে, তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে হিন্দুত্ব থেকে বহিষ্কার করা হত, ফিরিয়ে আনার কথা স্বপ্নেও ভাবা যেত না। শ্রদ্ধানন্দ ধর্মের এই অচলায়তনে ঘা মেরেছিলেন। ফলে

মুসলমানরা যে সুযোগ পেলে প্রতিশোধ নিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে, এটা কোনও নতুন কথা ছিল না। সেই সুযোগ এসেও গেল।

হিন্দু ধর্ম ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে এক রমণী ধর্মান্তরিতা হন ও এক মুসলমানকে বিবাহ করেন। কয়েকটি সন্তানের মা হন। তারপর তার স্বামী অন্য এক মহিলাকে বিয়ে করেন। স্বামীর এই কাজে ক্ষিপ্ত হয়ে সন্তানদের নিয়ে ঘর ছাড়েন মহিলা। স্বামীজির সঙ্গে দেখা করে হিন্দুত্বে ফিরে আসার ইচ্ছা জানান। এই খবর পৌঁছে যায় মহিলার স্বামীর কাছে। তিনি আদালতে মামলা ঠুকে দেন স্বামীজির বিরুদ্ধে। অভিযোগ করেন, তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের অপহরণ করে আটকে রাখা হয়েছে। মামলায় শ্রদ্ধানন্দজি জিতে গেলেন। কেননা, মহিলা নিজে জবানবন্দি দিলেন যে তাঁদের আটকে রাখা হয়নি এবং তিনি স্বেচ্ছায় হিন্দুত্বে ফিরতে চান সন্তানদের নিয়ে। শুদ্ধিযজ্ঞের মাধ্যমে তাদের ইচ্ছাপূরণও হল। এই ঘটনার কয়েকদিন পর স্বামীজি অসুস্থ অবস্থায় তাঁর শয্যায় শুয়ে ছিলেন, তাঁকে দেখার ছল করে মহিলার স্বামী আব্দুল রশীদ এল সেখানে। অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল স্বামীজির ওপর। একের পর এক ছুরিকাঘাত করল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হল স্বামীজির। তারিখটা ছিল ১৯২৬ সালের তেইশে ডিসেম্বর।

এই হত্যার মাত্রই কয়েকটি দিন পর ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সম্মেলনে যোগ দিতে গৌহাটিতে যান গান্ধী। শ্রদ্ধানন্দজির মৃত্যুর কারণে চারদিকে তখন শোকের পরিমণ্ডল। সবাই ভেবেছিলেন, যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবেন গান্ধী। কিন্তু গান্ধীর শ্রদ্ধাঞ্জলির ভাষা শুনে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি তাঁর ভাষণের শুরুতেই ঘাতক আব্দুল রশীদকে 'ভাই আব্দুল রশীদ' বলে উল্লেখ করলেন। তারপর কেন তাকে এমন প্রেমের সঙ্গে সম্বোধন করলেন, তার কারণ ব্যাখ্যা করলেন বিশদ ভাবে। বললেন—"Now you will perhaps understand why I have called Abdul Rashid a brother, and I repeat it. I do not even regard him as guilty of Swami's murder. Guilty indeed are those who excited feeling of hatred against each other." অর্থাৎ একবার নয় বারংবার উনি আব্দুল রশীদকে 'ভাই' বলে ডাকবেন। তার কারণ, স্বামীকে খুন করে' সে কোনও অপরাধ করেনি। যারা পরস্পরের বিরুদ্ধে ঘৃণার আবহাওয়া সৃষ্টি করে, আসল অপরাধী তারাই। সরল অর্থে, স্বামীজির মৃত্যুর জন্য স্বামীজি নিজেই দায়ী। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর নীরবতা বুঝিয়ে দিল গান্ধীকে যে, তাঁর কথা কারও ভাল লাগেনি। অতএব একটা ছোট্ট ডিগ্‌বাজি খেলেন। স্বামীজির জন্য রক্ষিত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন পুস্তিকায় লিখলেন—তিনি বীরের মত বেঁচেছেন, মারাও গেছেন বীরের মত (He lived a hero.He died a hero)।

মুসলিম লীগ তৈরির প্রথম ও প্রধান কারণ ছিল মুসলমান হিসেবে নিজেদের জন্য আলাদা সংগঠন করা। কেননা, কংগ্রেসকে হিন্দুদের সংগঠন বলে মনে করত তারা। লীগের জন্মের সময় গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলেন। কিন্তু লীগের নাম ও রাজনৈতিক দর্শন বিষয়ে তাঁর কোনও ধারণা ছিল না, এমনটা ভাবার কারণ নেই। সব বিষয়ে তিনি অজস্র কথা লিখলেও মুসলিম লীগের সম্প্রদায়িক রাজনীতি নিয়ে একটা কথা কখনও লেখেননি। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির স্বার্থে মুসলমানদের দিক থেকেও যে কিছু করণীয় আছে, ভুলেও সে কথা কখনও উচ্চারণ করেন নি। তিনি মনে করতেন, সম্প্রীতি রক্ষার দায় ও দায়িত্ব হিন্দুদের। মুসলমানদেরও যে সমধিক দায়িত্ব আছে, সেকথা ঘুণাক্ষরেও বলেন নি। এই রাজনীতি হল তুষ্টিকরণের রাজনীতি। যার জন্য শুধু হিন্দুরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি, ভারতীয়তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আরও বড় কথা, যে সম্প্রীতির জন্য এই তোষামোদের রাজনীতি তিনি শুরু করেছিলেন, সেই সম্প্রীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। অথচ, এত সব করেও তাঁর ঘোষিত লক্ষ হিন্দু-মুসলমানকে এক রাখা, ভারতের ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল কি? একদম নয়। ইতিহাসের ভয়ংকরতম দাঙ্গা ঘটেছে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে, দেশ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। এই একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এসেও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘৃণার রাজনীতি দূর হয়নি। তার কারণ, গান্ধীর রাজনৈতিক শিষ্যরাই বর্তমানে নিয়ন্ত্রণ করছে দেশ। তাদের কাছে সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হল মুসলমানদের তোষণ করা। তাই ফৌজদারি দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে দেশ জুড়ে এক আইন চালু হতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিগত আইন (Personal Law) ও অন্যান্য দেওয়ানী বিধির ক্ষেত্রে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে তাদের নিজেদের ধর্মীয় আইনের শ্রেষ্ঠত্বকে। বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, ভরণপোষণের অধিকার ইত্যাকার নানান বিষয়ে দেশের আইনের বদলে মুসলমানদের ধর্মীয় আইন শরিয়ত গ্রাহ্য হয় দেশে। গান্ধীর কাছে এই তোষণের মূল কারণ ছিল সাম্প্রদায়িক একতার এক বায়বীয় ধারণা, আর তাঁর উত্তরাধিকারী সেকুলার রাজনীতিকদের কাছে এই কারণটি হল ভোটের রাজনীতি (এই প্রসঙ্গে মুসলমানদের নিয়ে যে রাজনীতি চলছে বর্তমানে এদেশে, এবং সেই রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে কিভাবে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের সত্যিকার উন্নতি ঘটতে পারে, সেই সম্পর্কে এই লেখকের 'প্রসঙ্গ মুসলমানদের উন্নয়ন ও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক' বইটিতে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে)।

গান্ধীর এই তুষ্টিকরণের রাজনীতির জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজমন্ত্র

হিসেবে যে সঙ্গীতটি ব্যবহৃত হয়েছিল, সেই 'বন্দে মাতরম'কে গ্রহণ করা হয়নি ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে। কারণ, এই গানে দেশকে মাতৃরূপে বন্দনা করা হয়েছে। এইজন্যে আপত্তি তুলেছিলেন মুসলমানরা। তাঁদের বক্তব্য ছিল—দেশ মাতৃকার বন্দনা মানে পৌত্তলিকতাকে মেনে নেওয়া। তাঁরা তা করতে পারেন না। আর আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্য কারো সামনে তাঁর মাথা নত করতেও পারেন না। আশ্চর্যের বিষয় হল, এই কথার প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা, সামান্যতম বোঝানোর চেষ্টাও করলেন না গান্ধী। একবারও মনে করলেন না যে, মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মত এমন মুসলমান নেতারাও ছিলেন যাঁরা কুণ্ঠাহীন ভাবে বন্দেমাতরম গাইতেন। আজও কমিউনিস্টরা এবং অন্যান্য দু একটি দল ছাড়া অন্যান্য দলের মুসলমান নেতাকর্মীরা সবার সঙ্গে গলা মিশিয়ে 'বন্দে মাতরম' গাইতে কোনও অস্বস্তি বোধ করেন না। সফলতা পেতেন কিনা সেটা অন্য প্রশ্ন, কিন্তু মুসলমানদের এ ব্যাপারে বোঝাবার একটু চেষ্টা অন্তত তিনি করতে পারতেন। তা কিন্তু তিনি ভুলেও করেন নি। তাঁর চরিত্রসুলভ যে কাজটি করার ছিল, তাই তিনি করেছিলেন। 'বন্দে মাতরম'কে ক্রমশ অপাংক্তেয় করে দিয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর যে কাজটি সম্পূর্ণ করেছিলেন তাঁর সবচেয়ে বড় ভাবশিষ্য জওহরলাল নেহরু।

দেশভাগের বিরুদ্ধে বলেছেন অনেক কথা। দেশকে ঐক্যবদ্ধ রেখে স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য তার প্রচেষ্টা যে আন্তরিক ছিল না, এমন কথা কেউ বলবে না। কিন্তু এই চাওয়া বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সোজা কথাটা সোজাভাবে না বলার জন্য। একদিকে বলছেন, তাঁর মৃতদেহের ওপর দিয়ে ভারত ভাগ হবে, পরক্ষণেই উল্টো কথা বলছেন—ভাগের দাবি তোলার অধিকার আছে মুসলমানদের। মুসলিম লীগের দেশভাগের দাবির সমালোচনা করে একটি অক্ষরও বেরোয়নি তাঁর কলম থেকে।

প্রাক্-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা-উত্তর সময়ের ভয়াল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়েও গান্ধী আশ্চর্যজনক ভাবে চুপ থেকেছেন। মুসলমানদের কোনও দোষ দেখতে পাননি। একটিবারের জন্যও তাদের মধ্যে মানবিকতা জাগাবার আহ্বান তো করেনই নি, উল্টে হিন্দুদের উদ্দেশে বলেছেন আক্রান্ত হলে কিভাবে অহিংস পদ্ধতিতে আত্মসমর্পণ করতে হবে। ১৯৪৬ সালে নোয়াখালির দাঙ্গা থেমে যাওয়ার পর গান্ধী সেখানে যান সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে। বেশ কিছুদিন ছিলেন সেখানে ক্যাম্প করে। ক্যাম্পের মাথায় এক কংগ্রেস কর্মী ভারতের ত্রিবর্ণলাঞ্ছিত পতাকা বেঁধে দিয়েছিল। এক সাধারণ মুসলমান এর প্রতিবাদ করে। বলে যে,

এই পতাকা তাদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী নয়, সুতরাং খুলে ফেলা হোক। আপত্তিটা করেছিল একটি মাত্র মুসলমান, দলবদ্ধ কোনও জনতা নয়। তাকে বোঝাবার চেষ্টাও করলেন না অসমসাহসী গান্ধী। প্রতিবাদ হওয়ামাত্র পতাকা নামিয়ে ফেলার নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন।

স্বাধীনতার পর ভারতের রাষ্ট্রভাষা কী হবে, এই বিতর্কের জন্ম দিয়েছিলেন গান্ধী। দেশের সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের ব্যবহৃত ভাষা ছিল হিন্দি। রাষ্ট্রভাষা হওয়ার দাবি ও যোগ্যতা ছিল তার। কিন্তু দেশভাগ হওয়ার পরেও সাম্প্রদায়িক তুষ্টিকরণের ভূত ছাড়েনি তাঁকে। ছাড়া তো দূরের কথা, এই ভূত ক্রমশ চেপে ধরছিল তাঁকে। এই চাপ ফুটে উঠল রাষ্ট্রভাষা নির্বাচনের প্রশ্নে। গান্ধী এক অদ্ভুত ফর্মূলা দিলেন। বললেন, ভারতের রাষ্ট্রভাষা হোক উর্দু, তবে লিপিটা হবে দেবনাগরী (বা হিন্দি)। তিনি এই ভাষার নাম দিলেন হিন্দুস্থানী। দেশবাসীর, বিশেষ করে হিন্দিভাষীদের পক্ষ থেকে ওঠা বিপুল প্রতিরোধের সামনে পড়ে গান্ধীর এই প্রস্তাব অবশ্য ফলপ্রসূ হয়নি। প্রসঙ্গত, উর্দু ভাষার ওপর এই বলাৎকারের চেষ্টা মুসলমানরাও পছন্দ করেনি।

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে যখন পশ্চিম পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখদের ওপর অত্যাচার নেমে এসেছে, লক্ষ লক্ষ শরণার্থী দেশত্যাগ করে ভারতে চলে আসছে, তখন দিল্লির এক শরণার্থী শিবিরে একদিন পরিদর্শনে গেলেন গান্ধী। সেখানে শরণার্থীরা তাদের মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতার কথা বলল গান্ধীকে। গান্ধী তার উত্তরে বললেন—'মুসলমানরা যদি হিন্দুদের অস্তিত্বও ধ্বংস করে দিতে চায়, তবুও হিন্দুদের ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নয়। আক্রমণকারীর অস্ত্রের সামনে বীরের মত মাথা নত করে দেওয়া উচিত।' এটুকু বলেই ক্ষান্ত হলেন না, আবার গীতার শ্লোকও আউড়ে দিলেন—'জন্ম এবং মৃত্যু সবই তো পূর্বনির্দিষ্ট। তাহলে মৃত্যুর কথা ভেবে দুঃখ পাব কেন?'

দেশভাগ হওয়ার পর মাউন্টব্যাটেন ও নেহরু দৃঢ়ভাবে চেয়েছিলেন যে, ধর্মের ভিত্তিতে যখন দ্বিখণ্ডিত হল দেশ, তখন ধর্মের ভিত্তিতে জন-বিনিময় সম্পূর্ণ হোক। হিন্দুরা ভারতে থাকুক, মুসলমানরা থাকুক পাকিস্তানে। গান্ধী বিরোধিতা করলেন এই প্রস্তাবের। মুসলমানদের উদ্দেশে ঘোষণা করলেন—তারা পাকিস্তানে না গিয়ে ভারতে থাকতে পারে। এদেশ তাদেরও।

প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, তাই যদি হবে, তবে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের দাবি কেন উঠেছিল, আর কেনই বা দেশকে ভাগ করতে হয়েছিল। সে প্রশ্ন না হয় সম্প্রীতির স্বার্থে তুললাম না। কিন্তু যে মহানুভবতা ও মানবিকতা নিয়ে

গান্ধী এই কথা বলেছিলেন, পাকিস্তানে তখনও পর্যন্ত থেকে যাওয়া সামান্যসংখ্যক হিন্দুদের উদ্দেশে যে বাণী তিনি বিতরণ করেছিলেন, তা দেখলে তাঁর চরিত্রের ধান্ধাবাজি পরিষ্কার হবে। তিনি বলেছিলেন—'তারা ভারতে আসবে কেন ? তারা সেখানে থেকে মরবে না কেন ?.....যদি পাকিস্তানের হিন্দুদের ওপর অত্যাচার নেমে আসে, যদি মরতেও হয় তাদের, তারা সাহসের সঙ্গে ভগবানের নাম উচ্চারণ করতে করতে মরবে।'

মুসলমান আক্রমণকারীদের দ্বারা হিন্দু মেয়েদের ধর্ষণ হলে হিন্দুরা কী করবে সে প্রসঙ্গে তাঁর বাণী—'মা-বোনের ইজ্জত যে লুট করেছে, তার পায়ে চুমু খাবে হিন্দু পুরুষ।' কারণ ? মুসলমানরা তো হিন্দুদেরই ভাই। ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের চিন্তাও মহাপাপ।

দেশভাগের পর কয়েক কোটি মানুষের বাস্তুচ্যুতির পর, কয়েক লক্ষ মানুষ নিহত হওয়ার পর, নির্বিচার ধর্ষণ ও ধর্মান্তরকরণের পরেও তোষণের ভূত গান্ধীর ঘাড় থেকে নামে নি। আবারও তাঁর মাথায় তথাকথিত সম্প্রীতির পোকা নড়ে উঠল। তিনি ঠিক করলেন, পঞ্চাশ জনের এক দল নিয়ে পাকিস্তানে যাবেন। পাকাপাকি ভাবে থাকবেন সেখানে। থেকে সম্প্রীতির জন্য কাজ করবেন। মাথায় এই ভাবনা অসামাত্র চিঠি লিখলেন জিন্নাহ্‌কে। জিন্নাহ্ লুফে নিলেন এই প্রস্তাব। সারা পৃথিবী ততদিনে জেনে গিয়েছে পাকিস্তানের হিন্দুদের ওপর নেমে আসা অবর্ণনীয় অত্যাচারের কথা। এই পরিস্থিতিতে গান্ধী সেখানে গেলে দেখানো যাবে যে, সম্প্রীতি রক্ষার জন্য পাক সরকারও কত চেষ্টা করছে। এছাড়া ছিল ভারতের কাছ থেকে আর্থিক দাবি-দাওয়া আদায় হওয়ার সম্ভাবনা। গান্ধীর উপস্থিতিকে দাবার চাল হিসেবে ব্যবহার করা যেত। অনুমতি দিতে তাই একটুও সময় নিলেন না জিন্না। ঠিক হল, ১৯৪৮ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি গান্ধী তাঁর দল নিয়ে পাকিস্তানে যাবেন।

কিন্তু তার আগে এল ৩০শে জানুয়ারি। নাথুরাম গড্‌সের হাতে প্রাণ গেল গান্ধীর। গড্‌সে কেন হত্যা করেছিলেন গান্ধীকে ? এর পিছনেও ছিল তোষণের রাজনীতি। পাকিস্তানকে পঞ্চান্ন কোটি টাকা দিয়ে দিতে হবে, দিল্লির মসজিদ থেকে পাকিস্তান-প্রত্যাগত হিন্দুদের হঠিয়ে দিতে হবে, দেশ থেকে চলে যাওয়া মুসলমানদের সসম্মানে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এই দাবিগুলি নিয়ে আমরণ অনশনে বসে ছিলেন গান্ধী। ছয় দিনের মাথায় সরকার তাঁর সব দাবি মেনে নেয়।

এই ঘটনা ছিল বারুদের স্তূপে আগুনের শলাকা সংযোগের মত। গড্‌সের

ও তাঁর সঙ্গীদের মনে হয়েছিল, এই মানুষটি যথেষ্ট ক্ষতি করেছেন এই দেশের, আর এঁকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। সুতরাং......

গান্ধীর মৃত্যু হয়েছে কিন্তু তাঁর পুঁতে যাওয়া তোষণের রাজনীতি স্বরূপ চারা গাছটি আজ বড়সড় বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। যতদিন যাচ্ছে, ততই আমরা ধর্মনিরপেক্ষতার সত্যকারের পাঠ ভুলে তুষ্টিকরণের রাজনীতির পাঠ পড়তে ও পড়াতে ব্যস্ত হচ্ছি। এই আত্মঘাতী রাজনীতি দেশকে কী ভীষণ দুরবস্থার মধ্যে ফেলবে, আরও কত টুকরোতে বিভক্ত করবে এই দেশকে, সেটা দেখতে এখনও বেশ কিছু সময় হয়তো লাগবে, হয়তো সেদিন আমরা থাকব না। কিন্তু আমাদের উত্তরপুরুষরা থাকবে। এইভাবে যদি চলতে থাকে দেশ, সেদিন কিন্তু ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না।

গান্ধী কি আদৌ ব্রিটিশ-বিরোধী ছিলেন?

অহিংসার প্রবল সমর্থক হলেও দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন সময়ে বোয়ার যুদ্ধে (১৮৯৯-১৯০১) ও জুলু উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে (১৯০৬) গান্ধী সক্রিয়ভাবে ব্রিটিশদের সমর্থন করেন। এই সমর্থনের মূল্য হিসেবে সরকার তাঁকে পুরস্কৃতও করে। আশা করা গিয়েছিল যে, এর পর থেকে গান্ধী যে আন্দোলনই করবেন, কিঞ্চিৎ দরকষাকষি করে সরকার তা মেনেও নেবে। এটা যে একেবারে হয়নি, তা নয়। এক-আধটা অকিঞ্চিৎকর দাবি মেনেও নিয়েছিল সরকার। যেমন, পোস্টাপিসে প্রবেশের জন্য ভারতীয়রা শুধুমাত্র ব্যবহার করবে এমন একটা দরজার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। কিন্তু যে বিষয়গুলি প্রশাসনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সেরকম কোনও বিষয়েই তাঁর কোনও দাবি মানে নি সরকার। কালক্ষেপ করেছে আলোচনার নামে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তারপর যথারীতি প্রতিশ্রুতি ভেঙেছেও। যেহেতু গান্ধীর আন্দোলন ছিল অহিংস, কোনওরকম ভয়ের কারণ থাকত না তার মধ্যে, সেইহেতু এই 'আলোচনা' নামক ছেলেখেলা চালিয়ে যেতে কোনও অসুবিধা ছিল না সরকারের। সেই আলোচনা যখন ফলপ্রসূ হত না, তখন অবনত মস্তকে তা মেনে নিতেও দ্বিধা করতেন না গান্ধী। বড় জোর আবার একটা আন্দোলনের ডাক দিতেন। সেই ডাকে 'ছোবল' তো থাকতই না, এমন কি 'ফোঁস' টুকুও দেখা যেত না। কিন্তু এই সোজা পথের রাজনীতিতে বিঘ্ন এসে গেল। গান্ধীর এই নরমপন্থা বা আত্মসমর্পণের পন্থায় আস্থা রাখতে পারল না সেখানকার প্রবাসী ভারতীয়দের একটা বড় অংশ। তাদেরই মধ্যকার কয়েকজন ক্ষুব্ধ মানুষ গান্ধীকে আক্রমণ করল একদিন। প্রচুর

মারধোর করল। এতটাই আহত হলেন গান্ধী, যে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হল। যিনি তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করেছিলেন ও সেবা শুশ্রূষা করে তাঁকে সুস্থ করেছিলেন, সেই পাদ্রী সাহেবের বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও গান্ধী তাঁর আততায়ীদের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ জানালেন না। এই ঘটনা পাদ্রী সাহেবকে এতটাই মুগ্ধ করেছিল যে, তিনি গান্ধীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে শুরু করেন ও খুব তাড়াতাড়ি গান্ধীর একটি জীবনী লিখে ফেললেন এবং সেখানে গান্ধী সম্পর্কে বললেন যে খ্রিষ্টের পর তিনিই পৃথিবীর মহত্তম মানুষ। অনেকেই সন্দেহ করেন যে, এত অল্পদিনের পরিচয়ে এই যে জীবনী লেখা হল তার পিছনে ব্রিটিশ সরকারের প্রচ্ছন্ন মদত ছিল। তারা চাইছিল সেখানকার ভারতীয়দের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধাতে ও একজন নখদন্তহীন নেতা যিনি সামনে থেকে এমন একটা আন্দোলন পরিচালনা করবেন, যেখানে সরকারের চিন্তা থাকবে না তেমন একজন নেতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে। তারা এটাও বিশ্বাস করত যে, গান্ধী না থাকলে আন্দোলনের অভিমুখ হিংসার পথে চলে যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে নেতৃত্ব দখল করে নিতে পারে এমন লোকজন যারা গান্ধীর মত অতটা অহিংস পথের যাত্রী নন। তাই একদিকে গান্ধীর অহিংস আন্দোলনকে বিশাল করে দেখিয়ে ও তাঁর সম্পর্কে লেখালেখি করে মহামানব বানাবার চেষ্টায় মদত যেমন দিতে থাকল তারা, তেমন গান্ধীকে নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক পরিকল্পনাও নিয়ে ফেলল। মাঝে মধ্যে গান্ধীকে জেলে ঢোকাতে লাগল, জেল থেকে বার করতে থাকল। আর এইসব কাজ এমনভাবে করতে থাকল যাতে গান্ধীর নেতৃত্বের গায়ে কালি লাগে। যেমন, একই অপরাধে একদল সত্যাগ্রহীকে এক বছরের কারাদণ্ড হয়তো দেওয়া হল, গান্ধীর ক্ষেত্রে কিন্তু দণ্ডের মেয়াদ রাখা হল তিন মাস। অনেক সময় সেই মেয়াদটুকুও জেলে কাটাতে হত না, তার আগেই মুক্তি পেয়ে যেতেন। ব্যাপারটা যে অন্য সত্যগ্রহীদের চোখে লাগত না, এমন নয়। তারা সন্দেহও করতে লাগল গান্ধীকে। এই সময়ে এল ইমিগ্রেশন রেগুলেশন অ্যাক্ট, ১৯১৩ এবং ভারতীয়দের ওপর তিন পাউণ্ড করে ট্যাক্স ধার্য করার ঘটনা। গান্ধী সত্যাগ্রহ শুরু করলেন বটে, তবে সরকার পাত্তা দিল না। ধরপাকড় চালাতে থাকল। গান্ধীকেও গ্রেফতার করা হল। এইসময় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। গান্ধী যে ব্রিটিশের রাডারে ভালভাবেই আছেন, সেটা বোঝা গেল একটি ঘটনায়। গান্ধীর সঙ্গে সেখানকার সরকারের আলোচনায় মধ্যস্থতা করতে এলেন লর্ড হার্ডিঞ্জ। তিনি তখন ভারতের ভাইসরয়। তাঁর মধ্যস্থতায়, আলোচনা শুরু হল। ছয় মাস ধরে, চলল আলোচনা। তারপর প্রায় অর্থহীন একটা চুক্তি হল প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্তা জেনারেল স্মাট্সের সঙ্গে। ভারতীয়রা

এত ক্ষেপে গেল গান্ধীর ওপরে যে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে পালানো ছাড়া তাঁর সামনে আর কোনও রাস্তা খোলা রইল না।

ইংরেজ এই সুযোগের অপেক্ষা করছিল। গান্ধীকে প্রস্তাব দিল দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে ভারতে পাকাপাকি ভাবে চলে আসতে। এবং আসার আগে ইংলণ্ডে এসে শাসকের সঙ্গে কথা বলে যেতে। কস্তুরবাকে নিয়ে গান্ধী চলে এলেন লণ্ডন। বেশ কয়েকটি দিন থাকলেন তারপর সেখান থেকে জাহাজে চেপে সোজা ভারত। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর নামযশ সেই সময়ে এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে, আর সেদেশের মাটিতে পা রাখতে ভরসা হয়নি। ১৯১৫ সালের জানুয়ারিতে ভারতে এলেন গান্ধী।

অতএব ইংরেজের ডাকে এবং ইংরেজের ব্যবস্থাপনায় গান্ধী ভারতে ফিরলেন— সেটা বোঝা গেল। কিন্তু ঠিক এইরকম সময়ে তাঁকে নিয়ে আসার পিছনে ইংরেজের কী উদ্দেশ্য ছিল ?

প্রথম উদ্দেশ্য, ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে ক্রমশ বাড়তে থাকা সহিংস বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন করার জন্য বিকল্প একটি রাজনীতিকে সামনে নিয়ে আসা। যে রাজনীতিকে ভয় না পেলেও চলবে।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে নরমপন্থী বনাম চরমপন্থীদের লড়াইয়ে নরমপন্থীদের শিবিরকে শক্তিশালী করা। মনে রাখতে হবে যে, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে ছাড়া কংগ্রেসের বড় নেতাদের মধ্যে ব্যাপক অংশ তখন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াইয়ে নামার পক্ষে ছিলেন।

এবং তৃতীয় উদ্দেশ্য, বিশ্বযুদ্ধের (প্রথম) সময়ে ভারত থেকে সৈন্য সংগ্রহে যাতে অসুবিধা না হয়, তার ব্যবস্থা। প্রসঙ্গত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তার সামান্য সময় পরে শুরু হয়।

বলা বাহুল্য, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এই তিনটি উদ্দেশ্যই সফল হয়েছিল ইংরেজের। সরকারি ব্যবস্থাপনায় আহ্বান করা গান্ধীর আন্দোলন যেমন একদিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল ও কংগ্রেসের মধ্যকার নরমপন্থাকে শক্তিশালী করল, তেমনই যুদ্ধের জন্য সৈন্যসংগ্রহের আহ্বানেও সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন গান্ধী।

এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার পিছনে একটা দৃঢ় বিশ্বাসও কাজ করেছিল তাঁর মধ্যে। পৃথিবীর সমস্ত সাম্রাজ্যবাদের থেকে ব্রিটিশকে আলাদা চোখে দেখতেন তিনি। তিনি স্পষ্টভাবে বলতেন—ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তুলনাহীন। তার কারণ, এই সাম্রাজ্য শুধু জাগতিক ভিত্তির ওপর স্থাপিত নয়, এই সাম্রাজ্যের ভিত্তি

আধ্যাত্মিক। "Though empires have gone and fallen, this empire may perhaps be an exception. It is an empire not founded on material but on spiritual foundations..........the British Coustitution. Tear away those ideals and you tear away my loyalty to the British constitution, keep those ideals and I am ever a bondsman") ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভক্তির বহর এই উক্তিতে পরিষ্কার ভাবে যে ফুটে ওঠে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, এসব কথা গান্ধী যখন লিখছেন, তখন তিনি অল্পবয়সী তরলমতি যুবা নন, তাঁর বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ বছর এবং তাঁর তথাকথিত সংগ্রামী জীবনের বয়সও বিশ বছর অতিক্রান্ত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই ভূয়সী গুণকীর্তনে সেকালের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ১৮৮৪ সাল থেকে ভারতের স্বাধীনচেতা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় মনে করত আর্থিক দস্যুতার জন্য ইংরেজ ভারত শাসন করছে। মনে করত যে এদেশের সম্পদ লুঠ করে নিয়ে যাওয়ার জন্যই কায়েম রয়েছে ব্রিটিশ শাসন। ১৮৮৪ সালের ২০শে মে সিন্ধ টাইম্‌স্ পত্রিকায় লেখা হয়েছিল—"Nadir shah looted the country only once. But the British loot us everyday. Every year wealth to the tune of 4.5 million dollar is being drained out, sucking our very blood. Britain should immediately quit India." মনে রাখা দরকার এই লেখা প্রকাশিত হওয়ার এক বছর পরে (১৮৮৫ সাল) ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারও সাতান্ন বছর পরে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্টের ডাক দেন গান্ধী।

কিন্তু ১৯১৪ সালে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ যে পথে ও যে গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল, গান্ধীর অবস্থান তার থেকে বহুদূরে ছিল। তিনি তখন ব্রিটিশের মোহমুগ্ধ ছিলেন। সুদূর আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়াতে পাঞ্জাবের অনাবাসী কৃষকরা গদর পার্টি তৈরি করে লড়াইয়ে নেমেছিল ১৯১৩ সালে, গান্ধী তার প্রবল বিরোধিতা করেছেন। ভারতে লালা লাজপত রায়, বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল (লাল-বাল-পাল) যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ভারতের অগ্রগতির পথে অন্তরায় মনে করে স্বাধীনতার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে বলছেন, তখন ব্রিটিশের গুণকীর্তন করে গান্ধী যা করলেন, তাকে আর যাই হোক স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা যায় না।

যদিও গান্ধী সব ব্যাপারে যে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রশংসা করতেন তা

নয়, কিছু কিছু ব্যাপারে সমালোচনাও করতেন। কিন্তু সেই সমালোচনার ভাষা ও ভঙ্গি হত অনুগত দেশীয় রাজন্যবর্গের অনুনয় বিনয়ের মত। এই পরিস্থিতিতে এল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। অহিংসার পূজারী, সরকারি প্রচারধন্য ভারতের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাত্মাটি এই যুদ্ধে ব্রিটিশকে সাহায্য করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অশিক্ষিত অনাবাসী পাঞ্জাবী কৃষকদের নিয়ে তৈরি গদর পার্টি পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিল যে, এই বিশ্বযুদ্ধ একটি অভাবনীয় সুযোগ এনে দিয়েছে ভারতবাসীর সামনে। স্বাধীনতা পাওয়ার সুযোগ। কিন্তু গান্ধী অন্য হিসাব করলেন। তিনি ব্রিটিশের সঙ্গে একাত্ম হলেন। ১৯১৮ সালের এপ্রিল মাসে ভারতের ভাইসরয় গান্ধীকে আমন্ত্রণ জানালেন দিল্লির conference-এ অংশ নেওয়ার জন্য। গান্ধী অংশ নিলেন আলোচনায়। সেখানে স্থির হল, ভারতীয়দের কাছে তিনি আবেদন জানাবেন যুদ্ধে নাম লেখাবার জন্য। পরিবর্তে ব্রিটিশ আশ্বাস দিল, ভারতের স্বাধীনতার কথা তারা বিবেচনা করবে। বুদ্ধিমান পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, এই আশ্বাস ছিল শুধু কথার কথা। আসল উদ্দেশ্য ছিল সৈন্যসংগ্রহ। কার্যক্ষেত্রে ব্যাপারটা সেরকমই ঘটেছিল। বোয়ার যুদ্ধ এবং জুলু যুদ্ধে গান্ধীর লোকজন অ্যাম্বুলেন্স বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল, এখানে কিন্তু গান্ধী আহ্বান জানালেন লড়াইয়ের জন্য সৈনিক সংগ্রহে। ১৯১৮ সালের জুনে তিনি একটি প্রচারপত্র দ্বারা আহ্বান জানালেন। শিরোনাম ছিল—Appeal for Enlistment। এই আপীল বা আবেদনে যে ভাষা তিনি ব্যবহার করলেন, তা অহিংসা বিষয়ে তাঁর ঘোষিত অবস্থানের এক শ' আশি ডিগ্রি উল্টো দিকে। তিনি লিখলেন—"To bring about such a state of things we should have the ability to defend ourselves, that the ability to bear arms and to use them.....If we want to learn the use of arms with the greatest possible dispatch, it is our duty to enlist ourselves in the army." সমস্ত গান্ধী রচনা জুড়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে অহিংসার শক্তি, প্রেমের শক্তি এমন কি হত্যা করতে এলে শত্রুর সামনে নিজেকে নিরস্ত্রভাবে সমর্পণের কথা। কিন্তু কী আশ্চর্য! এখানে গান্ধী বললেন অস্ত্র নিয়ে নিজেকে রক্ষা করার কথা। কারণ, এখানে নিজেকে রক্ষা করার কথা, নিজের ঘরের মা-বোনদের আব্রু রক্ষা করার কথা, নিজের সন্তান সন্ততিদের বাঁচাবার কথা নেই, আছে ব্রিটিশ জাতি ও তাদের সাম্রাজ্যকে বাঁচাবার কথা। ভণ্ডামির এখানেই শেষ নয়। এর পরে আবার সাধু সাজার জন্য বলছেন—ব্যক্তিগতভাবে যদিও আমি কাউকে আঘাত করা বা হত্যা করার বিরুদ্ধে। তা সে বন্ধু হোক বা শত্রু।

গান্ধীভক্তরা গান্ধীর এই কাজ নিয়ে আলোচনা করতে চান না। বলেন,

ভারতের স্বাধীনতার জন্যই নাকি সেসময় আদর্শচ্যুত হয়েছিলেন গান্ধী। কারণ, শয়নে-স্বপনে-জাগরণে ভারতের স্বাধীনতাই নাকি তাঁর কাম্য ছিল। তাঁদের পাল্টা প্রশ্ন করাই যায়—সেই স্বাধীনতা কি এসেছিল যুদ্ধের পর ? আসে নি। এই ঘটনার পরেও অপেক্ষা করতে হয়েছিল প্রায় আঠাশ বছর। স্বাধীনতা এসেছিল উনিশ শ' সাতচল্লিশে আর তার জন্য গান্ধীর কোনও ভূমিকা ছিল না। কারণ, ১৯৩৫-এর পর থেকে গান্ধী বা কংগ্রেস এমন কোনও আন্দোলন করেনি যে, লেজ গুটিয়ে পালাতে ব্যস্ত হয়েছিল ব্রিটিশ সিংহ।

কিন্তু প্রশ্নটা অন্যত্র। যে গান্ধী বলতেন, অহিংসাই সত্য এবং সত্যের জন্য তিনি সবকিছু ত্যাগ করতে পারেন, তিনি এমনভাবে হিংসার পক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কেন ? এর কারণ, না ঝাঁপিয়ে উপায় ছিল না তার। কেননা, ব্রিটিশের সঙ্গেই যুক্তি করেই তিনি ফিরে এসেছিলেন ভারতে।

গান্ধীর বন্ধু চার্লি এ্যাণ্ড্রুজ পর্যন্ত গান্ধীর এবম্বিধ কাজের কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাননি। তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন—Personally I have ever been able to reconcile this with his own conduct in other respects, and it is one of the points where I have found myself in painfull disagreement." অহিংসার সঙ্গে এই যুদ্ধের ভাবনার মিল খুঁজে পাননি বলে দুঃখ পেয়েছেন তিনি, কিন্তু এই বিষয়টিই আবার গান্ধীর অহিংসা প্রীতির সততা নিয়ে প্রশ্নও তুলে দিয়েছে। গান্ধীর এক ব্যক্তিগত সচিব এই প্রশ্নের কথা স্বীকারও করেছেন। তিনি লিখেছেন—"অহিংসার প্রতি তাঁর তুমুল আগ্রহ ও আদর্শগত দৃঢ়তার সঙ্গে সৈন্যসংগ্রহে তাঁর ভূমিকাকে কখনও মেলানো যায় না। এই প্রশ্ন যে সেই সময়েই শুধু উঠেছিল, তা নয়, এই প্রশ্ন আজও সমানে উঠছে।"

কিন্তু যুদ্ধে সৈনিক হিসেবে নাম লেখাবার আহ্বান জানিয়েই গান্ধী ক্ষান্ত হননি। ফ্রান্সে এবং মেসোপটেমিয়াতে নিজে সৈনিক হিসেবে যাওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন। এ সম্পর্কে গান্ধীর বিখ্যাত জীবনীকার মার্টিন গ্রীন বলেছেন—"Gandhi himself had twice volunteered for service in this war, in France and in Mesopotamia, because he had convinced himself that be owed the empire that sacrifice in return for its military protection." (Gandhi : Voice of a New Age Revolutionary Page 267)।

বলা বাহুল্য, গান্ধীর এই ভোলবদলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ যে হয়নি, তা নয়। একবার এক সৈনিক সংগ্রহ মেলায় গান্ধী যখন ভাষণ দিচ্ছেন সৈন্য সংগ্রহের ও যুদ্ধ বণ্ড (War Loan Bond) বিক্রয়ের সপক্ষে, তখন

সেখানে উপস্থিত ডা. তুলজারাম খিলনানী তাঁর জোরদার বিরোধিতা করেন। কংগ্রেসের বহু সদস্যই তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলেন। আর গদর পার্টির তো কথাই নেই। তারা গান্ধীকে সহ্যই করতে পারত না।

চৌরিচৌরা সত্যাগ্রহ হিংসাশ্রয়ী হয়ে ওঠায় সত্যগ্রহ তুলে নেন গান্ধী। এই তুলে নেওয়াটা এমন এক সময়ে হয়েছিল যখন ব্রিটিশের নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম। বলা বাহুল্য, হিংসার দোহাই দিয়ে চূড়ান্ত লগ্নে পৌঁছে আন্দোলন প্রত্যাহার করায় লাভবান হয়েছিল ব্রিটিশ। তৎকালীন কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতারা, যেমন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, লালা লাজপত রায় তখন কারারুদ্ধ। কারান্তরালে থেকে তাঁরা প্রতিবাদে ফুঁসে উঠেছিলেন।

আন্দোলনের মোক্ষম সময়ে একটা না একটা দোহাই দিয়ে পিছিয়ে আসাটা ছিল গান্ধীর বিশেষ ট্রেড মার্ক। তাঁর এই সমস্ত কাজের ফলে লাভবান হয়েছে ব্রিটিশরাজ। এই প্রসঙ্গে অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়। তাতে বইয়ের কলেবর কেবল বাড়বে। তাই আর একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করে শেষ করব গান্ধীর ব্রিটিশ প্রেম।

ঘটনাটা জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড। সারা পৃথিবী ফুঁসে উঠেছিল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এই ঘটনায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ত্যাগ করেছিলেন তাঁর নাইট উপাধি। আর গান্ধী কী করেছিলেন? তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার নিন্দা তো করেনই নি, বরং নিন্দা করেছিলেন পরবর্তী ঘটনাক্রমের—যখন স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়ায় মানুষ নিজেদের হাতে আইন তুলেছিল। এর পরে যদি কেউ তাঁকে ব্রিটিশের চর বলে অভিহিত করে, খুব কি অন্যায় হবে?

স্বাধীনতা যুদ্ধে গান্ধীর আদৌ বিরাট কোনও ভূমিকা ছিলনা

সৎ ইতিহাসবিদের চোখ দিয়ে দেখলে এটা দেখতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, ভারতের স্বাধীনতার পশ্চাতে গান্ধীর অবদানের চেয়ে অনেক বেশি অবদান ছিল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর। যদিও স্রেফ রাজনৈতিক কারণে ও প্রচারের ঢক্কা নিনাদে নেতাজি চাপা পড়ে গেছেন, তাঁর কৃতিত্বকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেই জায়গায় গান্ধীকে সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক ভাবে যাবতীয় কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছে। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ রমেশ চন্দ্র মজুমদার এই ব্যাপারটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে এবং তথ্যপ্রমাণ সহ প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁর বইয়ে। কিন্তু

আরও বড় প্রমাণ উঠে এল তাঁর মৃত্যুর পরে। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তথা অস্থায়ী রাজ্যপাল ফণিভূষণ চক্রবর্তীর সঙ্গে এক আলাপচারিতায় ব্রিটেনের একদা প্রধানমন্ত্রী লর্ড এট্‌লী জানিয়েছিলেন যে সুভাষচন্দ্র বোসের আজাদ হিন্দ ফৌজ বা ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির অভিঘাতই ব্রিটিশকে বাধ্য করেছিল ভারতকে স্বাধীনতা দিতে। কেননা, আই এন এ ভাঙন ধরিয়েছিল ভারতে ব্রিটিশবাহিনীর মনোবল ও আনুগত্যে। ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের কোনও ভূমিকা ছিল কিনা—এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে লর্ড এটলী জানিয়েছিলেন যে সেই আন্দোলনের ততদিনে মৃত্যু ঘটেছে, সুতরাং তাকে নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু ছিল না। এরপর গান্ধীর ভূমিকা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে বাঁকা হেসে তিনি জবাব দিয়েছিলেন—এ ব্যাপারে গান্ধীর ভূমিকা ছিল যৎসামান্য।

স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে সচেতন ভাবে অনুল্লেখিত রাখা হল এইসব ঘটনা, পরিবর্তে গান্ধীকে তুলে দেওয়া হল এক বিপুল উচ্চতায়, যার যোগ্য তিনি নন। এই আচরণই প্রমাণ করে যে, নেহরু-গান্ধীর খাসতালুক ভারতের জাতীয় কংগ্রেস অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হিসেবে দেখেছে সুভাষচন্দ্রকে। আর তাদের আজ্ঞাবহ ঐতিহাসিকরা স্বাধীনতা যুদ্ধের এক মিথ্যে কাহিনি প্রচার করে চলেছে ক্লান্তিবিহীন ভাবে। কিন্তু ঐতিহাসিক বাস্তবতার স্বার্থে সেই মুখোশ খুলে দেওয়ার সময় এসেছে। সময় এসেছে গান্ধীকে তাঁর বিপুল উচ্চতা থেকে নামিয়ে তাঁর যথাযোগ্য আসনে বসানো। এটা করতে গেলে স্বাধীনতা যুদ্ধে গান্ধীর কী ভূমিকা ছিল, কী তিনি করেছেন সেই আলোচনা সবার আগে করা দরকার।

১৯১৫ সালের জানুয়ারি মাসে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে আসেন গান্ধী অবশ্য সোজা পথে নয়, ভায়া ইংলণ্ড। তাঁর এই বিলেত ঘুরে দেশে আসার ব্যাপারে অনেক সন্দেহ অনেকে প্রকাশ করেছেন। এই বইয়ের অন্যত্র সে সম্পর্কে বলেছি। গান্ধী যখন ফিরে এলেন, তখন ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ নরমপন্থা, গরমপন্থা, উগ্রপন্থা ইত্যানি নানা খাতে বইছিল। গোপাল কৃষ্ণ গোখলে ছিলেন নরম বা উদারপন্থীদের নেতা। পরে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন গান্ধী ও জিন্না। আর অন্য মতের নেতা ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। তিনি রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার পর নেতৃত্বে এলেন লাল-বাল-পাল, অর্থাৎ লাজপত রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক ও বিপিন চন্দ্র পাল। নরম বা উদারপন্থীরা বিশ্বাস করত ব্রিটিশের কাছে অনুনয় বিনয় করে দেশশাসনের ক্ষমতার কিছুটা অন্তত আদায় করতে। তাঁরা স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য ব্যস্ত ছিলেন না। অন্যদিকে যাঁরা চরমপন্থায়

বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁরা চাইতেন প্রয়োজনে সশস্ত্র পথে সংগ্রাম করে, ব্রিটিশকে তাড়ানো হবে দেশ থেকে। তাঁদের পক্ষে বড় অস্ত্র ছিল সরকার কর্তৃক প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে দেওয়া স্বাধীনতা বিষয়ক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার ঘটনা। প্রসঙ্গত এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে গান্ধী অর্থ, সৈন্য ইত্যাদি সমস্ত কিছু সাহায্য দিয়ে প্রত্যক্ষ সমর্থন করেছিলেন ব্রিটিশ সরকারকে। গান্ধীর এই সমর্থনদান ছিল তিলকের Responsive cooperation-এর বিরোধী মতবাদ। এই সম্পর্কে রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেছেন—Its essence was to aceept and work the reforms that were offered, and carry on mass agitation for more and more until the goal (of freedom) was attained। গান্ধী কংগ্রেসের এই ঘোষিত পথ পাল্টে দিলেন। তিনি ব্রিটিশকে আক্ষরিক অর্থেই পূর্ণ সমর্থন জানালেন এবং সমস্ত রকম আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর কিছুই না পেয়ে গান্ধীর স্বপ্নভঙ্গ হল। ব্রিটিশকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়ার কথা ভাবলেন। এই সময় খিলাফত আন্দোলন শুরু হল। গান্ধী তাঁর ম্রিয়মান রাজনৈতিক ক্ষমতা বাড়াবার জন্য খিলাফত আন্দোলনকে স্বাধীনতা সংগ্রামের আর এক নাম হিসেবে ঘোষণা করলেন। মুসলমানদের নিয়ে ধর্মীয় রাজনীতি শুরু করলেন। এই প্রসঙ্গে বলা ভাল যে, খিলাফত আন্দোলনের আসল চেহারাটা জানতেন জিন্না। তিনি এই আন্দোলনকে সমর্থন করেন নি। কিন্তু গান্ধী কিছুটা ব্রিটিশের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য রাগে এবং কিছুটা নিজের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বাড়াবার জন্যে সাম্প্রদায়িকতা নামক বাঘের সওয়ারী হলেন।

কিন্তু এই আন্দোলনও মাঠে মারা গেল। তবে মারা যাওয়ার আগে একটা ভয়ংকর কুৎসিত ঘটনা ঘটাল। কেরালার মালাবার অঞ্চলে 'মোপলা' মুসলমানরা আক্রমণ করল ব্রিটিশকে। হঠাৎ আক্রমণে ব্রিটিশ পিছু ফিরতে আক্রমণ নেমে এল হিন্দুদের ওপর। খুন-ধর্ষণ-বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ এবং সম্পত্তির এমন যথেচ্ছ লুণ্ঠন ব্রিটিশ ভারতে সেই প্রথম। এর বিরুদ্ধে গান্ধীর মুখ দিয়ে একটা কথা বেরোল না। তবে তাতে যে মুসলমানরা তাঁর নেতৃত্ব মেনে কংগ্রেসে চলে এল, তা কিন্তু নয়। কংগ্রেস হিন্দুদের পার্টি এই বিশ্বাসে অটল থাকল মুসলমানরা।

১৯২২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি উত্তরপ্রদেশের চৌরিচৌরাতে গান্ধীর গণ-আইনঅমান্য আন্দোলন অহিংসার পথ ছেড়ে সহিংস হয়ে উঠল। কারণটা ছিল পুলিশের গুলিতে তিনজন সত্যাগ্রহীর মৃত্যু ও বেশ কিছু সত্যাগ্রহীর আহত

হওয়া। উত্তেজিত জনতা এর প্রতিবাদে চৌরিচৌরার পুলিশ ফাঁড়ি ঘিরে ফেলে ও আগুন লাগিয়ে দেয় সেখানে। ফাঁড়িতে আটক একুশ জন পুলিশের মৃত্যু ঘটে। এর প্রতিবাদে গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন ও আন্দোলনকারীদের প্রচণ্ড সমালোচনা করেন। গান্ধীর মানসিকতার আঁচ পেয়ে ইংরেজ প্রশাসন মাত্রাতিরিক্ত ভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। প্রচুর মানুষকে কারারুদ্ধ করে। গান্ধী নিজেও কারারুদ্ধ হন। ছয় বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয় তাঁর। তবে খারাপ স্বাস্থ্যের কারণ দেখিয়ে দু বছর কাটার আগেই মুক্তি পান। এমন সৌভাগ্য অবশ্য বাকি বন্দিদের কারও হয়নি। তাদের পুরো দণ্ডকালই জেলে কাটাতে হয়। এছাড়া ২২৮ জনকে বিভিন্ন গুরুতর ধারায় অভিযুক্ত করা হয়। তাদের মধ্যে ছয় জন জেলে বিচারাধীন অবস্থায় মারা যান। বাকিদের মধ্যে ১৭২ জনকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়। বিচারপ্রক্রিয়া চলাকালীন পুরো সময়ে গান্ধী একটা প্রতিবাদও করেন নি। প্রতিবাদ করেছিলেন বাংলার বিপ্লবী মানবেন্দ্র নাথ রায়। প্রতিবাদে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটও ডেকেছিলেন তিনি।

এভাবে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া ও আন্দোলনকারীদের বিষয়ে করা কটূক্তির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রবল সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছিলেন গান্ধী।

অতএব গান্ধীর প্রাপ্তির ভাঁড়ার আবার শূন্য। এরপর বড় কাজ বলতে যেটা তিনি শুরু করলেন, সেটা হল ১৯৩০ সালের সিভিল ডিসওবেডিয়েন্স মুভমেন্ট বা গণ-অসহযোগ আন্দোলন। শুধু যে সাধারণ মানুষ অংশ নিয়েছেন বলে এই আন্দোলন সিভিল তা নয় এই আন্দোলনকে তিনি সিভিল অর্থাৎ ভদ্র আখ্যা দিলেন এই কারণেও যে, এর ভিত্তি হবে অহিংসা, আর আন্দোলনকারীদের ব্যবহার হবে ভদ্র। তারা সরকারি সম্পত্তির ক্ষতি করবে না, হিংসার আশ্রয় নেবে না ইত্যাদি। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের দীর্ঘ যাত্রাপথে ১৯৩০ সালের অসহযোগ আন্দোলন একটা উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এইজন্য উল্লেখযোগ্য নয় যে, এই আন্দোলন ত্বরান্বিত করেছিল স্বাধীনতা প্রাপ্তিকে। বরং উল্টোটাই ছিল সত্যি। অসহযোগ আন্দোলনের পুরো যাত্রাপথ ছিল বিভ্রান্তি এবং অযৌক্তিক ও স্বেচ্ছাচারী নেতৃত্বে ভরা। কেমন ছিল সেই স্বেচ্ছাচার, তার বিশ্লেষণ করা দরকার।

শুরুটা করতে হয় ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত স্বাধীনতা বিষয়ক প্রস্তাব দিয়ে। বাংলার স্বদেশী আন্দোলন তখন শুধু স্তিমিত নয়, তা প্রায় স্মৃতিতে পর্যবসিত। মোপলা

বিদ্রোহের ও গণহত্যার ক্ষত দগ্‌দগে হয়ে রয়েছে সবার মনে। বালগঙ্গাধর তিলকের মৃত্যু হয়েছে। কংগ্রেসের একচ্ছত্র আধিপত্য গান্ধীর হাতে। নেতৃত্বে উঠে এসেছেন মতিলাল ও তাঁর পুত্র জওহরলাল। মতিলাল, জওহরলাল এবং গান্ধীর মিলিত ত্রয়ী কংগ্রেস মহলে তখন পরিচিত 'Father, Son and the Holy Ghost' হিসেবে।

এই পরিস্থিতিতে লাহোর কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজের (Complete independence) লক্ষ ঘোষণা করল। লক্ষপূরণের জন্য গ্রহণ করা হল গণ-অসহযোগ কর্মসূচী। বলা হল, এই আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরেজকে ভারতে ছাড়তে বাধ্য করা হবে। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে একথা পরিষ্কার ভাবে বলা হল যে, ব্রিটিশের ঔপনিবেশিক শাসন ভারতীয় জনগণের জীবনে চারটি মৌলিক সর্বনাশ এনেছে। এগুলি হল : (1) "India has been ruined economically.....Village industries such as, hand spinning have been destroyed. (2) Customs and currencies have been so manipulated as to heap further burden on the peasantry.....(3) Politically, India's status has never been so reduced as under the British regime. (4) Culturally, the system of education has torn us from our moorings."

এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে গেলে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলন দরকার। প্রস্তাবে বলা হল, "We hold it to be a crime against man and God to submit any longer to a rule that has caused this fourfold disaster to our contry.....We will, therefore, prepare ourselves by withdrawing, so far as we can, all voluntary association from the British Government, and will prepare for civil disobedience, including non-payment of taxes.........We, therefore, hereby solemnly resolve to carry out the Congress instructions issued from time to time for the purpose of establishing Purna Swaraj."

শুধু ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হলেন না নেতৃবৃন্দ। অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ণ নেতৃত্ব দেওয়া হল গান্ধীর হাতে। স্বাধীনতা দিবসও উদ্‌যাপন করা হল রাভি (ইরাবতী) নদীর তীরে। তারিখটা ছিল ২৬শে জানুয়ারি, ১৯৩০। কংগ্রেসের এই ঘোষণা সারা দেশে অভূতপূর্ব জন-জাগরণের সৃষ্টি করল। কিন্তু তারপর অতি অদ্ভুত কিছু ঘটনা ঘটতে শুরু করল। তখনও কংগ্রেস অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের কালি পুরোপুরি শুকোয় নি, সর্বাধিনায়ক গান্ধী যে কাজটি করলেন, তাকে যদি আন্দোলনের পিছনে ছুরিকাঘাত বলা হয়, তবে অন্যায় হয় না। লাহোর অধিবেশনের অব্যবহিত পরে গান্ধী তাঁর নিজের পত্রিকা 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'তে

একটি প্রবন্ধ লিখলেন। সেখানে পূর্ণ স্বরাজের দাবি থেকে এক শ' আশি ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে ভাইসরয়ের কাছে কিছু ব্যাপারে প্রশাসনিক সংস্কারের আবেদন জানালেন। লিখলেন—"This is by no means an exhaustive list of pressing needs, but let the Viceroy satisfy us with regard to these very simple but vital needs of India." অর্থাৎ এই দাবিগুলি কোনওভাবেই সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু ভাইসরয় এই সাধারণ কিছু জরুরি দাবিগুলি মেনে তাঁর সদিচ্ছার পরিচয় তো দিন।

পূর্ণ স্বরাজের দাবির কী হল তাহলে ? এই যদি ইচ্ছা ছিল, তবে লাহোর অধিবেশনের প্রস্তাবে স্বাধীনতার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা ছিল কেন আর কেনই বা ইরাবতীর তীরে অত ঘটা করে ত্রিবর্ণলাঞ্ছিত পতাকা তোলা হল ও স্বাধীনতার ঘোষণা করা হল ? আরও বড় প্রশ্ন, কংগ্রেস অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে গিয়ে এভাবে লেখার অধিকার কি ছিল গান্ধীর ? অবশ্যই নয়। কিন্তু গান্ধীর মানসিকতা ছিল স্বৈরতন্ত্রী। তিনি যখন যেটা ঠিক ভাবতেন, সেটা করতেন। কারও তোয়াক্কা করতেন না। তাঁর কথা ছিল—আমিই কংগ্রেস। ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার এই সম্পর্কে বলেছেন—

সবকিছুর দায়িত্ব অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির উপর ন্যস্ত ছিল। তবে তা কেবল নামমাত্র। যা করার, গান্ধী একাই করতেন। এর আগেও একাধিকবার গান্ধী তাঁর কাজকর্মে তালগোল পাকিয়ে ফেললেও, তাঁকেই ডিক্টেটর হিসেবে মেনে নেওয়া হল। আর এভাবেই পরবর্তী তেরটা বছর তিনি কংগ্রেসকে চালিয়ে গিয়েছেন।

"Everything was nominally left to the All India Congress Committee but practically to Gandhi.....Undeterred by the past experience of hopeless muddles in which Gandhi placed himself and the great national organisation on more than one occasion, he was chosen to be the Dictator, a position which he maintained, with rare exceptions, for the next thirteen years."

আসা যাক অসহযোগ আন্দোলনের প্রসঙ্গে। যে আন্দোলনের শুরুটা হল লবণ সত্যাগ্রহের মাধ্যমে। ১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ আমেদাবাদের নিকটবর্তী সাবরমতী আশ্রম থেকে যাত্রা শুরু করলেন গান্ধী ও তাঁর ৭৮ জন সঙ্গী। ২৪ দিন হেঁটে ২০০ মাইল পথ অতিক্রম করে ৬ এপ্রিল তাঁরা পৌছুলেন সমুদ্র তীরের ডাণ্ডিতে। সেখানে লবণ তৈরি করে সরকারের সল্ট মনোপলি ল ভেঙে দিলেন গান্ধী। নিঃসন্দেহে ব্যাপক ভাবে সফল হয়েছিল এই আন্দোলন। এবং

এই একটি মাত্র আন্দোলন বুঝিয়ে দিল, প্রচারমাধ্যমে বা মিডিয়াকে কতটা দক্ষভাবে পরিচালনা করতে পারতেন গান্ধী। লবণ সত্যাগ্রহের মিডিয়া কভারেজ সারা পৃথিবীব্যাপী হয়েছিল। এই আন্দোলনের সাফল্য গান্ধীর জনপ্রিয়তা গগনচুম্বী করল। শুধু ভারতে নয়, সারা পৃথিবীতে। বিংশ শতকের সবচেয়ে সাড়া জাগানো দশটি ঘটনার তালিকা তৈরি করেছে আমেরিকার একটি বিখ্যাত পত্রিকা। সেই দশটি ঘটনার মধ্যে গান্ধীর লবণ সত্যাগ্রহকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। লবণ সত্যগ্রহের সাফল্য বিপুল সাড়া ফেলল সারা ভারতে। চতুর্দিকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হতে থাকল। সেই আন্দোলনকে দমন করতে ব্রিটিশ সরকারও কড়া ব্যবস্থা নিল। দমনপীড়ন ও নির্বিচার গ্রেপ্তার শুরু হল। সারা দেশে ৮০,০০০ এরও বেশি মানুষ কারারুদ্ধ হল। আন্দোলনের তীব্রতায় ব্রিটিশ যখন প্রায় দিশাহারা, দেশের মানুষ যখন বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে, এবার বিদায় নেবে ইংরেজ, তখন গান্ধী আবার একটা অদ্ভুত কাজ করলেন। অদ্ভুত বলব, নাকি বলব বিশ্বাসঘাতকতা? আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা! স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। যদি এটা না করতেন সেদিন, তবে স্বাধীনতার জন্য ভারতকে আরও সতেরটা বছর অপেক্ষা করতে হতনা।

লবণ সত্যাগ্রহের প্রতিক্রিয়ায় গান্ধীও গ্রেফতার হয়েছিলেন। তবে বেশিদিন থাকেননি কারান্তরালে। মুক্তি দেওয়া হল তাঁকে। ততদিনে সারাভারতের যেখানে যত কংগ্রেস কমিটি আছে, সব নিষিদ্ধ করে দিয়েছে সরকার। নিষিদ্ধ থাকা অবস্থাতে ছাড়া পেলেন গান্ধী। আর ছাড়া পেয়েই তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন লর্ড আরউইনের সঙ্গে বৈঠক করার জন্য। ১৭ই ফেব্রুয়ারি (১৯৩১) তারিখে আরউইন-গান্ধীর প্রথম বৈঠক হল। পরবর্তী তিন সপ্তাহের মধ্যে আটবার বৈঠকে বসলেন তাঁরা। আরউইন চাইছিলেন যেনতেন প্রকারেণ অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করতে, আর গান্ধী চাইছিলেন স্বাধীনতার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি পেতে। শেষমেষ সন্ধি হল দুজনের। সই হল গান্ধী-আরউইন চুক্তি। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন গান্ধী। আরউইনও কথা দিলেন অতঃপর লণ্ডনে গিয়ে সরকারের সঙ্গে স্বাধীনতার ব্যাপারে যাতে গান্ধী কথা বলতে পারেন, তার ব্যবস্থা করবেন তিনি। সেইমত গান্ধী একা গেলেন লণ্ডনে, দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক শুরু হল। কিন্তু ধূর্ত ব্রিটিশ আলোচনার মধ্যে বেশ কিছু ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের এনে বসাল। তারা বলল, কংগ্রেসের শাসনাধীন থাকবে এমন ভারতে তাঁরা থাকবেন না। ফলে ভেস্তে গেল আলোচনা। ছোটখাট কিছু সুবিধা ছাড়া খালি হাতে ফিরলেন গান্ধী। যে লবণ সত্যাগ্রহ শুরু হয়েছিল এক মহা-

সংগ্রামের স্বপ্ন নিয়ে, মুখ থুবড়ে পড়ল সেই আন্দোলন। আর এইজন্যেই ঐতিহাসিকদের একটা বড় অংশ মনে করেন যে, গর্ব করে বলার মত কোনও ফল দেখাতে পারেনি গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন।

কিন্তু শুধু ঐতিহাসিকরা নন, কংগ্রেসে সভাপতি জওহরলাল নেহরু পর্যন্ত গান্ধী-আরউইন চুক্তির বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছিলেন, বলেছিলেন—'এক বছর ধরে এত যে লড়াই করলাম আমরা, তা কি এইজন্য ? আমাদের সাহসী কথাবার্তার এই কি পরিণতি ? স্বাধীনতার যে সিদ্ধান্ত আমরা ২৬শে জানুয়ারি (১৯৩০) নিয়েছিলাম, তা কি এইজন্য ?'

নেহরু একা ছিলেন না, তাঁর পিছনে কংগ্রেসের আরও অনেক—অনেক নেতা ছিলেন। কিন্তু তাতে অবস্থার কোনও পরিবর্তন হল না। গান্ধীর বিরুদ্ধাচরণ করে অসহযোগ আন্দোলন চালাবার সাহস কারও হল না। সুতরাং গান্ধী-আরউইন চুক্তি মেনে আন্দোলনের পথ থেকে সরে আসাকে শ্রেয় মনে করলেন তাঁরা। এরপর দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পর গান্ধী যখন দেখলেন যে, শুধু কংগ্রেসের সদস্যরা নন, দেশের মানুষ তাঁর সমালোচনায় মুখর হয়েছে, তখন আবার শুরু করলেন অসহযোগ। আরউইনের জায়গায় তখন নূতন ভাইসরয় হয়ে এসেছেন লর্ড উইলিংডন। তিনি আরউইনের থেকেও শক্ত ধাতের মানুষ। দমন পীড়নের মাত্রা বেশ কয়েকগুণ বাড়ালেন তিনি। বললেন, ছয় সপ্তাহের মধ্যে আন্দোলন ঠাণ্ডা করে দেবেন। ছয় সপ্তাহের জায়গায় পনের মাস কাটল। এক লক্ষ কুড়ি হাজারেরও বেশি সত্যগ্রহীকে জেলে ঢোকানো হল, যাদের মধ্যে বহু মহিলা ও শিশু পর্যন্ত ছিল, তথাপি আন্দোলনকে থামানো গেল না।

কিন্তু পনের মাসেও যা করতে পারেনি সরকার, তা পনের মিনিটে করে দিলেন গান্ধী। কারারুদ্ধ অবস্থায় ১৯৩৩ সালে ৮মে তারিখে তিনি একটি ঘোষণা করলেন (ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেছেন—Gandhi threw bombshell) যে, আত্মশুদ্ধির জন্য ও হরিজনদের স্বার্থরক্ষার জন্য একুশ দিন ব্যাপী অনশন করবেন। এমন মহৎ ঘোষণা মুখ থেকে বেরোতে না বেরোতে মহানুভব সরকার তাঁকে জেল থেকে ছেড়ে দিলেন। জেলের বাইরে এসে গান্ধী এক বিবৃতি দিয়ে কংগ্রেস সভাপতিকে নির্দেশ দিলেন এক মাস কিংবা দেড় মাসের জন্য সব আন্দোলন মুলতুবি রাখতে। যে কারণটি দেখালেন, সেটি কম চমকপ্রদ নয়। বললেন, অনশনের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে যদি আমার মস্তিষ্ক অন্য কাজে ব্যস্ত থাকে। (The whole purpose of the fast will be frustrated if I allowed my brain to the occupied by any extraneous

matter.......) অর্থাৎ মোক্ষম সময়ে আবার বিশ্বাসঘাতকতা। ব্রিটিশের সঙ্গে বোঝাপড়া ছাড়া আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন—এমন কথা হজম হল না অনেকের। গান্ধী আবার সমালোচনার মুখোমুখি হলেন। সামনে কেউ কিছু না বললেও পিছনে যে এসব কথা চলছে, তা তাঁর কানে এল। অতঃপর পেছনে বোঝাপড়া ও সামনে ঝগড়ার পরিচিত লাইনটি ধরলেন।

অনশনে বসলেন ও সেইসঙ্গে ভাইসরয়ের কাছে আবেদন করলেন দমনপীড়ন বন্ধ করতে ও ধৃত বন্দিদের মুক্তি দিতে। ভাইসরয় কর্ণপাত করলেন না। পরিষ্কার ভাষায় বলে দিলেন যে, আন্দোলন সাময়িকভাবে বন্ধ করলে চলবে না, পাকাপাকিভাবে বন্ধ করতে হবে। আরও জানালেন যে, কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও আলোচনায় বসবে না সরকার। সরকারের মনোভাব দেখে গান্ধী প্রথমবারের ছয় সপ্তাহের সঙ্গে আরও ছয় সপ্তাহ মুলতুবি রাখলেন আন্দোলন। তাতেও লর্ড উইলিংডনের রাগ দূর হল না, গান্ধীর সাক্ষাতের অনুরোধ আবার প্রত্যাখ্যান করলেন। অতঃপর অনির্দিষ্টকালের জন্য আইন অমান্যের (Mass Civil Disobedience) কার্যক্রম স্থগিত করে দিলেন গান্ধী। তবে একটা কৌশল করলেন—গণ আইন অমান্য বন্ধ হল বটে, তবে কেউ যদি ব্যক্তিগত স্তরে এই আন্দোলন করতে চায়, কংগ্রেস তাকে বাধা দেবে না।

বলা বাহুল্য, ব্যক্তিগত স্তরে এক আধজন এগোলেন বটে, কিন্তু প্রশ্নটা হল—ব্যক্তিগত স্তরে আন্দোলন করা ও তার ফল ব্যক্তিগত ভাবে ভোগ করার এই কথা বলার কী দরকার পড়েছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের? কোনও দরকার যে ছিল না, তা নয়। দরকারটা ছিল শাক দিয়ে মাছ ঢাকার, যাতে ঝুড়ির মধ্যে আমিষের সন্ধান কেউ না পায়। যাতে আমিষের গন্ধটা ঢেকে রাখা যায়।

কংগ্রেসের নেতারা যথারীতি ঘটনার এবম্বিধ পরিবর্তনে চুপ করে থাকাকে শ্রেয় মনে করেছিলেন। শুধু দুজন মাত্র মানুষ প্রতিবাদ করেছিলেন। একজন বল্লবভাই প্যাটেলের দাদা বিঠলভাই প্যাটেল, আর অন্যজন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস। তাঁরা তীব্রভাষায় গান্ধীর সিদ্ধান্তের সমালোচনা করলেন এবং বললেন যে, আন্দোলন প্রত্যাহারের এই সিদ্ধান্ত বিগত বহুবছরের সংগ্রাম ও ত্যাগের ইতিহাসকে শেষ করে দিল। আরও বললেন যে, এটা আন্দোলনের ব্যর্থতা ও সেইসঙ্গে গান্ধীর নেতৃত্বেরও ব্যর্থতা।

সুতরাং যখন স্বাধীনতা প্রায় হাতের মুঠোয় এসে গেছে, যখন দেশের জনসাধারণ অত্যাচারী ব্রিটিশের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার শেষ লগ্নে পৌঁছে গেছে, তখন গান্ধী ও কংগ্রেসের জন্য তাদের সংগ্রাম আবার পিছিয়ে পড়ল।

কিন্তু এমনভাবে বারবার মোক্ষম সময়ে পিছিয়ে আসাটা কি বুদ্ধিভ্রংশতা ? নাকি গোপন কোনও বোঝাপড়া ? ব্রিটিশ রাজকে বাঁচিয়ে রাখার কৌশল ? প্রশ্নটা ওঠা কিন্তু অসঙ্গত নয়। সন্দেহটা অমূলকও নয়। অমূলক নয়, আরও একটা কারণে। তা হল, এমন ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েও। সেই ঘটনার কথা বলব এবার।

১৯৩৫ সালে গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের মাধ্যমে এক নতুন শাসনতন্ত্র চালু হল এদেশে। এই আইনের বলে বিভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক আইনসভা স্থাপনের মাধ্যমে শাসনক্ষমতায় বসার সুযোগ এল ভারতীয়দের সামনে। ১৯৩৭ সালে আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। নির্বাচনের ফলে ভারতের বেশিরভাগ প্রদেশে সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেল কংগ্রেস। এরপর কিভাবে সরকার গঠিত হবে, সেটা দেখার কথা ছিল নির্বাচিত সদস্যদের ও তাদের দল কংগ্রেসের। কিন্তু মাথা গলালেন গান্ধী এবং ক্রমশ জটিল করে তুললেন পরিস্থিতি। অথচ, নিয়ম অনুযায়ী তাঁর মাথা গলাবার কথা নয়। ১৯৩৪ সাল থেকে কংগ্রেস দলে সদস্যপদের নবীকরণও তিনি করেন নি। কিন্তু দায়িত্ব ছাড়া ক্ষমতা জাহির করার ঝোঁক তাঁর বরাবরের, আর সেই ঝোঁকের কাছে আত্মসমর্পণ করে ধন্য হয়ে থাকত কংগ্রেস। যে সত্যকে স্বীকার করে জওহরলাল বলেছিলেন—(He is) 'the permanent super-President of the Congress' কিংবা 'Congress at present meant Gandhiji'।

গান্ধীর এই স্বৈরতন্ত্রী আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন নেতাজি সুভায। তার জন্য গান্ধীর রোষের মুখে কিভাবে পড়েছিলেন এবং দ্বিতীয়বারের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হয়েও কিভাবে পদত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন, সে ইতিহাস আমাদের অজানা নয়। সেই আলোচনায় আমরা এখানে যাচ্ছি না। আমরা এখন দেখব, প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে মাথা গলিয়ে গান্ধী কিভাবে জটিল করে তুললেন পরিস্থিতি।

প্রাদেশিক আইন সভাগুলির নির্বাচন হয়েছিল ১৯৩৬-৩৭ সালে। প্রধান দুটি দল—কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ অংশগ্রহণ করেছিল এই নির্বাচনে। এগারটি প্রদেশের মোট ১৭৭১টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস কিঞ্চিদধিক ৭৫০টি আসন পেয়েছিল, যা ছিল মোট আসনের প্রায় ৪০ শতাংশ। এই আসনগুলিরও বেশির ভাগ ছিল হিন্দু প্রধান এলাকায়। ৪৯১টি মুসলিম প্রধান অঞ্চলের আসনের মধ্যে মাত্র ২৬টি আসনে জিতেছিল কংগ্রেস। নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হল ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে। কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করল মাদ্রাজ, ইউনাইটেড প্রভিন্সেস, সেন্ট্রাল প্রভিন্সেস, বিহার

এবং উড়িষ্যাতে। এছাড়া অন্যান্য দল ও সংগঠনের সঙ্গে মিলিত হয়ে কোয়ালিশান সরকার তৈরি করল বোম্বাই ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। সিন্ধু প্রদেশ ও আসামেও সরকারি দলের সঙ্গে যোগ দিল তারা। এভাবে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুই পদ্ধতিতে এগারটার মধ্যে নয়টি প্রদেশে সরকারে চলে এল কংগ্রেস। যে দুটি প্রদেশ বাকি থাকল, সেই পাঞ্জাব ও বাংলাতে সরকার গঠন করলেন ইউনিয়নিস্ট পার্টির নেতা স্যার ফজলে হুসেন পাঞ্জাবে ও প্রজা কৃষক পার্টির নেতা ফজলুল হক বাংলাতে। দুটি প্রদেশেই সরকারের সহযোগী হল মুসলিম লীগ। কিন্তু কোনও প্রদেশেই তাদের হাতে একক ক্ষমতা এল না। বোঝা গেল, মুসলমানের দাবি-দাওয়া নিয়ে সরব হলেও এবং ধর্মের ভিত্তিতে আলাদা রাষ্ট্রের দাবি তুললেও সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে মুসলিম লীগ তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। কিন্তু এই সব সরকার দুটি বছর সবে পার করেছে, এমন সময় গান্ধী একটা মহা ভুল করলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সবে শুরু হয়েছে তখন। ইংরেজ চাইছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মত এবারও এগিয়ে আসুন গান্ধী ও তাঁর দল তাদের সাহায্য করার জন্য। কিন্তু গান্ধীর বিশ্বাস ছিল, এবারের যুদ্ধে ব্রিটিশ তথা মিত্রশক্তির পরাজয় ঘটবে এবং জিতবে হিটলার মুসোলিনি-তোজোর নেতৃত্বাধীন অক্ষশক্তি। অতএব তিনি ব্রিটিশকে সাহায্য করতে অস্বীকার করলেন। বললেন, আগে স্বাধীনতা, তারপর সাহায্যের প্রশ্ন। ব্রিটিশের পক্ষে সম্ভব ছিল না সেই দাবি মানা। প্রতিবাদে গান্ধী সমস্ত প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা থেকে কংগ্রেসিদের পদত্যাগ করালেন। আর তাঁর এই সিদ্ধান্তে লাভবান হল জিন্না ও তাঁর দল মুসলিম লীগ। এতদিনের এত চেষ্টাতেও মুসলমানদের মধ্যে একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তারে ব্যর্থ হয়েছিলেন জিন্না। গান্ধীর এই অবিমৃশ্যকারিতা তাঁকে ও তাঁর দলকে বসিয়ে দিল ক্ষমতায়। প্রচণ্ড খুশি জিন্না ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯ দিনটিকে উদ্‌যাপন করলেন ধন্যবাদজ্ঞাপনের দিন হিসেবে। কংগ্রেসের শাসন থেকে মুক্ত করার জন্য এবং কাজের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন!

প্রজা কৃষক পার্টির নেতা ফজলুল হক ছিলেন ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে অনেকাংশে মুক্ত ও উদারবাদী চিন্তাধারার মানুষ। তাঁর দলে তফশিলি জাতির ২১জন হিন্দু সদস্য ছিলেন। মুসলমানদের নিয়ে ধর্মীয় রাজনীতি কখনও করেন নি তিনি। এই কারণে মুসলিম লীগের প্রিয়পাত্র ছিলেন না। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ফজলুল হকের এই উদার ভাবমূর্তির জন্য স্বরাজ্য পার্টির নেতা হিসেবে নির্বাচিত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত ১৯৪১ সালে ফজলুল হক মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। কিন্তু ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে হক মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করে মুসলিম লীগের খাজা নাজিমুদ্দিন নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। ততদিনে গান্ধী আর একটা ভুল করেছেন। ভুল না বলে আত্মহত্যা বলা ভাল।

১৯৪২-এ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তে জওহরলাল ও কংগ্রেসের অন্যান্য বড় নেতাদের সায় ছিল না, কিন্তু গান্ধী তাঁর একার গোঁয়ার্তুমিতে এই ডাক দিলেন। বলা বাহুল্য, ব্রিটিশ সরকার চুপ করে বসে থাকল না। একদিকে কঠোর হাতে দমন করল সেই আন্দোলন, অন্যদিকে কংগ্রেসের তাবড় নেতাদের জেলে পুরে দিল। গান্ধীও বাদ থাকলেন না। তাঁকে অবশ্য সস্ত্রীক রাখা হয়েছিল পুনার বিলাসবহুল আগা খান প্যালেসে। যাই হোক, ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ব্যর্থতা ও কংগ্রেসি নেতাদের কারাগারে বন্দি থাকায় সুবিধা হল মুসলিম লীগের। বিপুলভাবে নিজেদের ক্ষমতা বাড়িয়ে নিল তারা। এতটাই বাড়িয়ে নিল যে, ১৯৪৬ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তারা বাংলার ক্ষমতা দখল করে নিল। সুরাবর্দির নেতৃত্বে গঠিত হল মন্ত্রিসভা। এই মন্ত্রিসভা দুটি কারণের জন্য ইতিহাসে কুখ্যাত হয়ে থাকবে। এক ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্টে কলকাতায় সংঘটিত কুখ্যাত দাঙ্গার জন্য, আর দুই, বাংলার ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের জন্য।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক না দিলে ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলি থেকে কংগ্রেসকে বের করে না আনলে মুসলিম লীগের ক্ষমতাবৃদ্ধির ও পাকিস্তান সৃষ্টির দাবি পেশ করার প্রশ্নই হয়তো উঠত না। উঠলেও সেই দাবি ততটা জোরালো হতে পারত না। গণতন্ত্রীর মুখোশে ঢাকা স্বৈরতন্ত্রী গান্ধীর জন্যই এটা সম্ভব হয়েছিল। প্রসঙ্গত জেনে রাখা ভাল যে, পাকিস্তানের দাবি লীগ জানিয়েছিল ১৯৪০ সালে।

স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীর অবিমৃশ্যকারিতার শেষ এখানে নয়। এর পরে আবার একটা মহাভুল করলেন তিনি। লীগ সরকারের দুর্নীতি ও লীগ মন্ত্রীদের যোগসাজসে ঘটা দুর্ভিক্ষের কারণে জিন্না যখন প্রবলভাবে কোণঠাসা, তখন ১৯৪৪ সালে জেল থেকে ছাড়া পেয়েই গান্ধী দেখা করতে ছুটলেন জিন্নার সঙ্গে। জিন্নার বোম্বাইয়ের বাড়িতে। সেখানে গিয়ে মেনে নিলেন পাকিস্তান দাবির যৌক্তিকতা। ব্যস, জিন্না আবার পাদপ্রদীপের আলোয় ফিরে এলেন। আর গান্ধী? তিনি ছিলেন ঘনঘন ভূমিকা পাল্টানোর ব্যাপারে নিদারুণভাবে দক্ষ। এই বলছেন পাকিস্তানের দাবি জীবন থাকতে মেনে নেবেন না, আবার দুদিন পরে বলছেন—মুসলমানদের অধিকার আছে এই দাবি করার। আসলে কোন পথে যে যাবেন, সেটাই পরিষ্কার ছিল না তাঁর কাছে। এমন একটি মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন আমাদের সর্বাধিনায়ক। সুতরাং যা হওয়ার তাই হয়েছে। ব্যর্থতা আর ব্যর্থতা। তাঁরই জন্য বিলম্বিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা, তাঁরই জন্য ভারতের সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম দেশনায়কদের অন্যতম নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে দেশত্যাগ করতে হয়েছে, তাঁরই জন্য ভগৎ সিং-উধম সিংদের ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হয়েছে। তাঁর মুসলিম তুষ্টিকরণের রাজনীতির পরিণামে দেশ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে তথাকথিত 'জাতির জনক'-এর এই হল অবদান।

পঞ্চম অধ্যায়

পারিবারিক গান্ধী : আজব আত্মগর্বী

গান্ধীর পরিবার : গান্ধীর জীবনে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের কোনও ভূমিকা ছিল না। পারিবারিক বন্ধন ব্যাপারটা প্রায় না-থাকার মত ছিল। অল্প অল্প হলেও স্ত্রী কস্তুরবার উল্লেখ তবুও পাওয়া যায় তাঁর জীবনে, তাঁর আত্মকাহিনিতে, কিন্তু সন্তানরা যেন ভিন্ গ্রহের বাসিন্দা। তাদের জন্ম দিয়েই যেন তিনি তাঁর কর্তব্য সমাধা করেছেন। সন্তানদের প্রতি এই নিরাসক্তি আবার ভক্তদের কাছে তাঁর আর এক দৈবীগুণ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। স্পেশ্যাল ব্র্যাণ্ডের যে ভারতীয় গণতন্ত্র পরিবারবাদের কালো ছায়ায় ক্রমশ রাজতন্ত্রে পর্যবসিত হতে চলেছে, সেখানে অবশ্য গান্ধীর উদাহরণ শুধু যে ব্যতিক্রমী তাই নয়, হয়তো তা কিঞ্চিৎ প্রশংসাও পাওয়ার যোগ্য। স্বাধীনতার পর প্রথম মন্ত্রিসভা যখন গঠিত হয়, তখন গান্ধীর কনিষ্ঠ পুত্র দেবদাসের বয়স সাতচল্লিশ বছর, মন্ত্রি হওয়ার যথেষ্ট বয়স হয়েছে তার, বাবা একটু ইঙ্গিত দিলেই তার পক্ষে কিংবা তার দুই দাদার পক্ষে (বড়টিকে বাদ দিলাম) যে কোনও একজনের কিংবা তিনজনেরই মন্ত্রী হওয়ার পথে বাধা ছিল না। কিন্তু গান্ধীর মনে ঘুণাক্ষরেও আসেনি এই কথা।

এই না-আসার কারণ কী? গান্ধীর মধ্যে স্বার্থপরতার অভাব? নাকি অন্য কিছু? সন্তানদের সম্পর্কে তাঁর মনোভাব কেমনতর ছিল, কেমনতর ছিল কস্তুরবার প্রতি তাঁর মনোভাব? এঁরা ছিল গান্ধীর ইমিডিয়েট ফ্যামিলি। এর বাইরেও তাঁর দুই দাদা ছিল, তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা ছিল। একদম ছোটখাট ছিল না পরিবার-পরিজনদের তালিকা। কিন্তু তাদের কারও সম্পর্কে বলতে গেলে কিছুই তেমন জানা যায় না। এটা কেন হল? যে মানুষটি তাঁর ভক্তদের প্রতি ছিলেন একান্তভাবে সদয়, তিনি তাঁর নিজের পরিবার-পরিজনদের প্রতি এতটা নির্দয়, এতটা কর্তব্যবিমুখ ছিলেন কেন?

যে মানুষটি প্রকাণ্ড এক বটবৃক্ষের মত ছায়া বিস্তার করেছিলেন বহু মানুষের জীবনে, তিনি এতটা ছায়াহীন হলেন কেন? গান্ধী-কস্তুরবার কোনও কন্যাসন্তান ছিল না। এজন্য 'লক্ষ্মী' (লছ্মি) নামের এক হরিজন কন্যাকে তিনি পালিতা কন্যা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ব্রহ্মচর্যের সেই চূড়ান্ত সময়েও কিন্তু লছ্মি কোনওদিন গান্ধীর শয্যায় যাননি। প্রশ্ন উঠতেই পারে, নাতনী হয়ে মনু গান্ধী যদি নিরাবরণা হয়ে তাঁর শয্যায় এক চাদরের নীচে তাঁর সঙ্গে শুতে পারে, তবে লছ্মি কেন অচ্ছ্যুৎ থেকে গেল? সেকি নাতনি নয় বলে? মেয়ে (daughter)

বলে? আবার দেখা গেছে, পালিতা কন্যা হিসেবে লছ্‌মি তাঁর কাছে এসেছে বটে, কিন্তু তার বিয়ে হওয়ার পর আর কোনও সম্পর্ক তার সঙ্গে রাখেননি গান্ধী। কেন এমন হয়েছিল? পরিবারের বাইরে যিনি এত সহমর্মী, পরিবারের মধ্যে তিনি এতটাই সহমর্মিতাশূন্য! এই মনোভাবের ব্যাখ্যা করাটা মনোবিদ্‌দের কাজ। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই ব্যাখ্যাটা কেউ করেননি। তবু আমরা চেষ্টা করব, সাধারণ মানুষ হিসেবে গান্ধীর এই আজব ব্যবহারের পিছনের কারণটিকে ব্যাখ্যা করতে। তবে শুরুটা করব, স্ত্রী প্রতি গান্ধীর মানসিকতা ও ব্যবহার নিয়ে।

কস্তুরবার সঙ্গে দুর্ব্যবহার

গান্ধী চাইলেও কস্তুরবা লেখাপড়া শেখেননি, এ নিয়ে গান্ধীর অভিযোগের অন্ত ছিল না। আত্মজীবনীতে গান্ধী লিখেছেন যে তিনি চেয়েছিলেন লেখাপড়া শিখে কস্তুরবা একজন আদর্শ স্ত্রী হয়ে উঠবেন এবং স্বামীর চিন্তাধারাকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলবেন। বাস্তবে তা হয়নি এবং এই না-হওয়ার জন্য কস্তুরবাকে তিনি সারা জীবন স্ত্রীর মর্যাদা দেন নি। অথচ, স্বামীকে নিজের পায়ে দাঁড় করাবার জন্য স্বার্থত্যাগে কখনও কুণ্ঠিতা হননি কস্তুরবা। ছাত্রজীবনে গান্ধী আদৌ মেধাবী ছাত্র ছিলেন না, বরং বলা যায় একেবারে সাধারণ স্তরের ছিলেন। গান্ধীর দুই দাদার পড়াশোনা বেশি ছিল না। সামান্য কাজ করতেন তাঁরা। বাবার মৃত্যুর পর সবাই সিদ্ধান্ত নিলেন যে গান্ধী একটা কলেজের ডিগ্রি হাসিল করে আনুন, তারপর বাবার পুরনো কর্মস্থল কাথিয়াবাড়ের রাজার কাছে দেওয়ানের পদে কাজ করুন। রাজা নিজেও এব্যাপারে কথা দিয়েছিলেন। অতএব কলেজে পড়ার জন্য বাড়ি ছেড়ে রাজকোট থেকে নব্বই মাইল দূরে সামলদাস কলেজে ভর্তি হলেন গান্ধী। যাওয়ার আগে জেনে গেলেন যে কস্তুরবার গর্ভসঞ্চার হয়েছে। পরিবারে তখন নিদারুণ অর্থকষ্ট, তবু মাসে মাসে টাকা যুগিয়ে গিয়েছেন গান্ধীর মা পুতলিবাঈ এবং গান্ধীর দুই বড় ভাই। আর পয়সা জুগিয়েছেন কস্তুরবা। কোনও না কোনও বাহানায় নিজের মায়ের কাছ থেকে অর্থ এনেছেন, পাঠিয়েছেন স্বামীর কাছে। আর তাঁর স্বামী তখন কী করেছেন? বারাঙ্গনাদের বাড়ি যাচ্ছেন (যদিও বলছেন, চরম অধঃপতন থেকে ভগবান রাম তাঁকে বাঁচাচ্ছেন), মাংস খাচ্ছেন, আরও নানারকম বখে যাওয়া ছোকরার মত কাণ্ডকারখানা করছেন। ফল যা হওয়ার তাই হল। বছর ঘোরার আগে যে পরীক্ষা হল, সেখানে ডাহা ফেল। এর ওপর নতুন উপদ্রব হল নিজেকে একা মনে করা। কারণ, সহপাঠীরা তাঁকে এড়াতে শুরু করেছে ততদিনে।

অতএব পড়া বন্ধ করে ফিরে এলেন বাড়িতে। গান্ধীর ভবিষ্যৎ তথা পরিবারের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীরভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মা পুতলিবাঈ বাড়িতে পূজাপাঠ

শুরু করে দিলেন। এই পূজাপাঠ করতে আসা এক পুরোহিত গান্ধীর জন্মলগ্নের ছক দেখে বিধান দিলেন — এ ছেলের পড়াশোনা এদেশে কিছু হবে না, আইন ব্যবসা শিখতে একে বিলেতে পাঠাও।

কিন্তু পাঠাতে তো বললেন, টাকা কোথায়? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মণিহারা' গল্পে দেখেছেন গহনার প্রতি মেয়েদের চরম আসক্তির কথা। গহনা বাঁচাবার জন্যে স্বামী ছাড়তে, ঘর ছাড়তেও দ্বিধা থাকে না মেয়েদের। কিন্তু কস্তুরবা অন্য ধাতু দিয়ে তৈরি মেয়ে। কতই বা বয়স তাঁর তখন! মাত্র উনিশ বছর। কোলে ছোট বাচ্চা ছেলে। সে আমলে বিলেতে গিয়ে মেমসাহেব বিয়ে করে সেদেশে থেকে যাওয়াটা প্রায় নিয়মের পর্যায়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। স্বামী যদি তেমন করেন, তবে একটা বাচ্চা নিয়ে কোথায় দাঁড়াবেন তিনি? এরকম পরিস্থিতি এলে ওই গহনাগুলোই তো একমাত্র ভরসা! অনেকে তাঁকে সাবধানও করে দিল এব্যাপারে। কস্তুরবা কান দিলেন না সেই কথায়। নিজের যাবতীয় গহনা বন্ধক (mortgage) রেখে স্বামীর বিলেত খরচের টাকা যোগাড় করলেন।

যাওয়ার আগে কস্তুরবার কাছে কোনও প্রতিজ্ঞা করেননি গান্ধী, অন্তত তেমন উল্লেখ নেই তাঁর জীবনীতে। তবে মা পুতলিবাঈ সম্ভবত কিছুটা চিনেছিলেন তাঁর ছোটছেলেকে। কয়েকটি প্রতিজ্ঞা তিনি করিয়ে নিলেন। এই প্রতিজ্ঞার কথাই গান্ধী উল্লেখ করেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে। বলেছেন, লন্ডন প্রবাসকালে অধঃপতনের হাত থেকে তাঁকে বাঁচিয়েছিল মায়ের কাছে করা এই প্রতিজ্ঞাগুলি। কী ছিল সেই প্রতিজ্ঞা? তিনি মদ খাবেন না, মাংস খাবেন না, নারী সম্ভোগ করবেন না। পুতলিবাঈয়ের কাছে সম্ভবত সামলদাস কলেজে থাকাকালীন ছেলের অধঃপতনের খবর কিছুটা হলেও এসেছিল। তাই ঠিক এই তিনটি বিষয় নিয়েই প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন।

যে গান্ধী সারাজীবন ধরে অসংখ্য তুচ্ছাতিতুচ্ছ সেবিকাদেরও বিশাল বিশাল চিঠি লিখেছেন, চিঠি লেখার ব্যাপারে যিনি বিশ্বরেকর্ড করেছেন, তিনি তাঁর তিন বছরের লন্ডন প্রবাসকালে একখানি চিঠিও লেখেননি কস্তুরবাকে, ভাবা যায়? লিখবেন কিভাবে? ব্রিটিশ জীবনাদর্শে মুগ্ধচিত্ত গান্ধীর দিন কাটছে সাজপোশাকের যত্নে আর নিজের সৌন্দর্যবর্ধনের কাজে। স্নানের পর ঘন্টাখানেক কাটত নানান রকমের প্রসাধন দ্রব্য গায়ে মুখে চড়াতে। তারপর কলেজ এবং সন্ধেবেলায় ব্রিটিশ যুবতীদের সঙ্গে পার্টি করা।

তাছাড়া কস্তুরবা তো ছিলেন তাঁর কাছে কেবলমাত্র যৌনতার সামগ্রী। শরীরের উত্তেজনা প্রশমন করার যন্ত্রমাত্র। তাই লন্ডনে থাকার সময় স্ত্রীকে মনে না রাখলেও ফেরার পর তাকে গর্ভবতী করতে দেরি করলেন না। যাই হোক, ভাবা গিয়েছিল ব্যারিস্টার গান্ধী আয়পত্তর করে এবার সংসারের হাল ধরবেন।

কিন্তু তা হল না। প্রথমে বোম্বে, তারপর পোরবন্দর — দু'জায়গাতেই আইন ব্যবসায়ে গান্ধী ডাহা ফেল। অতএব দাদা আবদুল্লা নামে এক মুসলিম ব্যবসায়ীর ফার্মে এক বছরের কন্‌ট্র্যাক্টে কাজ নিয়ে পাড়ি দিলেন দক্ষিণ আফ্রিকা। দুই ছোট ছেলেকে নিয়ে কস্তুরবা আবার একা। এই একাকিত্ব আরও ভয়ঙ্কর হয়েছিল এই কারণে যে, কালাপানি পেরোবার অপরাধে তিন বছর আগেই গান্ধীর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও পুত্রদেরও সমাজচ্যুত করা হয়েছিল। সমাজচ্যুতির কষ্ট গান্ধীকে তত সহ্য করতে হয়নি প্রবাসে থাকার দরুন, কিন্তু কস্তুরবাকে পুরো মাত্রায় সহ্য করতে হয়েছিল।

দাদা আবদুল্লা অ্যান্ড কোম্পানির কাছ থেকে এক বছরের কন্‌ট্র্যাক্ট নিয়ে গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা যান। এত অল্পসময়ের জন্য যাওয়াতে পরিবার নিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু একবছর পরেও যখন সেখানে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখনও কস্তুরবা তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য জিদ তো ধরলেনই না, বরং হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন এই ভেবে, এতদিনে কাজকর্ম গুছিয়ে করছেন তাঁর স্বামী। তাঁর একটা হিল্লে হয়েছে। তিন বছরেরও বেশি জোহানেসবার্গে থাকার পর ভারতে ফিরলেন গান্ধী। দুটো কাজ করার চেষ্টা করলেন। এক, আইন ব্যবসা — জমাতে পারলেন না। দুই, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব পাওয়া — সেটাও পেলেন না। অতএব ছ'মাস পরে আবার দক্ষিণ আফ্রিকার পথ ধরলেন। দুই ছেলে নিয়ে কস্তুরবাও স্বামীর সঙ্গী হলেন এবার।

দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন গান্ধীর শেষ দুই পুত্রের জন্ম হয়। তৃতীয় পুত্র রামদাসের জন্ম ১৮৯৭ সালে এবং চতুর্থ তথা কনিষ্ঠ পুত্র দেবদাসের জন্ম ১৯০০ সালে। বিবাহের পর থেকে এইপ্রথম গান্ধী ও কস্তুরবা এত দীর্ঘ সময় একসঙ্গে আছেন। চার সন্তান নিয়ে অজানা অচেনা ভিন্ন সংস্কৃতির দেশে নূতন করে সংসার তৈরি করছেন কস্তুরবা। সেসব নিয়ে ব্যস্ত তিনি। আর গান্ধী ব্যস্ত হয়েছেন পেশাগত আইনব্যবসা ছাড়া অন্যান্য নানাবিধ সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে। যাকে demanding wife বলে, তেমনটি কখনও ছিলেন না কস্তুরবা। বরং সাধ্যমত চেষ্টা করতেন স্বামীর নির্দেশাদি পালন করতে। কিন্তু গান্ধীর মধ্যে কস্তুরবার প্রতি উচ্চ ধারণা তেমন একটা ছিল না কখনই। তখনও পর্যন্ত স্ত্রী তাঁর কাছে যৌনতার জন্য ব্যবহারযোগ্য একটি যন্ত্রমাত্র। এই সময় সামান্য কারণে স্ত্রীর গায়ে হাত তুলতেও দ্বিধা করেননি গান্ধী। খুব সহজবোধ্য কারণে এইসব ঘটনার বড় একটা উল্লেখ গান্ধী তাঁর আত্মজীবনীতে করেননি। তবু অন্তত একটি ঘটনার কথা জানা যায়।

১৮৯৮ সালের শুরুর দিকের ঘটনা সেটি। কস্তুরবার গর্ভে তখন তৃতীয় পুত্র রামদাস। বাড়ির সব কাজকর্ম নিজের হাতে করতে হয়। এর ওপর উপরি কাজের চাপ বলতে স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে আসা নানান ধরণের মানুষ। তাঁরা

খাওয়াদাওয়া করতেন, কেউ কেউ থেকেও যেতেন। গান্ধী এজন্যে একটা নিয়ম চালু করেছিলেন। যারা রাতে এমনভাবে থাকতেন তাঁর বাড়িতে, তাদের জন্য নিয়ম ছিল নিজের নৈশকালীন মূত্রের পাত্রটি (chamber pot) চলে যাওয়ার আগে পরিষ্কার করে যাওয়া। একদিন এক ভারতীয় ক্রিশ্চান ভদ্রলোক রাতের বেলায় গান্ধীর বাড়িতে থেকে যান, কিন্তু সকালে চলে যাওয়ার আগে পাত্রটি পরিষ্কার করতে ভুলে যান। গান্ধী তাঁর স্ত্রীকে বললেন, পাত্রটি পরিষ্কার করার জন্য। কস্তুরবা পাত্রটি নিয়ে বাইরে এলেন বটে, তবে তাঁর মুখে-চোখে ছিল তীব্র বিরক্তি। তিনি খেয়াল করেননি যে, তাঁর স্বামী আড়াল থেকে নজর রেখেছেন তাঁর ওপর। পাত্রটি পরিষ্কার করা হলে গান্ধী জানতে চাইলেন — এমন বিরক্তি নিয়ে কাজটা কেন করলেন কস্তুরবা! কেন তিনি হাসিমুখে করলেন না এই কাজ?

কস্তুরবা নিশ্চয়ই এই ধরণের কোনও উত্তর দিয়েছিলেন যে, অন্যের মল মূত্র পরিষ্কার করতে হবে — এমনটা কোনওদিন ভাবেননি।

অবধারিতভাবে গান্ধীর উত্তর ছিল — এই বাড়িতে তাঁর সঙ্গে থাকতে গেলে এসব কাজ কস্তুরবাকে নিয়মিত করতে হবে।

কস্তুরবা এবার রেগে গিয়েছিলেন এবং জবাব দিয়েছিলেন — 'তাহলে তোমার বাড়ি তোমার থাক, আমাকে যেতে দাও।' ("Keep your house to yourself and let me go.")

ঘর-গেরস্থালি করতে গেলে এমন কথা প্রায়শই হয়ে থাকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। কথার স্তরেই আটকে থাকে এসব কথা। কিন্তু গান্ধী যা করলেন, তা অকল্পনীয়, অমানবিক। গান্ধীর মত মহান চরিত্রের সঙ্গে যা বিন্দুমাত্র খাপ খায় না।

যেই না একথা বলেছেন কস্তুরবা, অমনই গান্ধী ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্ত্রীর ওপর। শক্ত করে ধরলেন তাঁর একখানা হাত, তারপর হিড়হিড় করে টানতে টানতে বাড়ির গেটের দিকে নিয়ে যেতে থাকলেন। বলতে থাকলেন — "আমার বাড়িতে থাকতে গেলে আমার কথামত চলতে হবে। এসব অসভ্যতা আমি সহ্য করব না। ("I will not tolerate such nonsense.")

ঘটনার প্রচন্ডতায় গর্ভবতী কস্তুরবা হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ততক্ষণে গান্ধী গেটের বাইরে টেনে নিয়ে গেছেন স্ত্রীকে। এক ধাক্কা মেরে তাকে বার করেও দিয়েছেন। কস্তুরবা কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন — 'তোমার কি লজ্জাশরম বলে কিছু নেই? একবার ভাবলে না যে, আমি কোথায় যাব? কিরকম মানুষ তুমি? এই দূরদেশে না আছে আমার বাবা-মা, না আছে কোনও আত্মীয়-স্বজন — কার কাছে গিয়ে উঠব আমি? তুমি মনে করেছ, আমি তোমার বউ বলে যখন খুশি লাথি-ঝাঁটা মারবে আমাকে! ধিক্ তোমাকে। ছিঃ!'

গান্ধী এই ঘটনা থেকে কী শিক্ষা নিয়েছিলেন, আদৌ কোনও শিক্ষা নিয়েছিলেন কিনা তা জানা যায় না। তবে যে সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে এমন মহাত্মা চরিত্রের মানুষ স্ত্রীর গায়ে হাত তুলতে এবং বাড়ি থেকে বের করে দিতে দ্বিধা করলেন না, তাতে বোঝা যায়, স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের মধ্যে আত্মার বন্ধন বলে কিছু ছিল না। যেটা ছিল সেটা হল যৌনতার বন্ধন।

বুঝতে পারছি, এই কথায় কিছু মানুষ সহমত হবেন না। তা না হতে পারেন, কিন্তু গান্ধী রচনাবলী ও চিঠিপত্রের মধ্যে খুব ভালভাবে খুঁজলেও কস্তুরবার সম্পর্কে গান্ধীর কোনও উচ্ছ্বাস কখনো খুঁজে পাওয়া যাবে না। বরং উল্টোটাই পাওয়া যাবে। আর গান্ধীর কাজকর্ম বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে স্ত্রী কাছ থেকে ক্রমশই দূরে চলে যাওয়ার প্রমাণ।

১৯০০ সালে দেবদাসের জন্মের পর গান্ধী স্ত্রী-সহবাস বন্ধ করে দেন। যদিও সরকারি বা ঘোষিতভাবে সেটা তিনি করেন ১৯০৬ সাল থেকে। বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, মধ্যবর্তী এই ছয়টি বছরেও তিনি স্ত্রী-সহবাস করেননি। গান্ধী-অনুরাগীরা বলেন, যৌনতাকে গান্ধী বিসর্জন দিয়েছিলেন নাকি কস্তুরবার শরীরের কথা ভেবে। প্রসবকালে কস্তুরবা এত যন্ত্রণা পেতেন যে, সেই দৃশ্য দেখে গান্ধী সহবাস বন্ধ করে দেন। কেননা, সহবাস করলে গর্ভসঞ্চার, গর্ভসঞ্চার হলে প্রসব, এবং প্রসব হলে যন্ত্রণা। অতএব এত বড় ত্যাগ করে ফেললেন গান্ধী। এই প্রসঙ্গে এক অনুরাগীর লেখা বই থেকে সামান্য একটু অংশ উদ্ধৃত করার লোভ ছাড়তে পারছি না — "— ...childbirths were difficult, especially the last two. She remained weak for long periods of time after giving birth. Having witnessed his wife's agony during childbirth, Gandhi worried about having sexual relations, fearing kasturba would become pregnant again. He thought about contraceptives, but feared they would make Kasturba the 'instrument of his lust." মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর পড়া থাকলে তিনি নিশ্চয় বুঝতে পারতেন 'প্রসবে বেদনা তবু পতিসঙ্গ করে' মেয়েরা। বেদনার ভয়ে স্বামীর বিছানায় যাবে না, এমন ভাবনার পিছনে সহানুভূতির কোনও জায়গা নেই। তাহলে তো 'কাম' ব্যাপারটাই উঠে যেত পৃথিবী থেকে। আর যন্ত্রণার ব্যাপারটা তো বেশি আসে প্রথম পোয়াতিদের ক্ষেত্রে। কস্তুরবার ব্যাপারটা তো আদৌ তা নয়। পাঁচবার প্রসব তিনি করেছেন ইতিমধ্যে। এই যন্ত্রণাবোধের সঙ্গে ভালরকম পরিচয় আছে তাঁর। তাহলে হঠাৎ একথা উঠল কেন? আরও বড় প্রশ্ন, গর্ভনিরোধক (contraceptive) ব্যবহার করলে তো মিটত এই সমস্যা, তাহলে? গান্ধী নাকি ভেবেওছিলেন সেকথা।

কিন্তু মত পাল্টালেন কেন? গান্ধী-অনুরাগীদের ব্যাখ্যা তাহলে নাকি কস্তুরবা 'instrument of lust' হয়ে যাবে! অদ্ভুত কথা! একটা মিথ্যে ঢাকতে গিয়ে দশটা মিথ্যের অবতারণা। আসলে সহানুভূতি, সমব্যথী এসব কোনও কারণ নয়, গান্ধীর যৌনজীবনে অন্য কিছু অভিজ্ঞতা তখন শুরু হচ্ছিল, আর তার জন্যই কস্তুরবাকে শয্যা থেকে নির্বাসন দেওয়াটা জরুরি হয়েছিল। অতএব স্ত্রী-সহবাস বন্ধের মূলে ছিল ধান্দাবাজি। কী ছিল সেই ধান্দাবাজি, এবার তার কথা বলব।

১৯০১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে সপরিবারে ভারতে চলে আসেন গান্ধী। বোম্বেতে আইন ব্যবসা শুরু করে দেন। এবার সফলতার মুখ দেখলেন তিনি। বোম্বের সান্তাক্রুজে একটি চমৎকার বাড়ি নিলেন। বান্দ্রা থেকে চার্চগেট পর্যন্ত ট্রেনের প্রথম শ্রেণিতে ধনীদের মত নিত্য যাওয়া-আসা করতেন। তার জন্য তাঁর গর্বও ছিল — নিজেই বলেছেন সেই কথা। রাজনীতিতে ততদিনে গোপালকৃষ্ণ গোখেলের স্নেহ-আনুকূল্যে কংগ্রেস দলেও পরিচিত মুখ হয়ে উঠছেন। কিন্তু ডাক এল দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন আসছেন সেখানে। প্রবাসী ভারতীয়দের দাবি-দাওয়া নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনার জন্য।

দু-তিন মাসের মধ্যে ফিরবেন, এই ভরসায় পরিবারকে রেখে গান্ধী গেলেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। কিন্তু যে কারণে গেলেন, সেই কারণের কিছুই মিটল না। ভারতীয়দের দাবি-দাওয়া নিয়ে আলোচনাই হল না। অতএব সেখানে থেকে যাওয়া ঠিক করলেন গান্ধী। দু-বছর সেখানে একা থাকলেন, ১৯০৪ সালের শেষে ছেলেদের নিয়ে কস্তুরবা গেলেন সেখানে।

এই ১৯০৪ সালে গান্ধীর জীবনে এলেন ধনাঢ্য জার্মান-ইহুদি হেরমান কালেনবাখ। যার সঙ্গে গান্ধীর সমলৈঙ্গিক সম্পর্ক আজ পৃথিবীজুড়ে আলোচনার এক গরম বিষয় হয়ে উঠেছে। কেউ বলছেন, এই সম্পর্ক ছিল সমলৈঙ্গিক (homosexual), কেউ বলছেন সমযৌনমনোভাবাপন্ন (homoerotical)। প্রথম দর্শনেই প্রেম, আত্মার আত্মীয় (soulmate) হয়ে গেলেন দুজনে। পরস্পরের প্রতি এতটাই অনুরক্ত হয়ে পড়লেন যে, কয়েকমাসের মধ্যেই নিজেদের জন্য একটা বাড়ি বানিয়ে ফেললেন কালেনবাখ। স্ত্রী-পুত্রদের অন্যত্র রেখে সেই বাড়িতে গান্ধী থাকা শুরু করলেন কালেনবাখের সঙ্গে। প্রশ্ন উঠতে পারে, কস্তুরবার সম্মতি কি নিয়েছিলেন গান্ধী তাঁর এই কাজের জন্য? এর সোজাসাপটা উত্তর — না, অবশ্যই না।

বিষয়টা যখন প্রচন্ডরকমের দৃষ্টিকটু পর্যায়ে চলে গেল এবং কস্তুরবা প্রবল চাপ সৃষ্টি করলেন তাঁদেরও সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য, তখন রাজি হতেই হল গান্ধীকে। তবে পুরো দুটো বছর তিনি ঘাড় নোয়ান নি। কালেনবাখের সঙ্গে সহবাস করে গেছেন এই দুবছর। ১৯০৬ সালে কস্তুরবা ছেলেদের নিয়ে উঠে গেলেন গান্ধী-কালেনবাখের যৌথ সংসার ফিনিক্স ফার্মে। এতদিন কস্তুরবা সঙ্গে

না থাকায় 'ব্রহ্মচর্য'-এর ঘোষণাটি করেননি গান্ধী, এবার কস্তুরবা কাছে এসে যাওয়ায় এবং কালেনবাখের মনের ব্যথা দূর করতে ও তার সঙ্গে সম্পর্কটা বজায় রাখার জন্য ঘোষণা করে দিলেন ব্রহ্মচর্য ধারণ করার কথা। এই হল গান্ধীর যৌনতা ত্যাগের ইতিহাস। এই গোটা পর্বে উল্লেখ করার মত বিষয় হল এইটি যে, এতবড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কস্তুরবার সঙ্গে বিন্দুমাত্র আলোচনার প্রয়োজনও বোধ করেননি তিনি। নিজের সিদ্ধান্তটা স্রেফ চাপিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র। আর নিরুপায় কস্তুরবার সামনে সেটা মেনে নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় ছিল না।

এর পর থেকে সারাজীবন কস্তুরবা চেষ্টা করে গেছেন স্বামীর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখতে। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন আইন-অমান্য করেছেন, কারাবরণ করেছেন। ভারতে এসেও চেষ্টা করেছেন আশ্রমিক জীবনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে। মনে রাখতে হবে, ছোট ছেলে দেবদাসের বয়স তখন সবে মাত্র পনের-ষোল। তৃতীয় পুত্র রামদাস তার চেয়ে মাত্র দুবছরের বড়। তাদের দায়-দায়িত্ব মিটিয়ে সময় বার করেছেন কস্তুরবা। আশ্রমের কাজ করেছেন, চরকা কেটেছেন। চরকা কেটেছেন বটে, তবে খাদিবস্ত্র পরিধান করে নিজেকে জাহির করার ব্যাপারে তাঁর আপত্তি ছিল। আরও আপত্তি ছিল এই কারণে যে সরলাদেবী চৌধুরাণীর সঙ্গে গান্ধীর ঘনিষ্ঠতা তখন রীতিমত বাড়াবাড়ি পর্যায়ে গেছে। যদিও, এই সম্পর্কের দুর্নাম কাটাবার জন্য গান্ধী কখনও সরলাদেবীকে বলতেন তাঁর বোন, কখনও বলতেন তাঁর আধ্যাত্মিক স্ত্রী (spiritual wife)। সরলাদেবী গান্ধীর 'খাদিবস্ত্রের মডেল' হয়েছিলেন। কস্তুরবার খাদি বর্জনের একটা কারণ ছিল সরলার প্রতি সন্দেহজনিত জটিল মানসিকতা।

গান্ধীর জীবনে আসা অগণিত মহিলা ভক্ত, তাঁদের সঙ্গে গান্ধীর ঘনিষ্ঠতা এবং শেষদিকে ব্রহ্মচর্য পরীক্ষার নামে গান্ধীর আজব কাণ্ডকারখানা যে কস্তুরবা মেনে নিতে পারেন নি ও সাধ্যমত উপায়ে যে তার বিরোধিতা করে গেছেন, তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। এস্থার ফেরিং নামের যে ডেনিশ মেয়েটি ১৯১৭ সালে গান্ধীর সত্যাগ্রহ আশ্রমে আসেন, তাকে কখনই সহ্য করতে পারেননি কস্তুরবা। এই ব্যাপারে গান্ধী এস্থারের পক্ষ নিয়ে ঝগড়া পর্যন্ত করতেন স্ত্রীর সঙ্গে। কস্তুরবা তাঁর স্বামীর তীব্র যৌন-আকাঙ্খার সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত ছিলেন বলেই এটা বিশ্বাস করতেন যে, স্বামীর ব্রহ্মচর্য সাধনা আসলে হল আর এক উপায়ে যৌনতাকে প্রশ্রয় দেওয়া। শেষ পর্যন্ত সুশীলা-আভা-মনু ইত্যাদিরা যখন গান্ধীর সর্ববিধ সেবার দায়িত্ব নিয়ে নিল, তখন তিনি একেবারেই আড়ালে চলে গেলেন।

কিন্তু থাকতে পারলেন না আড়ালে। ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে গ্রেফতার হলেন গান্ধী। তাঁর সুখ-সুবিধার যাতে কোনও ত্রুটি না হয়, তার জন্য পুনার বিলাসবহুল আগা খাঁ প্যালেসকে অস্থায়ী জেলখানা হিসেবে ঠিক করা

হল। কিন্তু শুধু প্রাসাদ হলে তো চলবে না, সেবাদাসীও চাই। অভাব ছিল না সেবাদাসীর। কিন্তু ব্রিটিশ রাজি হল না। জেলখানার মধ্যে কিশোরী-যুবতী মেয়েদের তাঁর সেবায় লাগালে যদি কোনও অঘটন ঘটে যায়? কে নেবে তার দায়িত্ব? অতএব সেবার জন্য ডাক পড়ল কস্তুরবার। এতদিনে স্বামীর কাছাকাছি হওয়ার সুযোগ পেলেন তিনি।

১৯৪৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে সেখানেই মৃত্যু হয় কস্তুরবার। কোন পরিস্থিতিতে তাঁর মৃত্যু হয় সেই বিষয়টির দিকে নজর দিলে বিলেত ফেরৎ গান্ধীর, সাধুপ্রতিম গান্ধীর চরিত্রের আর একটি রহস্যাবৃত দিকের সন্ধান পাওয়া যায়। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, এই মানুষটি আদৌ শিক্ষিত ছিলেন কিনা, আদৌ আধুনিকমনস্ক ছিলেন কিনা। সেই সঙ্গে নিতান্ত অনুচিত হলেও আর একটি প্রশ্নও আসে মনে — তা হল, গান্ধী নিজে কস্তুরবার মৃত্যু চেয়েছিলেন কিনা। সেই কথা বলি এবার।

কস্তুরবার মৃত্যু : আগা খান প্যালেসের জেলখানায় যাওয়ার সময় কস্তুরবা শারীরিকভাবে খুব সুস্থ ছিলেন না। রক্তচাপ জনিত অসুখ ছিল, কয়েকবার ছোটোখাটো হার্ট অ্যাটাকও হয়েছিল। বন্দি থাকার সময়ে তাঁর ব্রংকিয়াল নিউমোনিয়া হল। ছোটো ছেলে দেবদাস চেয়েছিলেন মায়ের জন্য অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা। যে চিকিৎসার অঙ্গ হিসেবে ডাক্তার বলেছিলেন, পেনিসিলিন নিতে। গান্ধী আপত্তি করলেন। তিনি ভারতের চিরায়ত চিকিৎসার মাধ্যমে স্ত্রীকে সুস্থ করার পক্ষে রায় দিলেন। কী সেই চিরায়ত চিকিৎসা? চরক নয়, সুশ্রুত নয়, আয়ুর্বেদ নয় — কেবলমাত্র গঙ্গাজল। তৎসহ রামনাম। চিকিৎসা জগতে বিপ্লব তখন আসছে বিপুলভাবে। আবিষ্কার হয়েছে নানান অ্যান্টিবায়োটিক। ডাক্তারের সঙ্গে ছেলেরা বাবাকে বিস্তর অনুনয় করল। কিন্তু গান্ধীর সাফ কথা — যা করার, পরমেশ্বর করবেন।

১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪ তারিখে গান্ধী তাঁর *The Life and Death of Mahatma Gandhi*-তে ঘটনাটির বিবরণ দিচ্ছেন এইভাবে "If God wills it, He will pull her through... You cannot cure your mother now, no matter what wonder drugs you may muster. She is in God's hands now."

ছেলে দেবদাস তবুও হাল ছাড়েননি। ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখেও বাবাকে কাতর প্রার্থনা করছেন — পেনিসিলিন ইন্‌জেক্‌শন দেওয়ার জন্য। গান্ধী তার উত্তরে নিদারুণ রুষ্ট হয়ে বলেছিলেন — "Why don't you trust God?"

কস্তুরবার মৃত্যু হয় সেদিনই। তাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিলাল তখন ভবঘুরে, যক্ষ্মারোগগ্রস্ত, রাস্তায় ভিখারির জীবন যাপন করছেন। মায়ের মৃত্যুর খবরে ছুটে এসেছিলেন। ঢুকতে চেয়েছিলেন প্রাসাদে। রক্ষীরা তাঁকে পাগল ভিখারি বলে ঢুকতে

দেয়নি। সে বারবার বলেছিল, সে বাপুর ছেলে। তার মা মারা গেছে। কেউ বিশ্বাস করেনি তাঁর কথা। সেটা অন্য প্রসঙ্গ। পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করব। এখন কস্তুরবার মৃত্যু এবং তারপর গান্ধী কী করেছিলেন, সেই কথা বলি।

কস্তুরবার দেহ সৎকার হয়ে গেছে। সেদিন রাতে গান্ধী হঠাৎ ডুক্‌রে কেঁদে উঠলেন — "But how God tested my faith!" কীভাবে ভগবান তাঁর ঈশ্বরভক্তির পরীক্ষা নিলেন? কস্তুরবার এক চিকিৎসককে তিনি জানিয়েও দিলেন সেই পরীক্ষার বৃত্তান্ত। বললেন — "যদি অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়াও হত, তবু সে বাঁচত না। কিন্তু আমি যদি রাজি হতাম তোমাদের প্রস্তাবে, তবে তা 'would have meant the bankruptcy of my faith'।

গান্ধীর ভগবৎ-প্রেম, ঈশ্বর-ভক্তি তথা বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই, যদি সেই বিশ্বাসে সমতা বা uniformity বলে কিছু থাকত। দুর্ভাগ্য সেই ব্যাপারটা তাঁর ছিল না।

কস্তুরবার মৃত্যুর দেড় মাস পর গান্ধী নিজে ম্যালেরিয়াতে শয্যাশায়ী হলেন। প্রথমটায় গঙ্গাজল ও রামনাম পথ্য করলেন বটে। তিন সপ্তা গেল এভাবে। যখন রোগ আরও জোরে তাড়া করল, তখন অ্যান্টিবায়োটিক ও অন্যান্য ওষুধ নিতে দেরি করলেন না এবং আরোগ্যও লাভ করলেন। হতভাগ্য কস্তুরবা এই সুযোগটি পান নি। (দ্রষ্টব্য : —*Gandhi's Hypocrisy; Anyone is Easily as Moral as Their Heroes* By Russ Kick)।

গান্ধীর সন্তানেরা

গান্ধীর প্রথম সন্তানের মৃত্যু জন্মের কয়েকদিনের মধ্যে ঘটে। তারপর তাঁর চারটি পুত্রসন্তান হয়। প্রথম পুত্র হরিলাল (১৮৮৮-১৯৪৮) ও দ্বিতীয় পুত্র মণিলালের (১৮৯২-১৯৫৬) জন্ম ভারতে। তৃতীয় পুত্র রামদাস (১৮৯৭-১৯৬৯) ও কনিষ্ঠপুত্র দেবদাসের (১৯০০-১৯৫৭) জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকাতে। মহাত্মা গান্ধীর নাম যতটা বিপুলভাবে আলোচিত হয়েছে সারা পৃথিবী জুড়ে, ততটাই অন্ধকারে থেকেছে তাঁর সন্তানদের নাম। একটা কথা সাধারণভাবে বলা হয় যে, বিখ্যাত পিতার সন্তানরা সবচেয়ে অবহেলিত হয়। কিছুটা হলেও একথা সত্য। জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছেলে রথীন্দ্রনাথকে একবার নিয়ে গেছেন বিদেশ ভ্রমণে। একটি রেলস্টেশনে সমবেত জনতা রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনায় মেতে রইলেন, বিপুল সংবর্ধনা সহকারে তাঁকে নিয়ে চলে গেলেন আর তাঁর ছেলে পড়ে রইল রেলস্টেশনে। অনেকক্ষণ পরে ব্যাপারটা খেয়াল হল রবীন্দ্রনাথের, খোঁজ করলেন ছেলের, তখন রেলস্টেশন থেকে উদ্ধার করা হল তাকে।

আবার উল্টোরকমের ঘটনাও যে দেখা যায় না, তা নয়। অনেক বিখ্যাত মানুষ একেবারে সন্তান-অন্ত প্রাণ। যেমন জওহরলাল নেহরু। কন্যা ইন্দিরার কিসে ভাল হবে, সেই চিন্তা সবসময় মাথায়। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ মাই ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া লেখা হয়েছিল পত্রের আদলে। জেলখানায় বসে ইন্দিরাকে লিখেছিলেন এইসব পত্র। ভারতের বর্তমান সময়ের রাজনীতি, বিশেষ করে কংগ্রেসি ঘরানার রাজনীতির যারা প্রধান পুরুষ, তারা রাজপাট সাজিয়ে রাখেন সন্তানের জন্য। এই ঘরানার প্রাণপুরুষ দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহরু। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে কংগ্রেসি নেতাদের ডেকে ডেকে তিনি বলেছিলেন — 'আমার পর ইন্দুরই পাওয়া উচিত, ইন্দুরই পাওয়া উচিত।'

এই পাওয়া হল ভারত-শাসনের অধিকার পাওয়া। সামান্য সময়ের অপেক্ষা, তারপর ইন্দু বা ইন্দিরা হাসিল করেছিলেন প্রধান মন্ত্রিত্বের কুর্সি। ইন্দিরা তাঁর উত্তরাধিকার দিতে চাইছিলেন ছোট ছেলে সঞ্জয়কে। তার অকালমৃত্যু এই চাওয়ার পথে বাধা তৈরি করায় এল বড় ছেলে রাজীব। রাজীব পেলেন সিংহাসন। তার মৃত্যু যখন হয়, তখন পুত্র রাহুল আর কন্যা প্রিয়াংকা ছোট। আর সোনিয়াও তেমন উৎসাহী ছিলেন না প্রথমটায়। কয়েক বছর কাটাবার পর বুঝলেন, সন্তানদের স্বার্থ দেখতে হবে তাঁকেই। অতএব নেমে পড়লেন রাজনীতিতে। ভোটে জিতে রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালামের কাছে দাবি পেশও করলেন। কিন্তু সাংবিধানিক কিছু ব্যবস্থার কারণে আশা পূর্ণ হল না। অতএব সিংহাসনের দায় একটি পুতুলের ঘাড়ে চাপিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলেন কবে খোকা (রাহুল) বড় হবে, তার জন্য।

গান্ধী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের গোত্রের। তবে পুরোপুরি যে সেই গোত্রের, তাও নয়। রবীন্দ্রনাথ তবু তো রথীন্দ্রনাথের পড়াশোনা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতেন, ছেলেকে নিয়ে দেশে-বিদেশে সমানভাবে ঘুরতেন, সন্তানের মানুষ হওয়ার পথে সর্বদা নজর রাখতেন। কিন্তু গান্ধী ছিলেন একেবারে আত্মকেন্দ্রিক। তাঁর যে সন্তানাদি আছে, সেটাই বুঝি মনে থাকত না। বিপুল পরিসরের আত্মজীবনীতে সন্তানদের উল্লেখ আক্ষরিক অর্থেই না-থাকার মত।

গান্ধী সম্পর্কে বলা হয়, মাঝামাঝি হওয়াটা তিনি পছন্দ করতেন না। যেটা বিশ্বাস করতেন, সেটা চরমভাবে করতেন। সন্তানদের ব্যাপারে, সন্তানদের ভবিষ্যতের ব্যাপারেও তাঁর চিন্তাভাবনা ছিল এমনই চরম। একটি বহু প্রাচীন হিন্দি প্রবাদবাক্যের প্রতি গান্ধীর ছিল দৃঢ় বিশ্বাস — সেটা হল — 'বাপ কা বেটা, সিপাহী কা ঘোড়া'। অর্থাৎ ভাল বাপ হলে বেটাও ভাল হতে বাধ্য। সুতরাং নজর দেওয়ার দরকার নেই, ধর্মের নামে ছেড়ে রাখো। তার ওপর

আত্মকেন্দ্রিক মানুষের নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার একটা স্বাভাবিক ব্যামো তো আছেই। আর গান্ধীর যে অসম্ভব আত্মকেন্দ্রিকতা ছিল, তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। ফলে গান্ধী যে উচ্চতার মানুষ, তাঁর সন্তানেরা সেই তুলনায় পিগ্‌মি হয়েই রয়ে গেলেন। অহিংসা, সত্যাগ্রহ, সম্প্রীতি, ব্রহ্মচর্য ইত্যাদি বিষয়ে জীবনভোর যে আজব পরীক্ষা-নিরীক্ষা তিনি চালিয়েছেন, সেই পরীক্ষারই আর এক গিনিপিগ হয়ে গিয়েছিল তাঁর সন্তানেরা। তাই যে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানসিকতা বিপুলভাবে আবর্তিত হয় সন্তানের ভবিষ্যৎ-ভাবনায়, সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা চরিত্রগঠন ইত্যাদির ভাবনায়, সেই ভাবনার বিন্দুমাত্র গান্ধীর মধ্যে না থাকায় তাঁর সন্তানরা আদৌ গঠন করতে পারল না তাদের জীবন।

আর এব্যাপারে সবচেয়ে ভুগতে হল গান্ধীর জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিলালকে। পড়াশোনা করতে গান্ধী নিজে গিয়েছিলেন লন্ডনে, কিন্তু পুত্রকে লন্ডন তো দূরের কথা, ভাল একটা স্কুলেও পাঠালেন না। গান্ধী তাঁর সহজ আদর্শের — সরল জীবনযাত্রা, অপ্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার অনুসরণ করতে গিয়ে হরিলালকে স্কুলে পাঠালেন না, নিজেও শিক্ষাদানের ভার নিলেন না। ফলে পড়াশোনা যেমন হল না হরিলালের, চরিত্রগঠনও হল না। যে জিনিষটি প্রচণ্ডভাবে হল, তা হল, পিতার প্রতি অসম্ভব এক ঘৃণা। গান্ধী যেসব জিনিষের সপক্ষে কথা বলতেন, যেসব গুণাবলীকে অনুসরণ করার কথা বলতেন জীবনে, হরিলাল তার বিরুদ্ধ কাজগুলিই বেশি বেশি করে করতে থাকল। সে পাঁড় মাতাল হল, পাকা জালিয়াত হল, পুলিশের খাতায় দাগী অপরাধী হল। বাবার প্রতি ঘৃণা ও আক্রোশ যে তার কতটা, সেই প্রমাণ দেওয়ার জন্য সে সবসময় উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত এবং নিজেকে জড়িয়ে নিত নানান কুকর্মের সঙ্গে। প্রায়শই বাবার সঙ্গে ঝগড়া হত হরিলালের। তার জীবনটা যে তার বাবা শেষ করে দিয়েছে, তাকে যে মানুষ করে তোলার কোনও চেষ্টা তার বাবা করে নি — এই সব কিছুই উঠে আসত তার ঝগড়ায়। এমন কি, তার মায়ের প্রতিও যে বাবা খারাপ ব্যবহার করতেন, ঝগড়ার সময় সেসবও তুলত হরিলাল। অনেকের মতে বিভিন্ন নরনারীর সঙ্গে বাবার 'প্লেটনিক লভ্‌' নিয়েও রীতিমত ব্যঙ্গ করত সে। এই সবের হাত থেকে বাঁচার জন্য গান্ধী ছেলের বিয়ে দিলেন। সেই দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসকালে। বিয়ের পর একটু সংসারী ভাব হয়। কিন্তু হঠাৎই মৃত্যু হয় হরিলালের স্ত্রী চঞ্চলার ওরফে গুলাবীর। সেটা ১৯১৮ সাল। গান্ধী তখন ফিরে এসেছেন ভারতে। হরিলাল তার সন্তানাদি নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাতে। সেখান থেকে সে বাবাকে লিখল — মা না থাকায় বাচ্চাদের খুব কষ্ট হচ্ছে। অতএব বাবা যেন তাঁর দ্বিতীয় বিবাহে মত দেন।

গান্ধী তখন ব্রহ্মচর্য পরীক্ষায় নিয়োগ করেছেন নিজেকে। বিবাহ করার বিরুদ্ধে প্রচুর লিখছেন। বলছেন, সন্তান উৎপাদনের জন্যই বিবাহের দরকার, সন্তান নিয়ে আসার জন্য যৌনক্রিয়ার দরকার। অতএব যেই এসে গেল সন্তান, স্বামী-স্ত্রী যেন এক শয্যায় না থাকে, যেন যৌনক্রিয়া না করে। তখন যেন পরস্পরকে ভাই-বোন বা মা-ছেলের মত দ্যাখে। হরিলালের যখন চারটি বাচ্চা হয়ে গেছে, তখন আর স্ত্রীর দরকার কেন পড়বে? অতএব বিবাহে মত দিলেন না গান্ধী। এই ঘটনা বাবার সঙ্গে ছেলের বিচ্ছেদ চূড়ান্ত করল। অধঃপাতের শেষ ধাপে পৌঁছে গেল হরিলাল। বাবাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সে হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে মুসলমান হল। নাম নিল আব্দুল্লা গান্ধী। তাকে স্বধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য গান্ধী সাহায্য নিয়েছিলেন আর্য সমাজের সন্ন্যাসী স্বামী শ্রদ্ধানন্দের। শ্রদ্ধানন্দ তাঁর কাজে সফলও হয়েছিলেন, কিন্তু মহান গান্ধীর কী চরিত্র ভাবুন! ধর্মান্তরিতদের স্বধর্মে ফিরিয়ে আনার কাজে ব্রতী শ্রদ্ধানন্দকে যখন হত্যা করল মুসলমান মৌলবাদীরা, তখন এই শ্রীযুক্ত গান্ধীই সর্বপ্রথম শ্রদ্ধানন্দের সমালোচনা করে তার খুনীকে নির্দোষ বলেছিলেন। থাক্ সে কথা। অন্য প্রসঙ্গ সেটি।

১৯৪৮ সালে গান্ধী যখন নিহত হন, তখন হরিলালের সব কয়টি ছেলে-মেয়েই প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে। কিন্তু তাদের সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তারা যেন স্রেফ উবে গেছে ইতিহাসের বা জীবনের পাতা থেকে।

ভারতে ফিরে এসেও হরিলালের অবস্থার ক্রম-অবনতি হতে থাকে। মাতাল জুয়াড়ি অপরাধী চরিত্রের মানুষ তো সে আগে থেকেই ছিল। এবার তার ঠিকানা হল ফুটপাত। ভবঘুরে জীবন। বারংবার প্রকাশ্যে মাতলামির অভিযোগে পুলিশ তাকে কয়েদ করেছে। এইরকম চলতে চলতে ১৯৪৪ সালে একদিন সে খবর পেল, তার মা কস্তুরবার মৃত্যু হয়েছে পুনার আগা খান প্যালেসে। মাকে শেষ দেখার জন্য এল সে। পরণে ছিন্ন পোযাক, ভবঘুরে, নেশাগ্রস্ত মানুষটি এসে দ্বাররক্ষীদের অনুনয় করতে থাকল তাকে মায়ের কাছে যেতে দেওয়ার জন্য। দ্বাররক্ষীরা ঠাট্টা করে বলল — কে তোর মা? কে তোর বাবা? হরিলাল করযোড়ে বলল, তার মা কস্তুরবা, তার বাবা গান্ধী। দ্বাররক্ষীরা হেসে উড়িয়ে দিল, ধাক্কা মেরে তাকে ফেলে দিল বাইরে। একই ঘটনা ঘটেছিল গান্ধীর মৃত্যুর পরেও। বাবার শেষকৃত্যে হরিলাল হাজির হয়েছিল বেহেড মাতাল হয়ে। সে যে গান্ধীর সন্তান — অনেকেই এটা বুঝতে পারেননি। বাবার মৃত্যুর ঠিক চার মাস পরে এক যক্ষ্মা হাসপাতালে রোগগ্রস্ত হরিলালের মৃত্যু হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্যক্তিগত গান্ধী : বিকৃত আত্মবিলাসী

ব্যক্তিজীবন বনাম সমাজজীবন : অনেকে মনে করেন, ব্যক্তিগত জীবন দিয়ে বিখ্যাত মানুষদের বিচার করতে নেই, বিখ্যাত মানুষরা বিচারযোগ্য তাঁদের কাজের মাধ্যমে। তাঁদের সৃষ্টির মাধ্যমে। আবার অনেকে মনে করেন, বিখ্যাত মানুষ বলে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের দিকে তাকানো চলবে না — এই মত মানতে গেলে ভণ্ডামিতে ভরে যাবে দুনিয়া। সবাই মুখে বলবে বড় বড় আদর্শের কথা, আর করবে যত আদর্শহীন কাজ। 'আমি যা বলি, তাই করো। আমি যা করি, তা কোরো না' — এই আপ্তবাক্যের আড়ালে সবাই শুধু জ্ঞানদানের খনি হয়ে উঠবেন অথচ নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন ভরিয়ে তুলবেন পাপকর্মে। এজন্যেই ওপরের আপ্তবাক্যটির বিপরীতে তৈরি হয়েছে আর এক আপ্তবাক্য — 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখাও।' অর্থাৎ, আগে নিজে ঠিক ঠিক ধর্মাচরণ করো, তারপর অন্যকে শেখাতে যেয়ো। এই দুই বিপরীতমুখী বিশ্বাসের মধ্যপন্থাটি বলে — 'দেবতাও ভুল করে, মানুষ তো কোন্ ছার।' যার ভাবার্থ, মানুষ ভুল করে, কিন্তু সেই ভুলটাকে যেন কেউ বড় করে না দ্যাখে, তার দেবত্ব অর্থাৎ ভাল ব্যাপারগুলিকে তার ভুলত্রুটির সঙ্গে যেন মিলিয়ে দেখা হয়।

আমাদের দেশে শেষোক্ত অর্থাৎ মধ্যপন্থীদের সংখ্যা কম। প্রথমোক্ত দুটি মতের বিশ্বাসীরাই বেশি। ভক্তরা যাঁকে শ্রদ্ধা করে, তাকে দেবতা না বানিয়ে যেমন ছাড়ে না, তেমনই বিরোধীরা আবার যাকে সহ্য করে না, টেনে হিঁচড়ে মাটিতে ফেলে গায়ে ভাল করে কাদা না মাখালে শান্তি পায় না। ভুল বললাম একটু। কাদা নয়, গায়ে মুখে একেবারে আলকাতরার গাঢ় কালো রঙ মাখিয়ে দেয় যা তোলা অত সহজ নয়। এইজন্যেই আমাদের দেশে বছর বছর যেমন গুরু-মহারাজদের প্রচুর (বাম্পার) ফলন হয়, তেমনই সেইসব গুরু মহারাজদের চিৎপটাং করে মাটিতে ফেলে শ্রাদ্ধ করতেও দেরি হয় না। এসব ব্যাপারে আমরা একেবারে চরমপন্থী।

প্রেক্ষিতটা বললাম, তার কারণ, গান্ধী মহারাজকে আমরা সাধারণভাবে এই দৃষ্টিতে দেখতে শিখেছি। যারা তাঁর larger than life মূর্তি তৈরি করে দেশের সর্বত্র স্থাপিত করেছে, তারা তাঁকে ভগবান ছাড়া অন্য কোনও ভাবে

ভাবতেই পারে না। এইসব ভক্তদের সংখ্যাই বেশি, বহুকাল আগে থেকে তারা গান্ধীকে ভগবান বানিয়ে দিয়ে বাজারে ছেড়েছে। যত না গান্ধীর স্বার্থে, তারও চেয়ে বেশি নিজেদের স্বার্থে। বিরোধী মতটা উঠতে শুরু করেছে অনেক পরে। গান্ধী সম্পর্কে নানান তথ্য যত বেরোচ্ছে, তত এই গান্ধী-সমালোচকরা দলে ভারি হচ্ছে। সমালোচনার সর্বাধিক তির গান্ধীর ব্যভিচার নিয়ে। এব্যাপারে কিছু তথ্য গান্ধী নিজেই যুগিয়ে গিয়েছেন তাঁর বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে, কিছু তথ্য মিলেছে তাঁর পরিচিত জনদের অভিজ্ঞতা থেকে, আবার অনেক তথ্য উঠে আসছে বিশ্বজোড়া গবেষকদের গবেষণা থেকে। যেহেতু তাঁর প্রসিদ্ধি বিশ্বজোড়া, তাই তাঁর সম্পর্কে দেশ-কাল-পাত্রভেদে বহু মানুষ বহু কিছু লিখেছেন এবং লিখছেন। এখানে আবার এক মুশকিল বেধেছে আমাদের ভারতীয় মানসিকতা নিয়ে। আমরা কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর লীলাসঙ্গিনী শ্রীরাধাকেও ভক্তি করি। কিন্তু বিখ্যাত পুরুষদের কথা উঠলে সিঁটিয়ে যাই। তাঁদের যে সৃষ্টিকর্তা একটি করে পুরুষাঙ্গ দিয়েছেন এবং সেই অঙ্গটির যে মূত্রত্যাগ ছাড়া অন্য কিছু ক্রিয়াকর্মেরও প্রয়োজন পড়ে, সেটা আমরা ভাবতেই চাই না। ফলে নানান ঝঞ্ঝাট বাধে। বিদেশী গবেষকদের আমাদের মত এমন ছুঁৎমার্গ নেই। তাঁদের অনেকের কাছে এসব স্বাভাবিক ব্যাপার। যখন অবশ্য মাত্রা স্বাভাবিকত্বের সীমা ছাড়ায়, তখন তাঁরাও সেই অস্বাভাবিকত্ব নিয়ে বলেন, তবে তা কখনই সমালোচনার গণ্ডি ছাড়িয়ে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির পর্যায়ে যায় না। উদাহরণ হিসেবে পেশ করা যেতে পারে আমেরিকার প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব মার্টিন লুথার কিং (জুনিয়র) -এর ব্যক্তিগত জীবন। আমেরিকার সর্বকালের ইতিহাসের সবচেয়ে খ্যাতনামা ব্যক্তিদের তালিকায় কিং-এর নাম কোথায়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অনেকের মতে সবার ওপরে আছে তাঁর নাম। তিনি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক, তিনি সাম্যবাদী, তিনি অহিংসার পূজারী, তিনি সরকারের দমন নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিরলস সেনাপতি, তিনি আমেরিকার মুক্তচিন্তার ইতিহাসে উজ্জ্বলতম নাম। এহেন মানুষটিও আদি রিপুর তাড়নার কাছে পরাজয় স্বীকার করেছেন বড় শোচনীয় ভাবে। তাঁর স্ত্রী ছিল, সংসার ছিল, তবু একাধিক নারীর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করেছেন। প্রেমের সম্পর্ক যত না, তার চেয়ে অনেক বেশি কামের সম্পর্ক। সেই সব সম্পর্কের কাহিনি রসালো ভাবে জনতার সামনে তুলে ধরে আমেরিকার তৎকালীন গোয়েন্দা সংস্থা ফেডেরাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (এফ বি আই) রাজনৈতিকভাবে শেষ করে দিতে চেয়েছিল কিংকে। রাষ্ট্রপতি লিণ্ডন জনসন তাঁকে আখ্যা দিয়েছিলেন — ভণ্ড ধর্মপ্রচারক (hypocritical preacher),

এফ বি আই তাঁকে চরমপত্র দিয়ে বলেছিল, তাদের দাবি মেনে ৩৪ দিনের মধ্যে বিশেষ একটি কাজ করতে, নইলে তাঁর মুখোশ খুলে দেওয়া হবে জাতির সামনে। সারা আমেরিকা দেখবে, কীরকম নোংরা চরিত্রের একটি মানুষকে তারা নায়কের আসনে বসিয়েছে।

মার্টিন লুথার কিং সেই ব্ল্যাকমেলের কাছে মাথা নোয়ান নি। তাঁর স্ত্রী করেটা স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করেছিলেন স্বামীর এই অবৈধ যৌনাচার। বলেছিলেন — 'আমার আর আমার স্বামীর মধ্যে যে উচ্চস্তরের বন্ধন আছে, সেখানে ওইসব ঘটনার কোনও জায়গা নেই' (all that other business just doesn't have a place in the very high level relationship we enjoyed)। কিং-এর জীবনীকার ডেভিড গ্যারো তাঁর ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত — *Bearing the Cross* বইতে এইসব অবৈধ সম্পর্কের ব্যাপারে কিং কী বলেছেন সেকথা লিখেছেন। কিং তাঁর বিবাহ-বহির্ভূত যৌন সম্পর্কগুলিকে বলেছেন — 'উৎকণ্ঠা নিরসনের রাস্তা' (a form of anxiety reduction)। একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য স্বীকার করেছেন — ঘটনাগুলি তাঁর কাছে যন্ত্রণার এবং অমার্জনীয় অপরাধও বটে।

অর্থাৎ তিনি তাঁর ত্রুটি স্বীকার করেছেন, তার জন্য অপরাধবোধে যে ভুগছেন, সে কথা মেনেছেন। আমেরিকাবাসী এই অপরাধে তাঁকে নির্বাসনে পাঠায়নি। ইতিহাসে তাঁর যে স্থান প্রাপ্য, তা তাঁকে দিয়েছে। মোহনদাস কর্মচন্দ গান্ধীর সঙ্গে তাঁর ফারাক এখানে। গান্ধী তাঁর ভুলকে স্বীকার করতেন না। তিনি যে অন্যায় করেছেন বা করতে পারেন, সেটা মানতে চাইতেন না। বরং আদর্শ-টাদর্শের বড়বড় কথা বলে ভুলগুলিকে ও অন্যায়গুলিকে মহৎ বানাবার চেষ্টা করতেন। আর আমরা সাধারণ ভারতবাসীরা নানান অলঙ্কারে বিভূষিত এই দেবমূর্তিকে দেখে ভক্তিতে গদগদ হয়ে পড়ে জয়ধ্বনি দিয়ে গেছি তাঁর নামে। একবার দেখতে চেষ্টা করি নি অলঙ্কারের নীচের আসল চেহারাটিকে। সেই দেখাটি এতদিন পরে অবশ্য জোর কদমে শুরু হয়েছে। উঠে আসছে নানান তথ্য। তথ্য তাঁর ব্যভিচার সম্পর্কে।

গান্ধীজির ব্যভিচার সাম্প্রতিক কালের ভারতে এক গরম আলোচনার বিষয়। বলা বাহুল্য, আলোচনাটিকে গরমতর করার জন্য যতরকম মালমশলা দেওয়া সম্ভব, সবই মজুত আছে। দেওয়া হচ্ছেও। উদ্দেশ্য একটাই, তা হল গান্ধী যে একজন হার্ডকোর ব্যভিচারী — সেটা প্রমাণ করা। এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যাবে এবার। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি, আরও ভাল করে বললে,

মশলাগুলি — স্বাভাবিকভাবেই উঠবে আলোচনায় এবং আমরা দেখার চেষ্টা করব, তিনি সত্যিই ব্যভিচারী ছিলেন কিনা। যথারীতি শেষ বিচারের ভারটি পাঠকের। শুরু করা যাক তাঁর যৌনতা নিয়ে।

গান্ধী-মিথে সর্বাধিক আঘাত আসতে শুরু করেছে তাঁর 'ব্যক্তিগত জীবনচর্যা' নিয়ে। দেবত্ব-আরোপিত এই মানুষটির ব্যক্তিগত জীবন — আরও পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে তাঁর যৌনজীবন নিয়ে যেসব বিস্ফোরক তথ্য ইতিমধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে প্রবল মাত্রায় কামুক বলেছেন অনেকে, অনেকে তাঁকে বলেছেন হোমো-সেক্সুয়াল। বহু নারীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখার ব্যাপারেও তাঁকে অভিযুক্ত করা হায়ছে। যে ব্রহ্মচর্য-পরীক্ষা নিয়ে তাঁর অতি মাত্রায় উৎসাহ ছিল, সেই ব্রহ্মচর্যকেও অনেকে আখ্যা দিয়েছেন বিকৃত যৌনাচার হিসেবে। অনেক গান্ধী জীবনীকার গান্ধী চরিত্রের বহু দিকের ভূয়সী প্রশংসা করলেও ব্যক্তিগত গান্ধীর সম্পর্কে কটু মন্তব্য করা থেকে বিরত হতে পারেননি। বলেছেন, কামকে দমন করতে গিয়ে তাঁর মধ্যে অসুস্থতার জন্ম হয়েছিল। এই অসুস্থতা বেড়ে গিয়েছিল অপরিমেয় রাজনৈতিক ক্ষমতা পাওয়ার ফলে। সাধারণভাবে অনেক পুরুষ (এবং নারীও) কামকে দমন করতে গিয়ে বিকৃত মানসিকতার শিকার হন, চিকিৎসা এবং সেইসঙ্গে সামাজিক বাধানিষেধের চাপ — এই সবকিছু মিলে তাঁদের বিকৃতি দূর হয় ও তাঁরা সুস্থপথে ফিরে আসেন।

কিন্তু গান্ধীর ক্ষেত্রে তা হয়নি। এর দায় তাঁর নিজের। নিজের বিকৃতিকে তিনি সুস্থতা বলে শুধু যে দেখেছেন তাই নয়, সেই বিকৃতিকে আদর্শের নামাবলী চাপিয়ে মহান ব্যাপার বলে প্রচারও করেছেন। যেসব আলোচনাকে যৌনগন্ধী ও অপ্রকাশযোগ্য বলে সাধারণভাবে মনে করা হয়, তিনি অক্লেশে ও প্রকাশ্যে সেইসব আলোচনা দিব্যি করে গেছেন। যারা শুনত সেই আলোচনা, তারা লজ্জা পেত। কিন্তু গান্ধীর গর্ব হত, তিনি ভাবতেন, সত্যকে প্রকাশ করার সৎ সাহস আছে তাঁর মধ্যে। কিছু ব্যাপারকে আড়ালে রাখা ও অপ্রকাশ্য রাখা যে সমাজ ও সংসারের মঙ্গলের জন্য দরকার হয়, এটা তিনি মানতেন না। হয়তো এই কারণেই স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব ছিল।

ব্যক্তিগত গান্ধীর এই দিকগুলো নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব।

যৌনতা ও ধর্ম দুই বিষয়েই গান্ধী ছিলেন চরমপন্থী

ওপরের উক্তিটি জওহরলাল নেহরুর। গান্ধীজি সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন — '(Gandhi) can think only in extremes - either extreme eroti-

cism or asceticism'। গান্ধীর সঙ্গে কস্তুরবার বিয়ে হয়েছিল যখন দুজনেরই বয়স সবে তের। কস্তুরবা কয়েক মাসের বড় ছিলেন। বিয়ের দু বছরের মাথায় কস্তুরবার গর্ভে সন্তান আসে। গান্ধীর বয়স তখন সাড়ে পনের। কস্তুরবার ষোল। এই সন্তানটি জন্মের কয়েকদিন পর মারা যায়। এই সন্তান যখন কস্তুরবার গর্ভে, তখন সেই বহুলখ্যাত ঘটনাটি ঘটেছিল। যার কথা গান্ধী নিজে লিখেছেন। পাশের ঘরে পিতা মৃত্যুশয্যায়, তিনি পিতার সেবা করছিলেন, এমন সময় এলেন তাঁর এক কাকা। তিনি গান্ধীকে বললেন, নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়তে। গান্ধী চলে এলেন শুতে। ঘরে ছিলেন তাঁর গর্ভবতী স্ত্রী। তাকে জাগিয়ে তিনি যৌনক্রিয়া করলেন। সবে শেষ করেছেন সেই ক্রিয়া, এমন সময় চাকর এসে ঘরের দরজায় ধাক্কা দিল, গান্ধীকে বলল তাঁর পিতৃদেবের মৃত্যু হয়েছে। এই অপরাধবোধ, এই পাপবোধ, এই যন্ত্রণা তিনি কখনও ভুলতে পারেন নি। অকপটে আত্মজীবনীতে লিখে গিয়েছেন — 'This shame of my carnal desire even at the critical hour of my father's death... is a blot I have never been able to efface or forget and I have always throught that although my devotion to my parents knew no bounds... yet it was weighed and found unpardonably wanting because my mind was at the same moment in the grip of lust. I have, therefore, regarded my-self as a lustful, though a faithful husband. It took me long to get free from the shackles of lust and I had to pass through many ordeals before I could overcome it.' অর্থাৎ, পিতা মৃত্যুশয্যায় আছেন এমন সঙ্কটের সময়েও ইন্দ্রিয়ভোগের এই বাসনা আমার মধ্যে যে কলঙ্কের ছাপ ফেলেছিল, তাকে আমি সারাজীবনেও মন থেক মুছে ফেলতে বা ভুলে যেতে পারিনি। যদিও পিতামাতার প্রতি কর্তব্যে আমার কোনও ঘাটতি ছিল না, তথাপি এমন দুঃসময়ে আমি কামনার বশীভূত হয়েছিলাম — এইজন্য নিজেকে ক্ষমার অযোগ্য ভাবতাম। আমি তাই নিজেকে কামনার দাস মনে করতাম, যদিও, স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত ছিলাম। এই কামনার হাত থেকে মুক্তি পেতে অনেক সময় লেগেছিল আমার এবং অনেক কষ্ট করে নিজেকে মুক্ত করেছিলাম।

যে ঘটনার জন্য গান্ধী নিজেকে ক্ষমার অযোগ্য বলে মনে করেছিলেন, সেটা তাঁর বয়সের কথা বিবেচনা করলে মারাত্মক কিছু অপরাধ বলে মনে করা যায় কি? প্রথমত, তাঁর পিতার শারীরিক অবস্থা নিশ্চয় এমন ভয়ঙ্কর রকমের খারাপ ছিল না যে, কয়েক মিনিটের মধ্যে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তা থাকলে গান্ধীর কাকা সেখান থেকে তাঁকে উঠিয়ে দেওয়ার কথা ভাবতেন না,

কিংবা ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ার কথা বলতেন না। বেশ কিছুদিন ধরে তাঁর অসুস্থতা চলছিল, এই দিনটা ছিল সেই অসুস্থতার সময়ের একটা দিন। বাড়ির কোনও মানুষের অসুস্থতা যখন দীর্ঘদিন ধরে চলে, তখন অসুস্থতার প্রথম দিকে বাড়ির লোকের মধ্যে যে টানটান উদ্বেগটা থাকে, সেটা আস্তে আস্তে কমে আসে। এটা কোনও অবজ্ঞা নয়, ভালবাসার অভাবও নয়। এটা আসলে জীবনের সাধারণ চলন। মনে রাখতে হবে, বাবার মৃত্যুশয্যার পাশে গান্ধীর মা ছিলেন না। তিনি নিশ্চয় আর একটা ঘরে শুয়েছিলেন। কাকা এসে যখন ভাইপোকে (অর্থাৎ গান্ধীকে) ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়তে বলছেন, তখন মা সেখানে থাকলে তাঁর কথা নিশ্চয় লিখতেন তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে। তা কিন্তু লেখেন নি। তাহলে অমার্জনীয় অপরাধ কী এমন করেছিলেন তিনি? কিছুই না। তিনি তো জানতেন না যে, তাঁর অসুস্থ পিতা — যাঁকে একটু আগে দেখে এসেছেন — তিনি ঠিক ওই সময়ে মারা যাবেন! আর স্ত্রী সঙ্গে যৌনক্রিয়া? সেটাও কি ভয়ঙ্কর রকমের কোনও অপরাধ? তা কেন হবে? পনের বছরের একটি ছেলে — যে বয়সে যৌন আবেগ প্রশমনের জন্য হস্তমৈথুন করাটা স্বাভাবিক নিয়ম — সেই বয়সে একটি নারীশরীর পেলে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখাটা কি করে সহজ হবে, একথা মাথায় ঢুকছে না। আসলে তিনি কোনও অপরাধই সেদিন করেননি, যা করেছেন তা ওই বয়সের একটা সাধারণ ও স্বাভাবিক পুরুষের কাজ। কিন্তু এই ঘটনা তাঁর মনের মধ্যে জন্ম দিয়েছে এক অপরাধবোধের। তিনি তাঁর কাজকে পুত্রোচিত কাজ মনে করতে পারেন নি। এমন কথাও তাঁর মনে হয়েছে, পিতার মৃত্যুর সময় স্ত্রী-সঙ্গ করে মহাপাতকের কাজ করেছেন। এই অপরাধবোধ যে তাঁর কিশোরমনকে কতটা আলোড়িত করেছিল, তার প্রমাণ মেলে শিশুপুত্রটির মারা যাওয়ার ঘটনায়। গান্ধী বিশ্বাস করতেন, পিতার মৃত্যুর সময়ে গর্ভবতী স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করে যে পাপ তিনি করেছেন, তার জন্যই শিশুটি মারা গেছে। এই ধারণা যে তাঁর সেই কিশোরবেলায় ছিল, তা নয়। যখন তিনি প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেছেন, তখনও এই ধারণা তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। আপন চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি অকুণ্ঠভাবে বলে গেছেন এই ঘটনার কথা। এই বলাতে কী অন্যায় তিনি করেছেন, তা বোঝা গেল না। অথচ, এই ঘটনাটি নিয়ে তথাকথিত ছিদ্রান্বেষকরা একেবারে তুলকালাম বাধিয়েছেন। তাঁদের পণ্ডিতি ঘোষণা — গান্ধী একজন সেক্স ম্যানিয়েক, পিতা মরছেন তবু সহবাস করছেন স্ত্রীর সঙ্গে! তাঁদের অনেকেই সম্ভবত নিজেদের পনের-ষোল বছর বয়সের ইন্দ্রিয়-আবেগের কথা ভুলে গিয়েছেন।

কিন্তু এই ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন তোলাটা উচিত না হলেও গান্ধীর আরও বেশ কিছু কাজ, যার মধ্যে বেশিরভাগ সম্পর্কে তিনি নিজেই জানিয়ে গিয়েছেন, সেগুলি দেখলে গান্ধীর অতিসক্রিয় কামুকতার কিছু পরিচয় মেলে। ব্রহ্মচর্য পরীক্ষা করতে গিয়ে উলঙ্গ শয্যাসঙ্গিনীদের সঙ্গে নিজেও উলঙ্গ হয়ে রাতের পর রাত, বছরের পর বছর তিনি কাটিয়েছেন। সেটা তাঁর কামুকতা, নাকি কামুকতাকে দমন করা — সে বিষয়ে পরে আলাদাভাবে আলোচনা করেছি। এখানে সেই প্রসঙ্গ তুলছি না। এখানে বলব যৌনতা নিয়ে তাঁর বাড়াবাড়ি রকম চিন্তার কথা, যাকে 'অবসেশন' বলাটাই বোধহয় ভাল। তাঁর লেখার মধ্যে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বারে বারে ঘুরে ফিরে এসেছে যৌনতা। কখনও বলেছেন নারীসঙ্গ খারাপ, বিবাহ খারাপ, শুক্রক্ষয় কোরো না। আবার বলেছেন, পুত্রার্থে যদি একান্তই ভার্যা আনতে হয়, তবে সন্তানোৎপাদন হয়ে গেলে স্বামী-স্ত্রী যেন ভাই-বোন কিংবা মা-ছেলে হয়ে যায়। আলাদা ঘরে শোবে, শরীর গরম হলে স্নান করবে। সাঁইত্রিশ বছর বয়সে স্ত্রী কস্তুরবাকে বলে দিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে আর দৈহিক সম্পর্ক রাখবেন না। মাথায় ঢুকে গিয়েছিল — বীর্য বড় সাধনার ধন, অনেক কষ্টে তিলতিল করে জমাতে হয় শরীরে। সেটা ক্ষয় করার কোনও মানে হয় না। যার যত বেশি বীর্য জমবে, সে তত কর্মঠ, তত বেশি শারীরিক ও মানসিক শক্তির অধিকারী হবে। কিন্তু শরীরের সাধারণ ধর্ম বলে তো একটা কথা আছে। সেই ধর্মের কারণে যদি কোনও রাতে স্খলন হয়ে গেল, তো আশ্রমের সবাই পরদিন সকালে জানতে পারত যে, কাল রাতে মহাত্মা 'ধর্মচ্যুত' হয়েছেন। তিনি নিজেই জানাতেন। পুরো ঘটনার বিশদ ধারাবিবরণী সহ। 'সত্য প্রকাশে কোনও বাধা থাকা উচিত নয়' — এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী তাঁর যাবতীয় মন্তব্য যে সবসময় শ্রুতিযোগ্য থাকত, তা নয়। অনেকের কাছেই সেটা যথেষ্ট আপত্তিকর বোধ হত। কিন্তু তাঁকে বুঝবে কে? এমনকি গান্ধীর ভাবশিষ্য স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু পর্যন্ত গান্ধীর যৌনতা বিষয়ক পরামর্শ ও বিবাহের পর ব্রহ্মচর্য পালনের প্রস্তাবকে ব্যঙ্গ করে বলেছেন — 'অস্বাভাবিক এবং প্রকৃতিবিরুদ্ধ'।

কিন্তু ব্রহ্মচর্য পালনের সিদ্ধান্ত বা অঙ্গীকার তো তাঁর সাঁইত্রিশ বছর বয়সের কথা (১৯০৬ সাল)। তের বছরে বিবাহের পর থেকে যাঁর যৌন-অভিজ্ঞতার শুরু, তিনি পরবর্তী চব্বিশটি বছর (ব্রহ্মচর্যের পর্বটি আপাতত বাদ রাখলাম) কি স্ত্রী ছাড়া আর কোনও রমণীর দিকে ফিরে চাননি? মনে রাখতে হবে, এই পর্বে তাঁর ইংলণ্ডে ব্যারিস্টারি পড়তে যাওয়া আছে, দক্ষিণ আফ্রিকায় চাকরি করতে যাওয়াও আছে। এই সময়ে তাঁর ক্ষুধা মেটাবার জন্য কস্তুরবা সঙ্গে থাকতেন

না। কম সময় নয়। প্রথম সন্তান হরিলালের জন্ম ১৮৮৮ সালে। তার অব্যবহিত পরে আইন পড়ার জন্য তিনি লণ্ডনে যান। তিন বছর থাকেন সেখানে। ফিরে আসার পরই পত্নী কস্তুরবা আবার গর্ভবতী হন। ১৮৯২ সালে গান্ধীর দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম। দুবছর ভারতে ছিলেন গান্ধী, কিন্তু আইন ব্যবসায়ে উন্নতি করতে না পারায় ১৮৯৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা গেলেন। দুই সন্তান হরিলাল আর মণিলালকে নিয়ে কস্তুরবা থাকলেন ভারতে। পরবর্তী চার বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় একা থাকলেন গান্ধী। স্ত্রীসঙ্গ অবশ্যই থাকল না, কিন্তু নারীসঙ্গ কি একেবারে ছিল না? যদি থাকে, তাহলে কতটা ছিল? প্লেটনিক প্রেম, নাকি শরীর ছিল? তার চেয়েও বড় প্রশ্ন, দেশে থাকাকালীন কস্তুরবার শরীর যখন ব্যবহার করা সম্ভব হত না বিভিন্ন কারণে, তখন আদি রিপুর চাহিদা মেটাবার জন্য কী করতেন তিনি?

আত্মকথনে সর্বদা মুখর গান্ধী সরাসরি এই ব্যাপারে কোনও আলোচনা করেননি। কিন্তু যৌনতার ব্যাপারে যে উৎসাহের পরিচয় এযাবৎ তাঁর মধ্যে দেখা গেছে, তাতে সন্দেহ হওয়াটা অমূলক নয় যে, একেবারে নিরামিষ না-ও থাকতে পারেন তিনি। সন্দেহগুলো কাদের নিয়ে এবং সেই সন্দেহে সত্যতার পরিমাণ কতটা, সেটা দেখা যাক।

প্রথমে ইংলণ্ডে ব্যারিস্টারি পড়ার পর্ব। সেখানে এক রেস্তোরাঁয় তাঁর সঙ্গে এক প্রৌঢ়ার পরিচয় হয় একদিন। রেস্তোরাঁর মেনুকার্ডটি ছিল ফরাসি ভাষায় লেখা, গান্ধী বুঝতে পারছিলেন না। মহিলা তাঁকে বুঝিয়ে দেন। আলাপের সেই শুরু। দিনে দিনে সেই আলাপ ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। সেই মহিলা কিছু ব্রিটিশ যুবতীর সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও করিয়ে দেন। এরপর কী হল, গান্ধীর নিজের জবানিতে শোনা যাক সে কথা। একটি চিঠিতে গান্ধী নিজেই এই কথাগুলি লিখেছিলেন সেই মহিলাকে — "Ever since we met at Brighton, you have been kind to me. You have taken care of me even as a mother of her son. You also think that I should get married and with that view you have been introducing me to young ladies. Rather than allow matters to go further, I must confess to you that I have been unworthy of your affection. I should have told you when I began my visits to you that I was married... and am father of a son... I assure you, I have taken no improper liberties with the young lady you were good enough to introduce me."

উল্লিখিত ঘটনাটির নানাভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। যারা গান্ধীকে দেবতাজ্ঞানে

পূজা করেন, তাঁরা বলেন, দেখেছ, মানুষটার সাহস, মানুষটার সত্যবাদিতা আর ন্যায়ের প্রতি সমর্পিত আত্মিক শক্তির জোর কতটা। চাইলে তো নিজেকে বিবাহিত হিসেবে ঘোষণা না করে মহিলাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে আনন্দে থাকতে পারতেন। তা কিন্তু তিনি করেননি। এমন দেবতুল্য চরিত্রের মানুষ সম্পর্কে যারা কুকথা বলে, তারা কি আদৌ মনুষ্য পদবাচ্য?

অপরদিকে গান্ধীকে যারা ভালমানুষ বলে মানতে রাজি নয়, তারা এই ঘটনা সম্পর্কে বলে — এতই যদি তাঁর সত্যবাদিতা, তবে প্রথমে নিজেকে অবিবাহিত হিসেবে পরিচিত করাবার কী দরকার ছিল? বোঝাই যাচ্ছে, প্রৌঢ়া মহিলাটির সঙ্গে তাঁর স্নেহের সম্পর্ক বেশ খানিকটা এগিয়েছিল। একাধিক ইয়াং লেডিজের সঙ্গে পরিচয়টা তো আর একদিনে হয় না। তাদের মধ্যে আবার বিশেষ এক যুবতীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিশ্চয়ই ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল। যার জন্যে তাঁকে লিখতে হয়েছে — 'আমি কোনও অসঙ্গত ব্যবহার (imporper liberties) তার সঙ্গে করিনি — এব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।' অসঙ্গত ব্যবহার অর্থে শরীরের ব্যবহার। মানসিক ভাবে এগোলেই শরীর এগিয়ে আসে — একথা ব্যাখ্যা করার দরকার হয় না। অর্থাৎ ততদিনে গান্ধী মানসিকভাবে সেই মেয়েটির সঙ্গে অবশ্যই ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। এই ঘনিষ্ঠতার পর বিবাহের কথাও হয়ে থাকতে পারে। গান্ধী ভয় পেয়েছিলেন তখনই। সর্বনাশ, দেশে তো বউ-বাচ্চা আছে! বিয়ে তিনি কিভাবে করবেন? অতএব 'য পলায়তি স জীবতি' কিংবা 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি'। তখন ধানাইপানাই ছেড়ে আসল কথাটি জানাতেই হল যে, তিনি বিবাহিত। এখানে সত্যবাদিতা, আত্মশক্তি — এসব বড় বড় কথার কোনও জায়গা নেই। গান্ধী ভক্তরা পাল্টা বলতে পারেন, মিথ্যে পরিচয় দিয়ে মেয়েদের সঙ্গে শারীরিকভাবে ঘনিষ্ঠ কেউ হয় না নাকি? উত্তরে বলব, কেন হয় না? হাজারটা হয়। কিন্তু যারা এসব কাণ্ড ঘটায়, তাদের সৎ সাহসের চেয়ে বেশি থাকে দুঃসাহস। গান্ধীজির দুঃসাহস ছিল, একথা তাঁর শত্রু-মিত্র কেউ বলতে পারবে না। স্রেফ ভয় পেয়েই তিনি সত্যিটা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন।

গান্ধীর বারাঙ্গনা-গমন

যৌনতা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি দমন করা সহজ ব্যাপার নয়। বিশেষ করে যারা বৈবাহিক জীবনে অভ্যস্ত এবং নারী শরীরের ব্যবহারে অভ্যস্ত তাদের কাছে। বিভিন্ন কারণে স্ত্রীগমন সম্ভব না হলে তাদের কাছে সহজলভ্য যে পন্থাটি খোলা থাকে, তা হল বারাঙ্গনাদের কাছে যাওয়া। গান্ধীও তাদের কাছে গিয়েছিলেন। তাঁর নিজের স্বীকৃতি অনুযায়ী জীবনে অনেকবার তিনি

বেশ্যালয়ে গিয়েছিলেন। বেশ্যালয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু বেশ্যাগমন করেননি। তাদের ঘরে ঢুকেছেন, তাদের শয্যায় বসেছেন, তবে শুয়ে পড়ার আগে উঠে পড়েছেন। কিংবা এটা বলা ভাল যে, বারাঙ্গনারা তাকে উঠতে বাধ্য করেছিলেন এবং ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। গান্ধী নিজেই যথেষ্ট বিস্তারে লিখেছেন এরকম তিনটি ঘটনার কথা। ১৯২৫ সালে যখন তাঁর বয়স প্রায় ছাপ্পান্ন বছর, তখন নিজের সতের-আঠার বছর বয়সের সেই বেশ্যাগমনের কথা 'নবজীবন' পত্রিকার ১৭ মে ১৯২৫ সংখ্যায় 'Power of Ramanama' বা 'রামনামের শক্তি' এই শিরোনামে লিখেছেন এভাবে —

'I was taken to two of them by friends on different occassions. On the first occassion, I went to the place out of false regard for the friend and, if God had not saved me, I would certainly have fallen. This time the woman whose house I had entered, threw me out with contempt. I simply did not know what to say or how to behave in such a situation. Prior to this incident, I always regarded it as shameful even to sit near a public woman, so that I was trembling even when entering that house. After going in, What could that smart woman do to such a fool but turn him out? She said a few angry words to me and asked me to go away. At that time, of course, I did not realize that God had saved me. I left feeling miserable. I felt crestfallen and even unhappy about my stupidity! I felt that I lacked manliness. It was later I realised that I had been shielded by my stupidity. God had saved me by making me behave like a fool. Else how could I, who had entered a house of ill-fame with evil intention, have been saved?' এই ঘটনাটি তাঁর কত বছর বয়সে ঘটেছিল এবং কোথায় ঘটেছিল, সে ব্যাপারে পরিষ্কার করে গান্ধী কিছু বলেননি। দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারের ঘটনাদুটি প্রসঙ্গে অবশ্য সেকথা বলেছেন। তাঁর নিজের সম্পর্কে বর্ণনা যা তিনি দিয়েছেন, তাতে ধারণাটা দৃঢ় হয় যে, এটি ঘটেছিল ভারতে, ইংলণ্ড যাত্রার আগে। সম্ভবত, কস্তুরবার সঙ্গে এক শয্যায় শোয়াটা সন্তান হওয়ার কারণে যখন সম্ভব ছিল না সেই পর্বের। এটা তাঁর বিরুদ্ধে অতি-কামুকতার যে অভিযোগটি আছে, তাকে পুষ্ট করে। উপরে বর্ণিত ঘটনাটি বিশ্লেষণ করলে যে বিষয়গুলি উঠে আসে, সেগুলিকে বোধহয় এভাবে সাজানো যায় : (ক) নিজের ইচ্ছায় তিনি বেশ্যালয়ে যান নি, গিয়েছিলেন বন্ধুর পাল্লায় পড়ে, (খ) ভগবান না বাঁচালে সেদিন তাঁর আর রক্ষা

ছিল না, (গ) বারবণিতাদের তিনি ঘৃণা করতেন, তবু ফুর্তি করার জন্য গিয়েছিলেন তাদের কাছে, (ঘ) তাঁকে দেখতে পুরুষালি ছিল না অর্থাৎ অল্পবয়সী কিশোরের মত দেখতে ছিল বলে বারাঙ্গনাটি দু-এক কথা বলে তাঁকে ঘরের বাইরে বের করে দেয়, (ঙ) বার করে দিলে তিনি বড় কষ্ট পেয়েছিলেন, (চ) তাঁর বোকামি (stupidity) ও ভয় (I was trembling) তাঁকে সেদিন বাঁচায়, এটাকে তিনি রামনামের ক্ষমতা বলেছেন। আমি জানি, ওপরের এই ঘটনাটিকে গান্ধীভক্তরা এভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, তাঁকে বাঁচিয়েছেন তাঁর ঈশ্বর, কেননা, ঈশ্বরের বরপুত্র তিনি। আর যারা গান্ধীর সমালোচক, তাঁরা বলবেন — ভগবান নয়, গান্ধীকে সেদিন বাঁচিয়েছিল ওই বারাঙ্গনা মেয়েটি। এই প্রসঙ্গে একটি তুলনীয় পরিস্থিতির কথা মনে পড়ছে। পরিস্থিতিটির বর্ণনা আছে লেখক বুদ্ধদেব বসুর রাতভোর বৃষ্টি উপন্যাসে। কিশোর নায়ক তার স্কুলের পোশাক পরে গেছে মধ্যবয়সিনী এক বারবণিতার কাছে। যাওয়ার পর কী করবে, কী ভাবে শুরু করবে ভেবে না পেয়ে তাম্বুলচর্বণরতা বারবণিতাকে বলে বসল, পানে কী মশলা খাও তুমি? অমনি মহিলাটি তার পেটিকোট ঝপাং করে তুলে ধরল বুকের ওপরে, কিশোরের বিস্ফোরিত চোখ দুটি মুহূর্তে তার গোপনাঙ্গের ওপর। সেটার দিকে আরও স্পষ্ট নির্দেশ করে বলল — 'এই মশলা'।

এক সন্তানের বাবা হয়ে গেলেও গান্ধী মোটামুটিভাবে ওই কিশোর নায়কের মত। হয়তো কিঞ্চিৎ বড়। কিন্তু তাঁর সঙ্গে উপন্যাসের ওই নায়কের তেমন বিরাট কিছু ফারাক ছিল না। তাঁর সেই বয়সের পক্ষে গান্ধী দেখতে কচিকাঁচা হলেও, পাকামিতে যথেষ্ট দড় ছিলেন।

তাঁর দ্বিতীয়বারের বারবণিতা গমনের ঘটনাটি ঘটে ইংলণ্ডে (ব্যারিস্টারি পড়াকালীন)। তিনি নিজেই জানিয়েছেন সেকথা — "...this time the place was in England."। আরও বলেছেন — "I was not so innocent then as I was at the time of the first instance... I was in the very flush of youth. Two of us friends were lodged in one house. We had gone there only for a few days. The landlady was as good as a prostitute" বর্ণনাটি বড় অদ্ভুত। 'বাড়িওয়ালাটি বেশ্যাদের মত ভাল ছিল' — গল্পের শুরুতে একথা জানালে সন্দেহ হতে বাধ্য, তাঁর পরিচয়টি জেনেশুনেই কি গান্ধী আর তাঁর বন্ধু সেখানে উঠেছিলেন! সম্ভবত, লন্ডনের বাইরে কোনও জায়গায় আরও কিছু বন্ধুর সঙ্গে মিলে বেড়াতে গিয়েছিলেন গান্ধী। সবাই এক বাড়িতে থাকতেন না! তবে যে বাড়িতে গান্ধী তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে থাকতেন,

সেখানে রাতে আরও এক-আধজন বন্ধু আসতেন। সবাই মিলে তাস খেলতেন (সম্ভবত জুয়া)। বাড়িওয়ালিও অংশ নিতেন। তখনও অবধি গান্ধী জানতেন না যে, মহিলাটি তাঁর শরীরকে আশ্রয় করেই বেঁচে থাকেন অর্থাৎ তিনি একজন দেহোপজীবিনী। এক রাতে তাস খেলতে খেলতে মহিলাটি 'ইঙ্গিত' দেওয়া শুরু করলেন। এবার গান্ধীর নিজের জবানিতে শুনুন — "I felt tempted. I was flushed in the face, for lust had entered me and I had become impatient. On my lips was the language of lust." অর্থাৎ মহিলার ইঙ্গিতে গান্ধীর শরীর গরম হয়ে গেল, মুখ-চোখ লাল হল, আদি রিপুর তাড়না তাঁকে অস্থির করে তুলল। তাঁর মুখ থেকে বাজে কথা বেরিয়ে আসতে থাকল।

এবারও ভগবান তাঁকে বাঁচালেন। প্রথমবার তাঁর বোকামির (Stupidity) ওপর ভর করে এসেছিলেন ভগবান, এবার এলেন ওই বন্ধুটির ওপর ভর করে। যে বন্ধুটির নিজের চরিত্রের কিন্তু ইতিমধ্যেই পতন হয়েছে (you know that I have fallen) এবং যে রীতিমত বেশ্যাসক্ত, সে এসে বাঁচাল গান্ধীকে। তার কথায় গান্ধী তাস ছেড়ে উঠলেন, নিজের ঘরে গেলেন, শুয়ে পড়লেন। এরপর বন্ধুটি সেই মহিলার সঙ্গে শুয়ে পড়ল কিনা, সে বিষয়ে গান্ধী কিছু বলেন নি। প্রসঙ্গের ইতি টেনেছেন এভাবে — 'For me, this was an occassion when I first became aware of the existence of God.'

কী সাংঘাতিক কথা! উনিশ বছর বয়সে পৌঁছে তিনি ভগবানের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রথম জানতে পারলেন! এর আগেও বিভিন্ন প্রসঙ্গে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ যে তিনি পেয়েছেন, তা জানিয়েছেন বহুবার। এমন কি, একথাও বলেছেন তাঁর প্রথমবারের বেশ্যাগমনের চূড়ান্ত পর্যায়ের পাপের হাত থেকে বেঁচেছেন ভগবানের আশীর্বাদে — তাহলে এবার কেন বললেন যে, ভগবানের অস্তিত্ব আজ প্রথম তিনি জানলেন?

দুটো কথাই যে সত্যি হতে পারে না, সেটা পরিষ্কার। হয় প্রথমবারের ভগবানের কথা তিনি মিথ্যা বলেছেন, নাহলে পরের বারের ভগবৎ প্রসঙ্গের কথাটা মিথ্যা। তাহলে কি লেখার মধ্যে আরও মিথ্যার আশ্রয় তিনি নিয়েছেন?

পুলিশী তদন্তের ভাষায় একটা কথা চালু আছে — মিথ্যে বিবৃতি (statement) দিলে কোথাও না কোথাও ফাঁক থেকে যায়। গান্ধীর এই বিবৃতির মধ্যে কি তেমন কোনও ফাঁক আছে? দেখা যাক। প্রথম কথা — 'the landlady was as good as a prostitute' — একথা তিনি আগেভাগেই বললেন কেন? এই জন্যেই বললেন যে, জেনেশুনে ওইরকম ফুর্তিবাজির বাড়িতেই তিনি

উঠেছিলেন। উঠেছিলেন কাকে নিয়ে? না এক বেশ্যাসক্ত বন্ধুকে নিয়ে। অমন গুণবান বন্ধুটিকে নিয়ে নিশ্চয় রামায়ণ পাঠ করার জন্য তিনি ওই বাড়িতে ওঠেন নি। তাহলে বন্ধুটির হঠাৎ দেবতা হয়ে যাওয়া কেন, আর গান্ধীর আদরের নাম 'মনিয়া' (মোহনদাসের সংক্ষিপ্ত রূপ) বলে ডেকে তাকে পতনের হাত থেকে বাঁচানো কেন? যারা গান্ধী চরিত্রের দেবত্ব নিয়ে সন্দিহান, যারা গান্ধীর কামুকতার ঘোর সমালোচনা করেন, তাঁরা বলেন — এসব গান্ধীর মিথ্যাচার। বেশ্যালয়ে গিয়ে যৌনক্রিয়া না করে চলে এসেছেন, এমন বান্দা তিনি নন। তাছাড়া মানুষ একদিন না হয় 'অজানারে জানিতে চাই' বলে বেশ্যাপাড়ায় যেতে পারে, কিন্তু দুবার কেন যাবে? তিনবার কেন যাবে? 'ন্যাড়া একবার বেলতলায় যায়' কিন্তু এই ন্যাড়া কেন বারবার বেলতলায় যাবেন? আর বারবার কেন বলবেন — ভগবান আমাকে বাঁচিয়েছেন। ভগবানের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, গান্ধীকে বাঁচাবার জন্য তিনি বেশ্যার ঘরে আসন পেতে বসে থাকবেন!

গান্ধীর তৃতীয়বারের বেশ্যালয় গমনের ঘটনাটিও কম চমকপ্রদ নয়। জাহাজে করে যাচ্ছিলেন সেবার। ভারত থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায়। ১৮৯৩ সালে (সম্ভবত)। বন্ধুত্ব হয়ে গেছে জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে এবং এক ইংরেজ যাত্রীর সঙ্গে। প্রতিটি বন্দরে জাহাজ নোঙর ফেলার পর সবাই দল বেঁধে মেয়েদের পাড়ায় যায়। গান্ধীরও একবার বড় ইচ্ছা হল ওদের সঙ্গে যাওয়ার। কাপ্তেন খুশি মনে গান্ধীকে সঙ্গে নিল। তখনও গান্ধী জানেন না ওপরে উঠে ওরা কী করে। তিনি ভেবেছিলেন ওপরে গিয়ে শহরটা বুঝি দেখবে সবাই। এরপর গান্ধীর নিজের লেখায় শোনা যাক ঘটনাটা — "We went and stood before a prostitute's house. Then I knew what was meant by going to see a port. Three women were produced before us... Those two (captain and English passenger) went into the rooms. The third woman led me into her own room. While I was still thinking what I should do, the other two came out of the rooms. I do not know what that woman must have thought about me. She stood smiling before me... friends shouted for me and so I went out, I certainily felt a little humiliated... I certainly realized that day, too, I was not saved by my own power, but that it was God who had protected me by having made me stupid in such matters. "

অর্থাৎ এখানেও তাঁর 'সতীত্ব' রক্ষা করেছেন ভগবান। বারবার তিনি বেশ্যালয়ে যাচ্ছেন, তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী, কাজের কাজটি না করে বেরিয়ে

আসছেন। নিজের মনের জোরে যে কিছু না করে বেরিয়ে আসছেন, তাও নয়। তাহলে তিনি যেতেন কেন সেখানে বারবার? শরৎচন্দ্র নাকি অনেক দেহোপজীবিনীদের চিনতেন, জানতেন। তাদের ঘরে যেতেন, গল্পগুজব করতেন, তাদের জীবনের কথা শুনতেন। লেখার রসদের জন্য এবং তাদের প্রতি সহমর্মিতার জন্য। গান্ধীর সেসব বালাই ছিল না। বারবণিতাদের নিয়ে সংস্কারের ইচ্ছাও তাঁর ছিল না। তবু যেতেন। কেন এই যাওয়া? এই কারণটি কিন্তু বলেননি কোথাও। সন্দেহটা সেখানেই। উনআশি বছরের জীবনে বহু ঘটনাই ঘটে থাকে একটা সাধারণ মানুষের জীবনে। আর তিনি তো অ-সাধারণ। তাঁর অভিজ্ঞতার তো শেষ নেই। সব লিখতে গেলে কয়েক কোটি পৃষ্ঠাতেও কুলোবার কথা নয়। সাধারণ গুরুত্বহীন ঘটনার কথা ছেড়ে দিলাম, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যা ঘটেছে তাঁর জীবনে, তার কতটুকু তিনি লিখেছেন? বেশির ভাগ ঘটনাকেই তো বিস্মৃতির আড়ালে চাপা দিয়ে রেখেছেন, কিন্তু এইসব যৌনগন্ধী বিষয়ের প্রতি তাঁর এত আগ্রহ কেন? তাহলে কি সমালোচকদের কথাই ঠিক যে, কাম ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় আকাঙ্খার বিষয়? কথাটা একেবারে মিথ্যে মনে হয় না। কথাটার মধ্যে যে সত্যতা আছে, তা তাঁর নিজের করা এই স্বীকারোক্তির মধ্যেও পরিষ্কার — "I remenbered only these three incidents at the time of (my) speech in question. The reader should not think that I have not been through more of similar experiences. But I certainly wish to state that every time I escaped, thanks to Ramanama." অর্থাৎ, 'বক্তৃতা দেওয়ার সময় যে তিনটি ঘটনার কথা মনে করতে পেরেছি, তাদের কথা বললাম। পাঠক যেন এটা মনে না করেন যে, একই রকম ঘটনা আর কখনো আমার জীবনে ঘটেনি। অবশ্যই ঘটেছে, কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রে রামনাম আমাকে রক্ষা করেছে।'

আর বোধহয় দেহোপজীবিনীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা না বললেও চলবে। এবার আসা যাক পণ্য নারী ছাড়া আর কোনও রমণীর সঙ্গে গান্ধী সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন কিনা, সেই আলোচনায়। যথারীতি সব আলোচনা তাঁর প্রাক্-ব্রম্মচর্য পর্যায়ের জীবন নিয়ে।

গান্ধীর অঘোষিত ব্রম্মচর্য: ১৯০১-১৯০৬

গান্ধীর চতুর্থ তথা শেষ সন্তান দেবদাস গান্ধীর জন্ম ১৯০০ সালে। পরিবারসহ তিনি তখন থাকেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। এই সন্তানটির জন্মের পর থেকে গান্ধী স্ত্রীর সঙ্গে যৌনসম্পর্ক অঘোষিত ভাবে বন্ধ করে দেন। অঘোষিত কথাটি এইজন্য বলছি যে, ঘোষিত ভাবে ব্রম্মচর্য তিনি গ্রহণ করেন ১৯০৬ সাল

থেকে। স্ত্রী কস্তুরবাকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়ে। ১৯০১ থেকে ১৯০৬ পর্যন্ত এই ছয় বছর কি তিনি তাহলে যৌনক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিরত ছিলেন? অন্য অনেক ব্যাপারে গান্ধী প্রচুর বললেও এবং লিখলেও এই কয়েকটি বছর সম্পর্কে একেবারেই নীরব। শ্রীমতী লোরেনা মুঙ্গুরের লেখা কস্তুরবা গান্ধীর জীবনী থেকে জানা যায়, সন্তানদের প্রসবের সময় কস্তুরবা খুব কষ্ট পেতেন। বিশেষ করে শেষ দুটি সন্তানের প্রসবের সময় এই যন্ত্রণার পরিমান খুব বেশি ছিল। স্ত্রীর এই প্রসবকালীন যন্ত্রণা দেখে গান্ধী খুব কষ্ট পান এবং মনে করেন যে, স্ত্রী-সংসর্গ করলেই যখন সন্তান হবে তখন সেটা না করাই ভাল। তিনি নাকি জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবস্থা (contraceptives) গ্রহণের কথাও ভেবেছিলেন, তবে গ্রহণ করেননি। কারণ, সেটা করলে কস্তুরবা তাঁর কাছে কামনা মেটানোর একটা যন্ত্র বলে বিবেচিত হতেন, আর তিনি নিজেও যৌন চাহিদার দাস বলে প্রমাণিত হতেন। অতএব চতুর্থ সন্তান জন্মাবার ছয় বছর পরে একদিন কস্তুরবাকে ডেকে ব্রহ্মচর্য পালনের কথা বললেন এবং আলাদা ঘরে আলাদা বিছানায় শোয়ার কথা বললেন। কস্তুরবা আদৌ খুশি হন নি স্বামীর এমনতর প্রস্তাবে, তবু নিরুপায় ভাবে মেনে নিলেন।

কিন্তু প্রশ্নটা উঠছে এই কারণে যে, সন্তান জন্মের অব্যবহতি পরে যে কথাটা তিনি বলতে পারতেন, সেই কথাটা বলতে পাঁচ-ছয় বছর সময় নিলেন কেন? আরও প্রশ্ন, এই দীর্ঘ সময়ে সন্তান হতে পারে এই ভয়ে স্ত্রী-সংসর্গ তিনি করেননি — এটা যদি মানতে হয় এবং কন্‌ট্রাসেপ্‌টিভ্ ব্যবহার করলে কস্তুরবার অজ্ঞাতসারে যে তা করা যায় না এটাও যদি মানতে হয়, তাহলে অঘোষিত ব্রহ্মচর্য পালনের কথাও মেনে নিতে হয়। গান্ধী চরিত্রের গঠন ও বিকাশ এবং তাঁর যৌনতা (sexuality) নিয়ে যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁদের অনেকের বিশ্বাস, ১৯০১ সাল থেকেই তাই গান্ধী ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন।

গান্ধীর ব্রহ্মচর্যের স্বরূপ ভারতের চিরাচরিত ব্রহ্মচর্য পালনের স্বরূপ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পরবর্তী অংশে এবিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আমরা আলোচনা করেছি, এখানে তাই সেই আলোচনা করছি না। এখানে শুধু একটা কথাই বলব, তা হল, গান্ধীর ধারণায় ব্রহ্মচর্য মানে যৌনতাকে এড়িয়ে যাওয়া নয়, যৌনতাকে জয় করা। তাই পরবর্তী কালে ভারতে ফিরে আসার পর ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য নিজে উলঙ্গ হয়ে উলঙ্গ মেয়েদের সঙ্গে এক চাদরের মধ্যে শয়ন করে পরীক্ষা করতেন যৌনতাকে তিনি জয় করতে পেরেছেন কিনা। অনেকটা তন্ত্রসাধকদের বিন্দুসাধনার কাছাকাছি ব্যাপার আর কি! তাহলে কি ১৯০১ সাল থেকে যে ব্রহ্মচর্য তিনি পালন করেছেন,

সেখানেও তাঁর কোনও সঙ্গিনী ছিলেন! অথবা কোনও সঙ্গী?

আবার একটা সমস্যার সৃষ্টি হল। সঙ্গিনী না হয় বোঝা গেল, কিন্তু সঙ্গী বলতে তো পুরুষ বোঝায়। তাহলে কি গান্ধী সমকামী (Homosexual)-ও ছিলেন? একই সঙ্গে হোমোসেক্সুয়াল এবং হেটোরোসেক্সুয়াল পুরুষ যে দুর্লভ, এমনটা নয়। গান্ধী কি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত? এই ব্যাপারে সেই পুরুষটির নামও জানা গেছে। তিনি হলেন হেরমান কালেনবাখ নামের এক জার্মান-ইহুদি। তাঁর সঙ্গে গান্ধীর সম্পর্ক নিয়ে এবার আলোচনা করা যাক।

গান্ধীর সমকামিতা

হেরমান কালেনবাখ বয়সে গান্ধীর চেয়ে প্রায় দেড় বছরের ছোট। ১৮৯৬ সালে পঁচিশ বছর বয়সে জার্মানি থেকে তিনি জোহানেসবার্গে আসেন। একজন দক্ষ আইস-স্কেটার, সুইমার, সাইক্লিস্ট ও জিমন্যাস্ট কালেনবাখ পেশায় ছিলেন স্থপতি (architect)। দক্ষিণ আফ্রিকায় বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হন তিনি এবং সেখানকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। ১৯০৪ সালে গান্ধীর সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হয় এবং অনেকটা লাভ্‌ অ্যাট ফার্স্ট সাইটের মত প্রথম দেখাতেই প্রেম। গান্ধীর নিজের কথায় — তিনি তাঁর আত্মার আত্মীয়কে (soulmate) খুঁজে পেলেন। এমন ঘনিষ্ঠ হল সেই সম্পর্ক যে, শুধু তাঁদের দুজনের থাকার জন্য কালেনবাখ একটা চমৎকার বাংলো-প্যাটার্ণের বাড়ি বানিয়ে ফেললেন সেই বছরেই। অর্থাৎ সেই ১৯০৪ সালেই। স্ত্রী এবং পুত্রদের অন্য বাড়িতে রেখে দিয়ে গান্ধী-কালেনবাখ তাঁদের দুজনের জন্য তৈরি করা বাড়িতে থাকতে লাগলেন। ক্রমে এই বাড়ির সংলগ্ন স্থানে আরও কিছু ঘরবাড়ি তৈরি হল, একটা কমিউনিটি লিভিংয়ের ব্যবস্থা হল এবং এইসব করতে দুটি বছর সময় লাগল। ১৯০৬ সালে কস্তুরবা তাঁর সন্তানদের নিয়ে সেই বাড়িতে এলেন।

কালেনবাখের সঙ্গে গান্ধীর দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক ছিল। ১৯১০ সালে গান্ধীকে জোহানেসবার্গের উপকণ্ঠে এক হাজার একর (চার স্কোয়ার কিলোমিটার) জমি দান করেন কালেনবাখ। এই জমিতে গান্ধী তাঁর বিখ্যাত 'টলস্টয় ফার্ম' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৪ সালে ভারতে ফেরার আগে গান্ধী যখন ব্রিটিশ সরকারের ডাকে লণ্ডনে যান, তাঁর সেই যাত্রায় কালেনবাখও তাঁর সঙ্গী ছিলেন। কালেনবাখের ইচ্ছা ছিল, গান্ধীর সঙ্গে ভারতে চলে আসা। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের (প্রথম) কারণে অনুমতি না পাওয়ায় আসতে পারেন নি। তবে ১৯৩৭ সালে তিনি ভারতে আসেন ইহুদিদের প্রতি গান্ধীর সমর্থন পাওয়ার আশায়। ১৯৩৯ সালে আরও একবার তিনি ভারতে আসেন। থাকতেন গান্ধীর আশ্রমে। দুজনের নিবিড় সম্পর্ক

অন্যান্য আশ্রমিকদের কাছে রীতিমত আলোচনা ও ঠাট্টা-তামাশার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গান্ধী কালেনবাখকে ডাকতেন 'আপার হাউস' নামে, আর কালেনবাখ গান্ধীকে ডাকতেন 'লোয়ার হাউস' বলে। এই সম্বোধন দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন সময় থেকে চালু ছিল। এর কারণ ছিল লোয়ার হাউস অর্থাৎ গান্ধী তাঁদের যৌথ সংসার 'ফিনিক্স সেটেলমেন্ট'-এর খরচপত্রের বাজেট তৈরি করতেন। আর আপার হাউস অর্থাৎ কালেনবাখ সেই বাজেট নির্মমভাবে কাটছাঁট করতেন। কিন্তু অন্যদের কাছে এই সম্বোধনের যৌনগন্ধী ব্যাখ্যাটাই বেশি পরিচিত ছিল। তাঁরা সমকামী সম্পর্কের ভিত্তিতে গান্ধীকে মহিলা অর্থাৎ লোয়ার হাউস এবং কালেনবাখকে পুরুষ অর্থাৎ আপার হাউস আখ্যা দিয়ে নিজেদের মধ্যে তামাশা করতেন। তাঁদের দুজনের সম্পর্কে এত প্রগাঢ় তীব্রতা ছিল যে, গান্ধীর কাছে কালেনবাখ প্রতিজ্ঞাও করেছিলেন যে, সারাজীবন ব্রহ্মচারী হয়ে থাকবেন। যদিও, পরিণত বয়সে পৌঁছে এই প্রতিজ্ঞা ভেঙে তিনি এক মহিলার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন।

কালেনবাখের সঙ্গে গান্ধীর এই সম্পর্ক এবং সম্পর্কের নিবিড়তা গান্ধী-আলোচকদের দৃষ্টি এড়ায়নি। নিউইয়র্ক টাইম্‌স্‌ পত্রিকার ইন্ডিয়া ব্যুরো চীফ্‌ এবং সম্পাদক যোসেফ লেলিভেল্ড বলেছেন — সম্পর্কটা সমকামী এবং গান্ধী একজন বাইসেক্সুয়াল। এই ব্যাপারে তাঁর গবেষণা গ্রন্থ — *Great Soul: Mahatma Gandhi and His Struggle with India*-তে লেলিভেল্ড উদ্ধৃতি দিয়েছেন ত্রিদিপ সুহৃদ নামে এক সংস্কৃতি-বিষয়ক ঐতিহাসিকের একটি উক্তি, যেখানে গান্ধী-কালেনবাখ সম্পর্ক সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'They were a couple'। লেলিভেল্ডের এই বইটি গুজরাটে নিষিদ্ধ হয়েছে। নিষিদ্ধ হওয়ার পর লেলিভেল্ড্‌ বলেছেন তিনি গান্ধী-কালেনবাখ সম্পর্ককে যৌনতার দৃষ্টি দিয়ে দেখেননি এবং বলেননি যে এই সম্পর্ক হোমোসেক্সুয়াল। তিনি এই সম্পর্কের ব্যাপারে যে শব্দটি দিয়েছেন তা হল, হেমোইরোটিক (Homo-erotic)। একই মত আর এক গান্ধীবাদী জেম্‌স্‌ ডি. হান্টের। অস্ট্রেলীয় গবেষক টমাস ওয়েবার সমর্থন করেছেন লেলিভেল্ডকে। তিনি আরও বলেছেন, কালেনবাখকে লেখা চিঠি গান্ধী শেষ করতেন with love এই কথাটি লিখে। লিখতেন যে তাঁরা দুজন 'one soul two bodies'; কালেনবাখের চিঠিপত্রাদি লন্ডনে সদ্‌বি-তে অকশন হওয়ার কথা ছিল ২০১২ সালের জুলাই মাসে। যাতে বড় কোনও কেলেঙ্কারি না বেরোয় তার জন্য প্রচুর টাকা দিয়ে সেগুলো কিনে নেয় ভারত সরকার।

কিন্তু মূল প্রশ্নটার মীমাংসা সহজে হয় না। গান্ধী-কালেনবাখ, মিলি পোলক,

সোনিয়া শ্লেসিন কারও রচনাতেই এই সম্পর্কের যৌনতা নিয়ে আলোচনা হয়নি। কেউ একটি কথাও উচ্চারণ করেননি এই ব্যাপারে। তবু তাঁদের পরস্পরের প্রতি অনভূতি ত্যাগ ইত্যাদির কথা বিচার করলে সম্পর্কের গভীরতা আঁচ করতে অসুবিধা হয় না। প্রশ্ন ওঠে, গভীর সম্পর্ক হলেই কি যৌন-সম্পর্ক হয়? অত্যন্ত সরলীকৃত ধারণা। আসলে যৌনতার জন্য সম্পর্কের গভীরতার দরকার হয় না। বরং উল্টোভাবে বলা যায়, যৌনতা হয়তো সম্পর্কের গভীরতাকেই নষ্ট করে দেয়। মনে রাখতে হবে, সত্যাগ্রহ, অহিংসা সম্পর্কিত ধারণা, ফিনিক্স ও টলস্টয় ফার্ম স্থাপনা — এই সব কিছু মিলে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ মহলে এক আলাদা ছবি তৈরি হচ্ছিল গান্ধীর। সেই ছবি স্বাধীনচেতা শ্বেতাঙ্গিনী এবং শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের আকর্ষিত করবে — এটা কোনও অসম্ভব ঘটনা নয়। আর গান্ধী বিষয়ে একটা কথা তাঁর সমালোচকরাও স্বীকার করতে বাধ্য যে, ব্যক্তিগত সম্পর্ক রক্ষা করার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সতর্ক ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। যেসব বিদেশিনীরা তাঁর জীবনে এসেছেন, তাঁদের সবার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ তিনি রাখতেন। সবকিছু মিলিয়ে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল। কিন্তু এই সম্পর্কের মধ্যে যৌনতা খুঁজতে যাওয়াটা শুধু যে অন্যায় তা নয়, অবিচারও বটে।

গান্ধীর সঙ্গে সমকামিতার সম্পর্ক থাকতে পারে — এই সম্ভাবনার কথা উঠেছে সুশীলা নায়ারের ভাই প্যারেলালের নামেও। গান্ধীর সেক্রেটারি নির্মল কুমার বোস তাঁর 'মাই ডেজ্ উইথ্ গান্ধী ' পুস্তকে লিখেছেন যে, প্যারেলাল মাঝে মাঝে গান্ধীর শয্যায় তাঁর সঙ্গে শুত। এমন কি প্যারেলাল এমন কথাও গর্ব করে বলত যে, তার দিদি (সুশীলা নায়ার) যত না গান্ধীর কাছ ঘেঁসে শুয়েছে, সে তার চেয়েও ঘনিষ্ঠভাবে শুয়েছে।

সম্ভবত গান্ধীর চরিত্রে বাইসেক্সুয়ালিটি নিয়ে সন্দেহ একেবারে গোপন কোনও ব্যাপার ছিল না, অনেকেই করতেন সন্দেহটা এবং এই কারণেই স্ত্রী আভাকে গান্ধীর শয্যা থেকে সরিয়ে আনার জন্য তার সদ্যবিবাহিতা স্বামী কানু গান্ধী নিজেকে গান্ধীর বিছানা-গরমকারী (Bed-warmer) হিসেবে ব্যবহারের প্রস্তাব একবার রেখেছিল। যদিও, সে প্রস্তাবে রাজি হননি গান্ধী তবে আভা সাময়িকভাবে মুক্তি পেয়েছিলেন। তারপর ১৯৪৬-৪৭ সালে নোয়াখালি যাত্রার সময় আভা আবার ফিরে আসেন। ১৯৪৮ সালে তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত আভা তাঁর পাশে ছিলেন।

গান্ধীর ঘোষিত ব্রহ্মচর্য পর্ব : ১৯০৬-১৯৪৮

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে জানিয়েছি, ১৯০৬ সালে গান্ধী তাঁর স্ত্রীকে প্রকাশ্যভাবে জানিয়ে দেন যে, দুজনের মধ্যে আর শারীরিক সম্পর্ক থাকবে না। এই সময়ের পর থেকে ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত দীর্ঘ ৪২ বছর ছিল তাঁর ঘোষিত ব্রহ্মচর্য-পর্ব। যদিও সঠিকভাবে দেখতে গেলে এই পর্বেরও আবার দুটি অংশ। প্রথম অংশে আছে ১৯০৬ সালে কস্তুরবার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক বন্ধ করার পর থেকে ১৯৩৮ সালে তাঁর নিজস্ব ঘরানার ব্রহ্মচর্য সম্পর্কিত ঘোষণার সময় পর্যন্ত এই দীর্ঘ বত্রিশ বছর তিনি কী ধরণের ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন এবং দ্বিতীয় অংশে আছে ১৯৩৮ সাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই সময়ে কী ধরণের ব্রহ্মচর্য তিনি পালন করেছেন। যদিও, দুটি অংশেই তাঁর ব্রহ্মচর্য নারী-বিবর্জিত নয়, তথাপি পার্থক্যটা হল ১৯৩৮ সালের আগের সময়ে শয্যায় নারীসাহচর্য পাওয়াকে তিনি বলতেন — 'প্রাকৃতিক চিকিৎসা' বা nature cure, আর ১৯৩৮-এর পর থেকে তিনি প্রাকৃতিক চিকিৎসার নূতন নামকরণ করেছিলেন 'ব্রহ্মচর্য'। এই হঠাৎ নামান্তরের কারণটা ১৯৭০ সালে লেখক বেদ মেহতাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজেই কবুল করেছিলেন সুশীলা নায়ার "— Later on, when people started asking questions about his physical cotact with women - with Manu, with Abha, with me - the idea of Brahmacharya experiments was developed... in the early days, there was no question of calling this a brahmacharya experiment." (দ্রষ্টব্য: — *Mahatma Gandhi and His Apostles* by Ved Mehta)। সুশীলা নায়ারের এই স্বীকারোক্তি থেকে একটা সিদ্ধান্তে অক্লেশে আসা যায় যে, গান্ধী কাউকে বড় একটা পাত্তা দিতেন না, যেটা চাইতেন সেটা করতেন এবং কেউ যদি বাড়াবাড়ি রকমের সোরগোল তুলত, তবে নিজের সিদ্ধান্তের গায়ে ঈশ্বর, ঈশ্বরের নির্দেশ, মহাজাগতিক কার্যকারণের ব্যাখ্যা ইত্যাদির একটা রঙিন জামা পরিয়ে দিতেন। তারপর আগের মতই যা করছিলেন, তাই করে যেতেন।

সুশীলা তাঁর নিজের নামটি সহ মাত্র তিনজন ব্রহ্মচর্য-সঙ্গিনীর নাম করেছেন, কিন্তু আসল সংখ্যাটি এর চেয়ে ঢের বেশি। সেই আলোচনায় আমরা যাব, তবে তার আগে ব্রহ্মচর্য বলতে কী বোঝায় এবং গান্ধী তাঁর নিজস্ব ব্রহ্মচর্যের স্বরূপ সম্পর্কে কী ভাবতেন ও বলতেন, সেই সম্পর্কে কিছু বলা একান্ত প্রয়োজন, না হলে গান্ধীর আজব ব্রহ্মচর্য পালন সম্যকভাবে বোঝা যাবে না।

প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী মানুষের জীবন চারটি পর্বে বা আশ্রমে বিভক্ত। চারটি আশ্রমকে একত্রে বলা হয় চতুরাশ্রম। এগুলি হল ক্রমান্বয়ে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য,

বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। ব্রহ্মচর্যের সময়ে মানুষ বেদ-আদি শাস্ত্রের অনুশীলন করবে এবং পবিত্র জীবনযাপন করবে। যেহেতু ব্রহ্মচর্য মানুষের জীবনের প্রথম অধ্যায়, তাই ব্রহ্মচর্যপালনকারী বলতে সাধারণভাবে ছাত্র ও নবযুবক সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়। যেহেতু দেহ এবং চরিত্র এই দুটি বিষয়ের গঠন হয় জীবনের শুরুর পর্বে, তাই ব্রহ্মচর্যের সময় অবশ্যম্ভাবী ভাবে যৌন সংযম পালন করতে হবে ও মৈথুন বর্জিত জীবনযাপন করতে হবে। ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্য অনুযায়ী ব্রহ্মচর্য পালনের বয়ঃক্রম জীবনের বারো বছর বয়স থেকে চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত। ব্রহ্মচর্যের কঠিন নিয়মানুযায়ী এই সময়ে মৈথুনের দ্বারা শুক্রক্ষয় নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয় পর্ব গার্হস্থ্য আশ্রম। এই পর্বে মানুষ গৃহী জীবন যাপন করবে। সে বিবাহ করবে, স্ত্রীর সঙ্গে যৌনক্রিয়া করবে, সন্তান উৎপাদন করবে, সংসার প্রতিপালনের ব্যবস্থা করবে। তবে যৌনক্রিয়ার অনুমতি দেওয়ার অর্থ এই নয় যে সেখানে লাগাম থাকবে না। লাগামছাড়া যৌনক্রিয়া জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। তাই ব্রহ্মচর্যের মূল অনুশাসন প্রবৃত্তির সংযম এখানেও বলবৎ আছে।

তৃতীয় পর্ব বানপ্রস্থ আশ্রম। আজকের ভাষায় বলা যায়, অবসর প্রাপ্তির জীবন। হিন্দু তথা ব্রাহ্মণ্য নির্দেশ অনুযায়ী এই সময় মন ও চেতনাকে ঈশ্বর অভিমুখী করতে হবে। এই পর্ব ভোগের বা প্রবৃত্তির পথ থেকে মুক্ত হয়ে ত্যাগ ও নিবৃত্তির পথে এগিয়ে যাওয়ার সময়। সুতরাং এই পর্বেও ব্রহ্মচর্যের অনুশীলন একান্ত জরুরি।

শেষ পর্ব সন্ন্যাস আশ্রম। গৃহমুক্ত হয়ে সন্ন্যাসের পথে চলার সময়। তখন ঈশ্বর-এষণা ছাড়া জীবনের আর কোনও লক্ষ নেই। যেমন জীবনের শুরুতে ব্রহ্মচর্য ছিল মূল অনুশাসন, শেষপাদে এসেও সেই ব্রহ্মচর্যই আবার অনুশাসন হয়ে ফিরে আসে জীবনচর্যায়। এই বয়সে এসে ব্রহ্মচর্য পালনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, বলতে পারেন যে ভোগ করার ক্ষমতা আর থাকে না শরীরের। তাঁরা ভুল বলেন। ভোগের জন্য শরীর অপেক্ষা মনের ক্ষমতা বেশি। সুতরাং মনকে শাসনে রাখতে হবে। আর শরীরের ক্ষমতার কথা? আশি-পঁচাশি বছর বয়সে পৌঁছেও যে পুরুষের যৌনক্ষমতা একেবারে চলে যায় না, তার প্রমাণ দেবে চিকিৎসা শাস্ত্র।

কিন্তু ব্রহ্মচর্য কি কেবলমাত্র যৌনপ্রবৃত্তি দমন করার একটা প্রয়াস মাত্র? নাকি তার বাইরে আরও এক বড় ধারণা যুক্ত আছে এর মধ্যে?

ব্যুৎপত্তিগত দিক দিয়ে শব্দটির অর্থ হল ব্রহ্ম-আচার্য। যে ব্যক্তি ব্রহ্ম-তত্ত্বকে অনুসরণের মাধ্যমে দেহে ও মনে সংযম আনতে পারেন, তিনি ব্রহ্মচারী। যিনি সৎ ব্রহ্মচারী, তিনি সমাধির (meditation) মাধ্যমে ব্রহ্মস্বরূপকে জানার অধিকারী। প্রশ্নোপনিষদের মতে, কোনও উপাসনা কোনও আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রাপ্ত হবে না

যতক্ষণ না ব্রহ্মচর্য সঠিকভাবে পালন করা যাবে। ব্রহ্মচর্যের পালনীয় কর্তব্যগুলিকে এভাবে বলা আছে আমাদের শাস্ত্রে :

ক) সঠিক খাদ্য গ্রহণ

খ) নিয়মসম্মতভাবে নিদ্রা

গ) মানসিক ও শারীরিক নিয়ন্ত্রণ

ঘ) সৎ-চিন্তায় মনোনিবেশ

ঙ) কামনা-দমন

চ) অপরাধিক (criminal), বিকৃতকাম (perverted) ও অনৈতিক (corrupt) চিন্তা ও কাজ থেকে বিরত থাকা

ছ) ভাবসমাধির (meditation) মাধ্যমে নিজেকে উন্নত করা

জ) নীরবতা

ঝ) সর্বজীবে দয়া

ঞ) জাগতিক বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা (detachment)

ট) অন্যকে সৎ পথে পরিচালিত করা

ঠ) মন, শরীর ও আত্মাকে ক্রমশই উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া।

জীবনে ব্রহ্মচর্যের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ভারতের মুনি-ঋষি-সাধু-মহাত্মারা স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষকে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। বলে গিয়েছেন ব্রহ্মচর্য পালনের মাধ্যমে শরীর ও চরিত্রগঠনের কথা। এর কারণ, তাঁরা জানতেন মানুষের মধ্যে তিনটি বিষয়ের আশ্চর্য এক মিশ্রণ আছে। প্রথমটি হল, পশু সত্তা। একটি পশুর ক্ষেত্রে বেঁচে থাকার জন্য যেসব দৈহিক চাহিদা থাকে, খাদ্য ও মৈথুন — একটি মানুষের ক্ষেত্রেও তাই থাকে। পরের দুটি সত্তা যদিও একান্তভাবে মানুষের মধ্যেই থাকে। সে দুটি হল, যুক্তি দিয়ে জীবনকে বোঝার চেষ্টা করা এবং অন্তরের মধ্যে যে ঈশ্বর আছেন, তাঁকে অনুভব করা। এখানেই মানুষের সঙ্গে পশুর তফাৎ। মানবজীবনের সাধনা তাই হল ক্রমশ চিন্তায়-মননে-আচরণে অন্তরের পশুত্বকে দমন করে সৎ-চিৎ-আনন্দের পথে অগ্রসর হওয়া এবং এই অগ্রসর হওয়ার মাধ্যমে জীবনের উচ্চতর অর্থকে আবিষ্কার করা। ব্রহ্মচর্য পালনের মাধ্যমে এই পথেই এগিয়ে যায় মানুষ।

স্বামী বিবেকানন্দ ব্রহ্মচর্যের শক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। মনে করতেন, তাঁর শারীরিক ও মানসিক শক্তি তথা তাঁর বাগ্মিতার মূল উৎস ছিল তাঁর ব্রহ্মচর্য পালন। রাজযোগ সম্পর্কিত বক্তৃতায় তিনি বলেছেন — "— Take up one idea. Make that one idea your life — think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body, be full of that idea, and just leave all other idea alone.

This is the way to success, that is way great spiritual giants are produced." ব্রহ্মচর্য পালন লক্ষের প্রতি সমর্পিতপ্রাণ হতে সাহায্য করে।

স্বামী চিদানন্দ ব্রহ্মচর্য পালনের মাধ্যমে আত্মিক জাগরণের কথা বলেছেন এভাবে — "If one knows that the spiritual process, the spiritual life, is the elimination of the animal, the refining and directing upwards of the human, and the awakening and unfoldment of the Divine, then all spiritual practices, including the role that Brahmacharya plays, fall into their right place." ভারতীয় প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে উল্লেখিত ব্রহ্মচর্যের এই স্বরূপকে মাথায় রেখে আমরা গান্ধীর ব্রহ্মচর্যকে বিচার করব। ব্রহ্মচর্য সম্পর্কে গান্ধীর ধারণা কিরকম ছিল, সেটা তাই বলা যাক।

ব্রহ্মচর্য কাকে বলে এ সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে তাঁর ধারণাকে তিনি ব্যক্ত করেছেন। একজায়গায় বলেছেন, ব্রহ্মচর্যে পুরুষ কিংবা নারী একে অপরের প্রতি যৌন কামনা পোষণ করবে না, যৌনতার জন্য একে অপরকে স্পর্শ করবে না। (দ্রষ্টব্য : — *Guide to Health by Mahatma Gandhi,* Part I, Chapter-9)। আর এক জায়গায় বলেছেন — Brahmacharya means control of the senses in thought, word and deed (দ্রষ্টব্য: ---- *Vow of Brahmacharya*, Chapter 3.8)। এই একই কথা ইয়েরাওয়াদা মন্দির থেকে লেখা — *Brahmacharya or chastity* রচনাতে লিখেছেন — 'আমি মনে করি, শুধু মাত্র জান্তব প্রবৃত্তিকে দমন করাই ব্রহ্মচর্যের মূল লক্ষ নয়। ব্রহ্মচর্যের অর্থ হল সমস্ত ইন্দ্রিয় দমন করা (Control of all the senses)। একই প্রবন্ধে আরও বলেছেন ---- "Let us remember the root meaning of Brahmacharya. Charya means course of conduct; brahmacharya conduct adapted to the search of Brahma, i.e., Truth. From this etymological meaning arises the special meaning, viz. control of all the senses. We must entirely forget the incomplete definition which restricts itself to the sexual aspect only." অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য পালন হল ঈশ্বর সাধনা, সত্যের সাধনা। শুধু যৌনপ্রবৃত্তি দমন করাকে ব্রহ্মচর্য পালন বলা যাবে না।

ব্রহ্মচর্য সম্পর্কিত গান্ধীর এই ধারণা প্রথম লিখিতভাবে প্রকাশ পায় 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকার ১৩ অক্টোবর, ১৯২০ সংখ্যায়। যদিও, তাঁর স্বীকৃতি অনুযায়ী ১৯০৬ সাল থেকে তিনি ব্রহ্মচর্য পালন করছেন। ১৯২০ সালে তিনি লেখেন, ইংরেজি Celibacy কথাটির সংস্কৃত প্রতিশব্দ হল ব্রহ্মচর্য, যদিও ব্রহ্মচর্যের অর্থ

celibacy শব্দটির অর্থ অপেক্ষা অনেক ব্যাপক। ব্রহ্মচর্যের অর্থ সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ (Brahmacharya thus means control in thought, word and action of all the senses at all times and all places.)।

১৯২৬ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় — Royal Road to Self-Realisation শীর্ষক নিবন্ধে তিনি লিখছেন — Brahmacharya means control over all the senses and freedom from lust in thought, word and deed.

. উপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকে এটি দেখা গেল, ব্রহ্মচর্যের অর্থ সম্পর্কিত চিরাচরিত ধারণা থেকে গান্ধীর ধারণায় আদৌ কোনও পার্থক্য নেই। এটা অবশ্য ঠিক যে, চিরাচরিত ধারণায় ব্রহ্মচারীদের বেশি গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে শুক্ররক্ষার ব্যাপারে, তবে সেখানেও ব্রহ্মচর্যকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত করেও দেখানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে শুধু জননেন্দ্রিয় নয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযত রাখার নামই হল ব্রহ্মচর্য। একই কথা অন্যভাবে অন্য ভাষায় বলেছেন গান্ধীও।

কিভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করা হবে সে ব্যাপারে যে সূচি একটু আগে দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে গান্ধী নির্দেশিত পথের বেশ কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যাবে। ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকার ১৩ অক্টোবর ১৯২০ সংখ্যায় 'ব্রহ্মচর্য পালনের নিয়মাবলী' প্রসঙ্গে গান্ধী একটি তালিকা প্রকাশ করেছেন। সেটি নীচে দেওয়া হল:

১) কিশোর-কিশোরীদের অত্যন্ত সাধারণ ও স্বাভাবিক ভাবে বড় করে তুলতে হবে, যাতে তারা (যৌনতা বিষয়ে) নিরপরাধ থাকে এবং ভবিষ্যতে থাকতে পারে।

২) খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। উত্তেজক খাদ্যদ্রব্যাদি, যা খেলে শরীর গরম হয় (অর্থাৎ যৌন-উত্তেজনা হয়) এমন খাদ্য বর্জন করতে হবে।

৩) স্বামী-স্ত্রী আলাদা ঘরে শয়ন করবে এবং কখনো সবার চোখের আড়ালে দেখা করবে না (অর্থাৎ তাদের মধ্যে যৌনক্রিয়ার উপযোগী পরিবেশ ও পরিস্থিতি যেন না থাকে)

৪) শরীর ও মনকে সর্বক্ষণ সৎকাজে ব্যাপৃত রাখতে হবে (যাতে যৌন চিন্তা মনে না আসে)

৫) তাড়াতাড়ি শয্যাগ্রহণ এবং তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করার অভ্যাস কঠোরভাবে পালন করতে হবে

৬) যৌনগন্ধী সাহিত্য পড়া চলবে না। তার পরিবর্তে সৎ চিন্তামূলক সাহিত্য পড়তে হবে।

৭) সিনেমা-থিয়েটার মনে এবং শরীরে আবেগ নিয়ে আসে, তাই এসব দেখা চলবে না

৮) এক-আধ দিনের জন্য স্বপ্ন দেখা নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে। তবে ঘনঘন হলে মুশকিল। রাতে শোওয়ার আগে ঠাণ্ডা জলে স্নান করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

৯) একটু চেষ্টা করলে স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে যৌনক্রিয়া ত্যাগ করাটা কষ্টকর ব্যাপার নয়। আত্ম-সংযমের মাধ্যমে যৌনক্রিয়া ত্যাগকে জীবনের সাধারণ ও স্বাভাবিক ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

১০) প্রতিদিন প্রার্থনা করতে হবে সর্বান্তঃকরণে, তাহলে জীবন পবিত্রতর হবে।

গান্ধীর প্রদর্শিত এই নিয়মাবলীর সঙ্গে আমাদের চিরাচরিত ধারণার যে নিয়মাবলী আছে এবং যার বর্ণনা এই অধ্যায়ে ইতিপূর্বে দিয়েছি, তার পার্থক্য কি আপনার নজরে পড়েছে? আশা করি, পড়েছে। তবু স্পষ্ট করে বলি। ব্রহ্মচর্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে গান্ধী বারবার বলেছেন একটিই কথা — শুধুমাত্র জান্তব প্রবৃত্তি দমন (বা জননেন্দ্রিয়ের দমনই) ব্রহ্মচর্যের মূল কথা নয়, ব্রহ্মচর্যের অর্থ হল সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দমন। অথচ, যখন নিয়মাবলী দিচ্ছেন, তখন তাঁর সামনে একটি ইন্দ্রিয়ই সমস্ত মন দখল করে রেখেছে। সেটা বলা বাহুল্য, যৌন-ইন্দ্রিয়। এমনটা কেন হল? তাহলে কি সমালোচকদের এই কথাটিই সত্য যে যৌনচেতনাই গান্ধী চেতনার মূল সুর! একেবারে অসন্দিগ্ধভাবে সেকথা বলার সময় এখনও আসেনি। তার জন্য আরও কিছু আলোচনা দরকার। দেখা দরকার, কিভাবে ব্রহ্মচর্য সম্পর্কিত চিরায়ত পথ থেকে কোথায় ও কিভাবে নিজের পথকে আলাদা করেছেন গান্ধী।

হরিজন পত্রিকার ১৫ জুন ১৯৪৭ তারিখের সংখ্যায় Walls of Protection শীর্ষক নিবন্ধে অর্থাৎ ভাবী-ব্রহ্মচারীদের করণীয় প্রসঙ্গে তিনি বলছেন — 'There are certain rules laid down in India for the would-be Brahmachari. Thus, he may not live among women, animals and eunuchs; he may not teach a woman only or even a group; he may not sit on the same mat as a woman; he may not look at any part of a woman's body; he may not take milk, curds, ghee or any fatty susbstance; nor indulge in baths and oily mesage. I read about these when I was in South Africa. There I came in touch with some men and women who, while they observed

Brahmacharya, never knew that any of the above-named restraints were necessary. Nor did I observe them and I was none the worse for the non-observation.' (বঙ্গানুবাদ: ভাবী ব্রহ্মচারীদের জন্য ভারতে কিছু নিয়ম চালু আছে। যেমন, সে মহিলাদের, জন্তুদের এবং হিজড়াদের মধ্যে থাকবে না; সে কোনও মহিলাকে এককভাবে বা দলগতভাবে শিক্ষা দেবে না; কোনও মহিলার সঙ্গে এক শয্যায় বসবে না; নারী শরীরের দিকে তাকাবে না; সে দুধ, দই, ঘি এবং চর্বিপ্রধান খাদ্য গ্রহণ করবে না; স্নান করবে না এবং শরীরে তেল মালিশ করবে না। এইসব নিষেধের কথা আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকার সময়ে পড়েছি। সেখানে এমন কিছু পুরুষ ও মহিলার সংস্পর্শে আমি এসেছিলাম যারা ব্রহ্মচর্য পালন করেছে এইসব নিষেধের কথা না জেনেই। আমি নিজেও এইসব নিয়ম মেনে ব্রহ্মচর্য পালন করিনি এবং তাতে ব্রহ্মচর্য পালনে আমার ক্ষতি হয়নি।)

ওই একই নিবন্ধের অন্যত্র তিনি বলেছেন — 'Let us ask ourselves what wall should be erected to protect Brahmacharya. The answer seems clear. It is not Brahmacharya that needs wall of protection... He who has attained perfect Brahmacharya, does not stand in need of protecting walls... He who has killed the sexual urge in him, will never be guilty of it in any shape or form: However attractive a woman may be, her attraction will produce no effect on the man without the urge. The same rule applies to woman. But he or she who has not conquered lust, should not turn the eyes even towards a sister or a brother or a daughter or a son... A perfect Brahmachari never loses his vital fluid... He who runs away from a necessary contact with a woman. does not understand the full meaning of Brahmacharya... The true Brahmachari will shun false restraints. He must create his own fences according to his limitations, breaking them down when he feels that they are unnecessary." (বঙ্গানুবাদ: ব্রহ্মচর্যের চারপাশে কি কোনও সুরক্ষা পাঁচিল দেওয়ার দরকার আছে? প্রশ্নটা আমাদের নিজেদের করা যাক। উত্তরটা অস্পষ্ট নয়। ব্রহ্মচর্যের জন্য যদি সুরক্ষা পাঁচিলের দরকার হয়, তবে সেটা ব্রহ্মচর্যই নয়.. যে সত্যকারের ব্রহ্মচর্য প্রাপ্ত হয়েছে, তার কোনও পাঁচিলের দরকার নেই... যে পুরুষ তার যৌন চাহিদাকে হত্যা করতে পেরেছে, সে কখনোই কোনও ভাবে দোষী হতে পারে না। কোনও মহিলা যতই সুন্দরী হোক, ওই পুরুষের কাছে তার কোনও আবেদন থাকবে না। এই একই নিয়ম মহিলাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু কোনও পুরুষ বা কোনও স্ত্রী যদি কামকে জয় না করে

থাকে, তবে সে তার বোন বা ভাই, মেয়ে বা ছেলে — কারও দিকে তাকাবে না... সত্যকারের ব্রহ্মচারী কখনো তার শুক্র ক্ষয় করে না... যে পুরুষ নারীর সান্নিধ্য থেকে পালিয়ে বেড়ায়, সে ব্রহ্মচর্যের আসল অর্থটাই বুঝতে পারেনি... সত্যকারের ব্রহ্মচারী মিথ্যে বিধি নিষেধ পরিত্যাগ করবে। সে তার নিজের সীমাবদ্ধতাকে মাথায় রেখে নিজের চারপাশে বেড়া দেবে এবং যখন অপ্রয়োজনীয় মনে করবে, সেই বেড়া ভেঙেও দেবে।)

গান্ধীর ব্রহ্মচর্য বা ব্রহ্মচর্যের বিকৃতির সমস্ত চিহ্নগুলি এই একটিমাত্র প্রবন্ধে একেবারে প্রত্যক্ষভাবে এসে গেছে। যদি কাটাছেঁড়া করি গান্ধীর এই রচনাটিকে, তাহলে আমরা যে তথ্যগুলি পাই, সেগুলি এরকম:

(এক) ব্রহ্মচর্য চলাকালীন সময়ে মহিলাদের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে, কিভাবে তাদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে — সে ব্যাপারে ভারতে কিছু নিয়মকানুন অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকার সময়ে এই নিয়মকানুনগুলি পড়েছিলেন। সেগুলি মেনে ব্রহ্মচর্য পালন যদিও তিনি করেননি। প্রশ্ন ওঠে, কেন করেননি? তারও আগে যে প্রশ্নটি ওঠে, তা হল, হঠাৎ ব্রহ্মচর্য পালনের কথা সাঁইত্রিশ বছর বয়সে পৌঁছে কেন মনে পড়ল তাঁর?

(দুই) সেখানে, অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকায় কিছু পুরুষ এবং মহিলার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তারা আগে থেকে ব্রহ্মচর্য (সেলিবেসি নয়) পালন করত। তবে ভারতীয় শাস্ত্র আরোপিত বিধিনিষেধের কথা তারা জানত না। না জেনেই তারা তাদের মত করে পালন করত ব্রহ্মচর্য। গান্ধী অবশ্য নিষেধের কথা জানতেন, তবে মানতেন না। তাতে তাঁর ব্রহ্মচর্য পালনে ব্যাঘাত ঘটেছে বলে তিনি মনে করেন না। এখানে প্রশ্ন ওঠে, যে পুরুষ ও মহিলাদের সঙ্গে গান্ধীর সাক্ষাৎ হয়েছিল, তারা নিশ্চয়ই অভারতীয় এবং অবশ্যই ইউরোপীয়। ব্রহ্মচর্যের নাম তারা শুনল কোত্থেকে? নাম শুনেই পালনের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল কেন? তার বিধি-নিষেধগুলোর কথা না জেনেই? নাকি তাঁরা ছিলেন গান্ধী-আবিষ্কৃত ব্রহ্মচর্য পালন পদ্ধতিতে গান্ধীর সঙ্গী বা সঙ্গিনী? খুব সম্ভব কারণ ছিল এটাই। গান্ধী ব্যাপারটির বর্ণনা দিয়েছেন বেশ কিছু ফাঁক রেখে। মিথ্যে কথা হয়তো তিনি বলেন নি, কিন্তু অনেক জরুরি সত্যি চেপে রেখেছেন।

উপরের দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে গান্ধী বর্তমান কালে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে

ফিরেছেন। অবশ্য প্রথম উদ্ধৃতির কিছু অনুষঙ্গে বর্তমান কাল ছিল, যেমন — কোনও নারীকে একক বা দলগতভাবে শিক্ষা দেওয়া, তাদের সঙ্গে এক শয্যায় শোয়া-বসা, স্নান করা ও গায়ে তেল মালিশ করা ইত্যাদি। তবে দ্বিতীয় অংশটিতে গান্ধী যেন অভিযোগের জবাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন। কথাগুলো ভালভাবে পড়লেই তা বোঝা যায়। অকারণে কিছু করা বা বলার পাত্র নন গান্ধী। সুশীলা, আভা, মনু ইত্যাদিদের সঙ্গে এক শয্যায় এক চাদরের মধ্যে নিজে উলঙ্গ হয়ে ও সঙ্গিনী মেয়ে/মেয়েদের উলঙ্গ করে একত্র শুয়ে তিনি যে ব্রহ্মচর্যের পরীক্ষা তথা তাঁর 'শুক্র রক্ষা'র পরীক্ষা চালু করেছিলেন, তা চারপাশে রীতিমত শোরগোল তুলেছিল। তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছিল তাঁর এই আজব ব্রহ্মচর্য নিয়ে। সেই সমালোচনার জবাবে গান্ধী ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন নিজের অবস্থান। বলতে চেয়েছিলেন, তিনি জিতেন্দ্রিয়। মেয়েদের কিছু হারাবার নেই তাঁর কাছে। অন্যদিকে তাঁর নিজেরও যে একমাত্র জিনিষটির হারাবার ভয় আছে — সেই vital fluid বা জীবনী শক্তি বা শুক্র তিনি যেন তেন প্রকারেণ রক্ষা করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

কয়েকটি স্বাভাবিক প্রশ্ন উঠে আসে। তা হল, এক - পৃথিবীর কোথাও যে ধরণের ব্রহ্মচর্য পালন পদ্ধতির কথা কেউ কোনওদিন শোনে নি, সেই পদ্ধতি নিয়ে গান্ধী কেন এমন পাগলামি শুরু করেছিলেন? তিনি ডাকলে বা না ডাকলেও মেয়েরা হুড়োহুড়ি করে তাঁর বিছানায় শুতে চলে আসছে — এটা কি তাঁর মধ্যে একধরণের গর্বের জন্ম দিয়েছিল? নাকি তিনি আদতে ছিলেন একজন বিকৃতকাম?

দুই - ১৯০৬ সাল থেকে তিনি নাহয় ব্রহ্মচর্য পরীক্ষা করছেন, কিন্তু তাঁর শয্যাসঙ্গিনীরা তো নবীনা, তাদের ব্রহ্মচর্যের অভিজ্ঞতা একান্তই সীমিত, তারা তাঁকে বাবা বা ভাইয়ের মত দেখবে না — এটাই স্বাভাবিক। তবু তাদেরকে গিনিপিগের মত ব্যবহার করা যে অনুচিত, এই কথাটা একবারও মাথায় এল না কেন তাঁর? এটা তো ব্রহ্মচর্য সম্পর্কিত তাঁর নিজের ঘোষণারই পরিপন্থী? এই প্রসঙ্গে ১৫ জুন ১৯৪৭ তারিখের হরিজন পত্রিকার Walls of Restriction নিবন্ধটির কথা মনে করুন।

তিন - সাম্প্রদায়িক হিংসায় গোটা ভারত যখন জ্বলছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত হচ্ছে, বাস্তুচ্যুত হচ্ছে, তখন তিনি তাঁর আজব ব্রহ্মচর্য পালন করছেন। এমনকি, ১৯৪৬-৪৭ সালের বীভৎস নোয়াখালির দাঙ্গা থামাতে গিয়েও তিনি সুশীলা, আভা ও মনুর সঙ্গে উলঙ্গ হয়ে এক শয্যায় শুচ্ছেন। একবারের জন্যও তাঁর মনে কোনও পাপবোধ এল না! তাহলে কিসের মহাত্মা তিনি? ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য তাঁর এই উগ্র, উৎকট ও অবিশ্বাস্য উৎসাহের কারণ কী? অবাধ

যৌনাচার — যার কথা এখন পৃথিবী জুড়ে ধ্বনিত হচ্ছে, সেটা? নাকি অন্য কিছু?

চার - বিবেকানন্দ বলেছিলেন, জীবনের লক্ষটা প্রথমে ঠিক করে নিতে হয়। তারপর সেই লক্ষ সাধনের পথে সর্বশক্তিতে অগ্রসর হতে হয়। গান্ধীর জীবনের কী লক্ষ ছিল? ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, নাকি ব্রহ্মচর্য নামধেয় ভাঁড়ামি?

এই প্রশ্নগুলির জবাব গান্ধী দেননি। নিজেকে তিনি ঈশ্বর ভাবতেন। তাঁর নাম ভাঙিয়ে রাজনীতি করেছেন ও করছেন যাঁরা তাঁরা তাঁকে ঈশ্বরের মত দেখেন। কিন্তু এই তথাকথিত ঈশ্বরের মুখোশটা খসে যাচ্ছে এখন। বেরিয়ে পড়ছে মুখোশের আড়ালে এমন এক মুখ যা দেখতে মহাত্মার মত নয়। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। সেই ইতিহাসের স্বার্থে গান্ধীর ব্রহ্মচর্য-সঙ্গিনীদের কথা বলব এখন। দেখব, গান্ধীর সঙ্গে তাদের যৌনক্রিয়ার পাকা কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় কিনা।

প্রথমে বলি, গান্ধীর জীবনের বিভিন্ন পর্বে (মুখ্যত দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসকালে এবং ভারতে ফিরে আসার পরবর্তী কয়েকটি বছর) তাঁর ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠা বিদেশিনী মহিলাদের কথা। সম্প্রতি টমাস ওয়েবার নামে এক গবেষক '*Going Native: Gandhi's Relationship with Western Women*' নামে একটি বই লিখেছেন। এই ওয়েবার হলেন সেই বিরল গবেষকদের অন্যতম, যিনি গান্ধীর ডান্ডি অভিযান, চিপ্‌কো আন্দোলন নিয়ে একটি অসাধারণ বিশ্লেষণমূলক লেখা লিখেছেন। ওয়েবারের নূতন গ্রন্থে বিদেশিনীদের সঙ্গে গান্ধীর সম্পর্কের একটি আদ্যোপান্ত তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ পাই। তিনি তাঁর আলোচনার বৃত্তে এনেছেন প্রায় পঁচিশজন মহিলাকে। যাঁদের সম্পর্কে গান্ধী নিজেও যেমন বিভিন্ন প্রসঙ্গে অনেক কথা লিখেছেন, তেমনই এইসব মহিলারাও গান্ধীর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের কথা লিখেছেন চিঠিপত্রে এবং বইয়ের মাধ্যমে। এই মহিলাদের মধ্যে যাঁরা গান্ধীজীবনে বেশি গুরুত্ব পেয়েছিলেন কিংবা যাঁরা গান্ধীর বেশি কাছাকাছি হয়েছিলেন, তাদের কথা বলব।

আলোচনা করতে গিয়ে একটা প্রশ্ন অবশ্যম্ভাবী ভাবে উঠে আসে। তা হল, এই বিশিষ্ট মহিলারা কোন্ আবেগের টানে আসতেন গান্ধীর কাছে? এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বুদ্ধিজীবী, নারীবাদী (Feminist), সমাজবাদে বিশ্বাসী (Socialist) এবং গড়পড়তা পশ্চিমা রমণী অপেক্ষা অনেক উচ্চমার্গের মানুষ। মনে রাখতে হবে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় মানস তখন সভ্যতার ও বিজ্ঞানের ভয়াল যে রূপ যুদ্ধের সময় দেখেছে, সেই অভিজ্ঞতা ভোলার জন্য

ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা আঁকড়ে ধরতে চাইছিল। এই ব্যাপারে তাদের সামনে দুটি মানুষ উঠে আসেন। একজন শান্তিনিকেতনের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অপরজন সত্যাগ্রহ আশ্রমের মাধ্যমে মোহনদাস গান্ধী। এই আধ্যাত্মিকতার টানে তাঁরা এসেছিলেন গান্ধীর কাছে। কী পেয়েছিলেন, আদৌ কিছু পেয়েছিলেন কিনা, সেই বিস্তৃত আলোচনার অবসর এখানে নেই, শুধু গান্ধীর সঙ্গে তাঁদের ব্রহ্মচর্য ঘনিষ্ঠতার একটি পরিচয় দেব।

মিলি পোলক (Millie Polok) : গান্ধী যখন দক্ষিণ আফ্রিকাতে ছিলেন, তখন মিলি তাঁর স্বামী হেনরি পোলকের সঙ্গে গান্ধীর ফিনিক্স ফার্মে থাকতেন। গান্ধীর প্রপৌত্র গোপালকৃষ্ণ গান্ধী লিখেছেন :— Henry and Millie Polok lived in the same home as the Gandhis, using the same kitchen, toilets and living rooms। মিলি এবং গান্ধীর সম্পর্কের বর্ণনা দিতে গিয়ে একজন বিখ্যাত গান্ধী জীবনীকার লিখেছেন — 'Gandhiji and Millie started conversing through eyes. They made a pact between them immediately. Poor Henry was left stranded.'। গান্ধীর জীবনে স্ত্রী ব্যতিরেকে প্রথম প্রেমিকা হিসেবে মিলির নাম নিয়ে থাকেন অনেকে। গান্ধী মিলিকে বলতেন, তাঁকে পুরুষ নয়, নারী হিসেবে দেখার জন্য। বলতেন, মিলির কাছে তিনি বোনের মত। একান্ত অসুবিধা হলে তাঁকে বাবা বলেও ডাকতে পারে মিলি। ১৯০৯ সালে গান্ধীর লন্ডন যাত্রায় মিলি সঙ্গে যান। হেন্‌রি দক্ষিণ আফ্রিকায় থেকে যান। লন্ডনে গান্ধী মিলিকে বলেন বিকল্প স্বামী (substitute husband) হিসেবে তাঁকে দেখার জন্য। গান্ধীর সঙ্গে মিলির সম্পর্ক থাকে প্রায় তিন বছর। তারপর মিলি নিজেই ভেঙে দেন সেই সম্পর্ক। গান্ধীর ব্রহ্মচর্যে যোগ দিয়েও ছেড়ে দেন তিনি। গান্ধীকে নিয়ে একটি বইও লিখেছেন মিলি — *Mr. Gandhi : The Man*। এই বইতে স্পষ্টভাষী মিলি অনেক ব্যাপারে গান্ধীর তুমুল সমালোচনা করেছেন। গান্ধীর সঙ্গে তাঁর কোনওরকম যৌন সম্পর্ক ছিল, এমনটা ভাবার যদিও কোনও কারণ নেই।

মাউড পোলক (Maud Polak) **:** মিলির ননদ মাউড। ফিনিক্স ফার্মে গান্ধীর সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করেছিলেন ১৯১৩ সাল পর্যন্ত। মিলি চলে যাওয়ার পর মাউডের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে গান্ধীর। একবার গান্ধীকে ট্রেনে তুলে দিতে এসে মাউড কিভাবে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন, তার বর্ণনা হেনরিকে লেখা একটি চিঠিতে এভাবে দিয়েছেন গান্ধী — "She cannot tear herself from me.. She would not shake hands with me. She wanted a

kiss.''। অনেক গান্ধী সমালোচক এই বিবরণীটুকু পড়েই সিদ্ধান্ত করে নিয়েছেন, যে মাউডের সঙ্গে গান্ধীর প্রেম ও দৈহিক সম্পর্ক ছিল। এটা নেহাতই কষ্টকল্পনা। মাউডকে গান্ধী খুবই স্নেহের চোখে দেখতেন। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে চুম্বনের বিষয়টি বেশিরভাগ ভারতীয়র কাছে কেবলমাত্র প্রেমিক-প্রেমিকা বা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার গোপন ব্যাপার বলে গণ্য হয়, কিন্তু ইউরোপীয় মহিলাদের কাছে আদৌ তা নয়। তাদের জীবনচর্যায় চুম্বনের একটি বড় ভূমিকা আছে। পিতার কাছ থেকে চুম্বন পাওয়াটা প্রাপ্তবয়স্কা নারীর কাছেও একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার, যেটা ভারতীয় সমাজজীবনে ততটা প্রচলিত নয়। ১৯১৩ সালে গান্ধীর বয়স ছিল চুয়াল্লিশ, এটা অবশ্যই বিরাট কিছু বয়স নির্দেশিত করে না। মাউডের সঙ্গে তাঁর যৌনক্রিয়ার কোনও ভূমিকা ছিল, এমন প্রমাণ কেউ দিতে পারেনি।

সোনিয়া শ্লেসিন (Sonia Schlesin): সোনিয়াকে গান্ধীর ফিনিক্স ফার্মে এনেছিলেন হেরমান কালেনবাখ। ছোট্টখাট্ট মেয়েটি দারুণ কাজের ছিল এবং গান্ধীর নিজ বিবেচনায় সোনিয়া ছিল তাঁর সবেচেয়ে সেরা সেক্রেটারি। গান্ধীর সেই সময়ের ব্রহ্মচর্য সাধনায় সোনিয়া তাঁর সঙ্গিনী ছিলেন। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে গান্ধীর সেই সময়ের ব্রহ্মচর্য সাধনার যে অন্তরঙ্গ বৃত্ত বা inner circle ছিল, সেই বৃত্ত গঠিত হয়েছিল সোনিয়াকে নিয়ে। বাকি দুজন ছিলেন গান্ধী ও কালেনবাখ। যে কালেনবাখের সঙ্গে সমকামিতার অভিযোগ উঠেছে গান্ধীর নামে। একটু আগে সে বিষয়ে আলোচনাও করেছি।

এস্থার ফেরিং (Esthar Faering): ১৯১৪-১৫ সালে ভারতে ফিরে আসার পর গান্ধীর ব্রহ্মচর্য সাধনায় যোগ দেন এই ডেনিস মহিলা। ১৯১৭ সালে গান্ধীর সত্যাগ্রহ আশ্রমে প্রথম আসেন এস্থার। গান্ধীর জীবনে যত বিদেশিনী মহিলা এসেছিলেন, তাদের মধ্যে যে দুজন প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন, এস্থার তাঁদের অন্যতমা। গান্ধীর সঙ্গে এসথারের সম্পর্কের বর্ণনা দিতে গিয়ে কোনও কোনও জীবনীকার দুজনের ঘনিষ্ঠতার প্রচুর বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন, একজায়গায় লেখা হয়েছে এস্থারের সঙ্গে গান্ধীর তীব্র আবেগঘন সম্পর্ক ছিল ("Gandhi experienced an intensely personal passion for Esthar")। আর এস্থার? তিনি গান্ধীকে মনে করতেন 'ঈশ্বরের অবতার' (Incarnation of God in man)। মনে রাখতে হবে, গান্ধী আদৌ কোনও সুপুরুষ নবযুবা ছিলেন না যে ইউরোপীয় মহিলারা তাঁর রূপ দেখে তাঁর পাশে এসেছিলেন। গান্ধীর আদর্শবাদিতা আজ যতই ঠুনকো ও মিথ্যা মনে হোক আমাদের কাছে, তাঁর সম্পর্কে 'মিথ' কিন্তু ততদিনে তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এই মিথ টেনে এনেছিল বিদেশিনীদের। সেই সঙ্গে ভারতের রহস্যময়তা, ভারতের স্পিরিচুয়্যালিটি

সম্পর্কিত ধারণা পশ্চিমা জগতে আজও যেমন অপরিচিত নয়, সেদিনও ছিল না। তাই মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে, এস্থারের সঙ্গে গান্ধীর যৌনতা বিজড়িত কোনও সম্পর্ক সম্ভবত ছিল না। এই সম্পর্কে আর একটি বিষয় উল্লেখ করব। মতিহারি (চম্পারণ) থেকে ১৫.৪.১৯১৭ তারিখে এস্থারকে একটি চিঠিতে গান্ধী লিখেছিলেন — "You may address me as Bapu if you like. It means father." (চাইলে তুমি আমাকে বাপু বলে ডাকতে পারো। এর মানে হল বাবা)। জবাবে ২২.৬.১৯১৭ তারিখের চিঠিতে এস্থার তাঁকে সম্বোধন করছেন "My dear Bapu" বলে। এই যেখানে সম্ভাষণের চরিত্র, সেখানে কি যৌনগন্ধী কোনও মশলা পাওয়া গেল? সমালোচরা তবু এস্থারকে আর গান্ধীকে জড়িয়ে বিতর্ক তোলাতে ক্ষান্ত দেন নি। শেষমেশ অবশ্য ১৯২১ সালে ই-কুনি মেনন নামে একজনকে বিয়ে করেন এস্থার এবং গান্ধীর আশ্রমে আর আসেননি, তথা গান্ধীর ব্রহ্মচর্য সাধনায় পরবর্তী কালে আর অংশগ্রহণও করেননি।

মুরিয়েল লেস্টার (Muriel Lester): এই শ্বেতাঙ্গিনী মহিলাও গান্ধীর আশ্রমে নিয়মিত আসতেন এবং থাকতেন। তবে বেশি দিনের জন্য নয়। গান্ধী ভোরবেলায় রামনাম সহ প্রার্থনা করতেন, সমাধি বা meditation করেছেন কখনও, এমন জানা যায় না। মুরিয়েল গান্ধীর সেই প্রার্থনা সভায় যোগ দেওয়াটা খুব পছন্দ করতেন।

মার্গারেট স্যাঙ্গার (Margaret Sanger) : অসাধারণ সুন্দরী মহিলা এবং গান্ধী ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন তাকে সম্ভোগ করার জন্য। এসম্পর্কে পরবর্তীকালে রাজকুমারী অমৃত কাউরকে (যিনি পরে গান্ধীর অন্যতমা শয্যাসঙ্গিনী হয়েছিলেন) লেখা একটি চিঠিতে গান্ধী যে কথাগুলি লিখেছেন, তার কিছু উদ্ধার করা যেতে পারে এখানে। স্যাঙ্গার হল — "The woman with whom I almost fell... (but) the thought of my wife kept me from going to perdition."। বারবণিতাদের ঘরে তাঁকে বাঁচাতেন ঈশ্বর এবং রামনামের শক্তি, এখানে স্যাঙ্গারের সঙ্গে তিনি প্রায় শুয়ে পড়েছিলেন আর কি, তাঁকে এই নিশ্চিত পতনের হাত থেকে বাঁচায় কস্তুরবার চিন্তা। এই প্রসঙ্গে গান্ধী আরও স্বীকার করেছেন, এই একটি মাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া জীবনভোর তিনি আর কোনও নারীকে কামনার দৃষ্টিতে দেখেন নি (with that one solitary exception... never looked upon a woman with lustful eyes.)। এই কথা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, তা অবশ্য পাঠক বিচার করবেন।

মার্গারেট স্পিজেল (Margaret Speigel) : এই জার্মান-ইহুদি মহিলা বোকাসোকা ও একঘেয়ে ধরণের ছিলেন। কিন্তু অন্ধ গান্ধীভক্ত ছিলেন (এবং রবীন্দ্রনাথেরও)। গান্ধী এঁকে নিয়ে মজা করতে ভালবাসতেন। শোনা যায়, একবার এই নিয়ে মনখারাপ করলে গান্ধী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "I shall love you in spite of your faults."

নীলা ক্রাম কুক (Nilla Cram Cook) : গান্ধীভক্ত আর এক বিদেশিনী। গান্ধীর সঙ্গে তাঁর খুব যে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তা নয়, তবে গান্ধী খুব পছন্দ করতেন নীলাকে। এবং নীলা নিজে সেটা বুঝতেও পারতেন।

ক্যাথারিন হাইলমান (Katherine Heilemann) : এই বিদেশিনী রীতিমত সুন্দরী ছিলেন, সেইসঙ্গে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারিনী।

মীরাবেন (Mirabehn) : এক উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ নৌসেনার কন্যা মীরাবেন-এর আসল নাম ছিল ম্যাডেলিন স্লেড। গান্ধীর কথা তিনি প্রথম শোনেন রোমাঁ রোলাঁর কাছ থেকে। গান্ধীর জীবনী লিখছিলেন তখন রোমা রোঁলা। গান্ধীকে চিঠি লিখে তিনি আর্জি জানালেন সবরমতী আশ্রমে যোগ দেবার জন্য। গান্ধী তাঁকে পরামর্শ দেন এক বছরের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন করতে। ১৯২৫ সালে মীরাবেন গান্ধীকে প্রথম দেখেন এবং দেখার পর গান্ধীকে 'দ্বিতীয় খ্রিস্ট' হিসেবে মনে হয় তাঁর। ক্রমশ আশ্রমের সমস্তরকম কাজে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন মীরাবেন। গান্ধীর জীবন থেকে তখন সদ্য সরে গেছেন সরলাদেবী চৌধুরানী (যাঁর কথা পরে বলব)। মীরাবেন এসে সেই শূন্যস্থানটা পূরণ করে নিলেন। অবশ্যম্ভাবী ভাবে মীরাবেনের সঙ্গে গান্ধীর এই ঘনিষ্ঠতা অন্য আশ্রমিকদের ভাল লাগল না, আর গান্ধীও যেন ক্রমশ, মীরাবেনের প্রেমে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়তে থাকলেন। তখনও গান্ধীর বিবস্ত্র হয়ে আভা-মনু-সুশীলা ইত্যাদিদের সঙ্গে এক শয্যায় শুয়ে ব্রহ্মচর্য পরীক্ষা শুরু হয়নি। গান্ধী তাই মীরাবেনের চিন্তা থেকে মুক্ত থাকার জন্য তাকে নানারকম কাজ দিয়ে অন্যত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন এবং দূরে পাঠিয়ে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করলেন। তথাপি মীরাবেন হলেন একমাত্র বিদেশিনী মহিলা যার সঙ্গে গান্ধী অক্লেশে বলতেন তাঁর যখন তখন যৌন আবেগ আসার কথা, লিঙ্গোত্থানের কথা, বীর্যপাতের কথা, স্বপ্নদোষের কথা। মীরাবেনকে এইসব কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে নিজেই তিরস্কার করতেন। মীরাবেনের স্বপ্ন দেখতে দেখতে যে তাঁর যৌন-আবেগ আসত সেই বর্ণনা দিয়ে তিনি মীরাবেনের প্রতি তাঁর আবেগকে প্রকাশ করে বলতেন 'a bed of hot ashes'। বলা বাহুল্য, গান্ধীর ঐশ্বরিক ব্যাপারে মীরাবেন এতটাই মুগ্ধ ছিলেন

যে, গান্ধীর এই উন্মুক্ত যৌনসমস্যার উল্লেখকেও ঐশ্বরিক বলে ভাবতেন। মীরাবেনের শরীরের প্রতি গান্ধীর নজর যে তেমন একটা নিষ্পাপ ছিল না, সেটা বোঝা যায়, কিন্তু মীরাবেনের সঙ্গে সম্ভোগের সম্পর্ক তাঁর যে গড়ে ওঠে নি, এটাও নির্দ্বিধায় বলা যায়। এমন কি গান্ধীর হাতেকলমে ব্রহ্মচর্য পরীক্ষার ব্যাপারে বহু খবর যিনি দিয়েছেন, সেই গিরিজা কুমারও এটা বলেননি যে, মীরাবেনের সঙ্গে গান্ধী এক শয্যায় শয়ন করেছিলেন। তবে বিদেশিনীদের সঙ্গে কিঞ্চিৎ দূরত্ব থাকলেও দেশিনীদের ব্যাপারে সেটা কখনোই তাঁর ছিল না। এবার সেই কথাই বলা যাক।

১৯২০ সাল নাগাদ গান্ধী তাঁর সকাল-সন্ধ্যা ভ্রমণের সময় দুপাশে দুটি তরুণীকে ক্রাচের মত ব্যবহার করা শুরু করেন। আভা আর মনুর কাঁধে ভর দিয়ে ভ্রমণরত তাঁর ছবি তো একেবারে জগদ্বিখ্যাত। এই মেয়েদের তিনি আদর করে বলতেন — বেড়াবার লাঠি (walking stick)। বেড়ানো শেষ হলে শুরু হত লম্বা তৈলমর্দন বা ম্যাসাজ পর্ব। প্রতিদিন। এই কাজও করার দায়িত্বে থাকত তরুণী মেয়েরা। তৈলমর্দনের পর স্নানপর্ব। এখানেও তাঁর সঙ্গে একজন মেয়ে থাকা বাধ্যতামূলক ছিল। সুশীলা নায়ার ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় স্নানসঙ্গিনী। নিয়ম ছিল, গান্ধীজী যে চৌবাচ্চায় স্নান করবেন, সেই একই চৌবাচ্চায় স্নানসঙ্গিনীকেও স্নান করতে হবে। সুশীলার বয়স তখন নিতান্তই কম। উদ্ভিন্নযৌবনা। স্নান করতে করতে তার শরীরের কাপড়চোপড় বেসামাল হলেই গান্ধী পুটুস্ করে চোখ বুঁজে ফেলতেন। এটা গান্ধীর নিজের জবানীতে আছে — "my eyes tightly shut"। চোখ বন্ধ করার আগে যেটুকু দেখে ফেলতেন, সেটুকু হত তাঁর সেদিনের ব্রহ্মচর্য পরীক্ষার প্রশ্নপত্র। তাঁর শরীরে কাম জাগছে কিনা তার বিচার হত।

ক্রমশ বেড়াবার লাঠি, তৈলমর্দন ও সঙ্গিনী সহযোগে চোখ বুঁজে স্নান করার ব্যবস্থাপত্র লম্বা হতে থাকল। রাতে বিছানায় মালিশ শুরু হল, হাত-পা টিপে দেওয়া শুরু হল এবং তারপর ব্রহ্মচর্যের কোর্স যত এগিয়ে চলল, তত নূতন নূতন বিষয়ও যুক্ত হতে থাকল। এক বিছানায় শোওয়া শুরু হল। প্রথমে গায়ে দেওয়ার আলাদা চাদর থাকত, সেই ব্যবস্থা পাল্টাল। একই চাদরের নীচে শোওয়া শুরু হল। ক্রমশ মেয়েদের শরীর থেকে কাপড়ের ভার কম হওয়া শুরু করল। প্রথমে শাড়ি গেল, থাকল পেটিকোট আর ব্লাউজ। পরে সে দুটোও চলে গেল। এই যাওয়াটা যে মসৃণভাবে হয়েছিল, তা নয়। সত্যবাদী গান্ধী এই ব্যাপারের সত্যিটাও নিজেই লিখেছেন — "all of them would strip reluctantly...

and they did so at my prompting" অর্থাৎ পুরো কাপড়চোপড় খুলতে তারা স্বচ্ছন্দ ছিল না। আমার বলাতেই তারা ওসব খুলত।

ক্রমশ এই আজব ব্রহ্মচর্য — যা পৃথিবীর কোথাও কোনও সাধক কল্পনাতেও আনতে পারেননি — তা গান্ধীর অন্য কাজকর্মকে পুরোপুরি ডকে তুলে ফেলল। যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা দাবদাহের মত ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেশে, যখন দেশভাগের সম্ভাবনা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে, বাড়ছে ভারতের ভাগ্যাকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা, তখন মাঝে মধ্যে দু-একটা লম্বা চওড়া বাণী বাজারে ছেড়ে দিয়ে তিনি দিনরাত এক করে ফেলছেন তাঁর ব্রহ্মচর্যের পরীক্ষা নিয়ে। মেপে দেখছেন, তাঁর পুরুষাঙ্গের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের পরিবর্তন হচ্ছে কিনা। স্বপ্নের মধ্যে বীর্যপাত হয়ে গেলে দুশ্চিন্তার শেষ থাকছে না। চল্লিশের দশকে এই ব্যাপারটা এমন বাড়ল যে, আশ্রমে আক্ষরিক অর্থে হৈচৈ শুরু হয়ে গেল। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'হরিজন' পত্রিকার দুই সম্পাদক এই ব্রহ্মচর্যকে 'নোংরা যৌনক্রিয়া' আখ্যা দিয়ে পদত্যাগ করলেন (পরে রাজনীতির চাপে পড়ে এবং ভবিষ্যতের আখেরের কথা ভেবে তাঁরা অভিযোগ প্রত্যাহার করেন)।

সত্তরের দশকে লেখক বেদ মেহ্‌তা একটা সাক্ষাৎকার নেন গান্ধীর সবচেয়ে পোড় খাওয়া ব্রহ্মচর্য সঙ্গিনী ডা. সুশীলা নায়ারের। এই সাক্ষাৎকারে সুশীলা নায়ার জানান যে, গান্ধীর ভাইপোর মাতৃহারা মেয়ে মনু আসার অনেক আগেই তিনি গান্ধীর শয্যায় শুতেন — "Long before Manu came into the picture, I used to sleep with him just as I would with my mother." এবং সুশীলার কথা অনুযায়ী গান্ধীর এই শয়নপর্বের ব্রহ্মচর্য শুরু হয় ১৯৩৮ সাল থেকে। গান্ধীর একটা প্রশংসনীয় ব্যাপার হচ্ছে, তিনি যা করতেন, সেটা কিছুটা হলেও বলে দিতেন। একেবারে চেপে রাখতেন না। যে সাহস খুব কম মহাপুরুষের আছে। গান্ধী লিখেছেন "I can hurt colleagues and the entire world for the sake of truth." (সুশীলা নায়ারকে লেখা চিঠি)। ঈশ্বর হওয়ার অমোঘ বাসনায় নিজের ব্রহ্মচর্য পরীক্ষার খুঁটিনাটি বিষয়ও তিনি নোট্ করে গিয়েছেন এবং মুখ্যত তাঁর নিজের দেওয়া সেইসব ধারাবিবরণীই এব্যাপারে বড় দলিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গান্ধীর চরিত্র রক্ষা করতে এবং নিজেদের মুখে কালি যাতে না লাগে, তার জন্য গান্ধীর এইসব সঙ্গিনীরা এই বিষয়ে লেখা গান্ধীর বহু চিঠিপত্রাদি নষ্ট করে ফেলেছেন। তবু যেসব তথ্যাদি এদিক সেদিক থেকে জড়ো করা গিয়েছে, তার ভিত্তিতে গান্ধীর এইসব সঙ্গিনীদের একটি তালিকা তৈরি করা যায়। তালিকাটি এরকম—

সুশীলা নায়ার : ১৫ বছর বয়সে সবরমতী আশ্রমে প্রথম আসেন এবং গান্ধীর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহযোগী হন। গান্ধী তাঁকে বলতেন 'স্বভাব-ব্রম্ভচারিনী'। আগেই জানানো হয়েছে, গান্ধীকে তেল মাখাতেন ও স্নান করাতেন। নিজেও স্নান করতেন গান্ধীর সঙ্গে। রাতে একসঙ্গে এক শয্যায়, এক চাদরে, জন্মদিনের পোশাকে শুয়েও পড়তেন। গান্ধী এত চেষ্টা করেও এবং জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছেও যে কামকে জয় করতে পারেননি, সুশীলা একটি কচি মেয়ে হয়ে তা কী করে পারবে? মাঝে মাঝে যে রিপুর ঝড়-ঝাপটা উঠত না, এমন নয়। দু-একটি এমন ঘটনার কথা প্রকাশ্যেও এসেছে। এনেছেন গান্ধী স্বয়ং।

১৯৩৮ সালে যৌন-পরীক্ষার বিপদের কথা বলতে গিয়ে গান্ধী স্বীকার করেছেন, এই পরীক্ষার জন্য এখনও তিনি প্রস্তুত নন। যদিও এটা বলেছেন — "(I) can keep sexual desire under control... (but) not completely eradicated the sex feeling." আর পুরোপুরি তৈরি না হয়ে পরীক্ষায় বসলে যেমন ফেল করার সম্ভাবনাটাই বাড়ে, এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। মাঝে মধ্যেই ফেল করেছেন এবং তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী মাঝে মধ্যে 'কালো রাত্রি' (black nights) এসেছে যখন ঈশ্বর তাঁকে বাঁচিয়েছেন — God saved me 'in spite of' myself. এই in spite of myself শব্দবন্ধটি বিচারের দাবি রাখে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই ধরে নেওয়া যায়, তাঁর নিজের ইচ্ছা থাকত ওইসব কালো রাত্রে নিজেকে আরও কলঙ্কিত করতে, কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে সেই কলঙ্কের পথে অগ্রসর হতে দেননি। এই ঈশ্বর যে অনেকক্ষেত্রে সঙ্গিনীদের আপত্তির মাধ্যমে এসেছিলেন, এমন ভাবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিংবা এগিয়ে গিয়েও শেষ মুহূর্তে বিবেকের তাড়নায়ও পিছিয়ে আসতে পারেন — এমনটাও হতে পারে।

এইরকমের এক কালো রাত্তিরের ঘটনা ঘটেছিল ১৯৩৮ সালের ৯/১০ মে তারিখের মধ্যরাত্রে। সুশীলা নায়ারের ভাই প্যারেলালকে এক চিঠিতে গান্ধী লিখছেন — 'আমার মনে এখনো নোংরা আছে অথবা শয়তান ভর করেছিল আমার ওপর। এই অসুস্থ মন আমার ভিতরের ক্ষিদেটাকে জাগিয়ে তুলেছিল। তার জন্য সুশীলাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি।' এর আগে সুশীলা সম্পর্কে গান্ধী বলেছিলেন — Her purity could forestall any mistake I may make (তার সততা আমার যে কোনও ভুলকে আটকে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে)। আরও বলেছেন, 'তার সঙ্গে সম্পর্ক আমার মধ্যে অনেক বেশি সততার জন্ম দিয়েছে।' এহেন সুশীলা নায়ারের সঙ্গে নিশ্চয়ই সেই রাত্রে বড় কিছু ঘটেছিল। অনেক

গান্ধী-আলোচক সেই সম্ভাবনার কথা বিশ্বাস করেন, অনেকে করেন না। শেষোক্ত শ্রেণি মনে করেন, গান্ধীর মধ্যে সর্বদাই একটি দ্বৈত সত্তা কাজ করেছে। একটি সত্তা ছিল অসম্ভব কামুকতার, যে কামুকতা তাঁকে সুশীলার শরীরকে ভোগ করার দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেই রাত্রে। আর একটা সত্তা নিজের কামকে জয় করার দৃঢ় একটা চেষ্টাও, যে চেষ্টা তাঁকে বারাঙ্গনাদের ঘর অবধি টেনে নিয়ে গিয়েছে বারে বারে, কিন্তু সম্ভোগের প্রাক্-মুহূর্তে তাঁকে নিবৃত্তও করেছে। এই নিবৃত্তির চেষ্টাই সম্ভবত শেষ মুহূর্তে তাঁকে সুশীলার কাছ থেকেও সরিয়ে এনেছিল।

সুশীলা নায়ারের সঙ্গে গান্ধীর এমনই আর এক 'কালো রাত্রি'র ঘটনা ঘটেছিল ১৯৪৬ সালের ১৭ ডিসেম্বরের শেষ রাত্রে। নোয়াখালিতে। গান্ধীর আশ্রমে তখন ছিলেন তাঁর অন্যতম সেক্রেটারি অধ্যাপক নির্মল কুমার বোস। অধ্যাপক বোস ভোর তিনটে কুড়ি নাগাদ শুনতে পেলেন দুটি ঠাস্ ঠাস্ করে চড় মারার শব্দ এবং তার সঙ্গে নারীকণ্ঠের তীব্র কান্না। শব্দটা আসছিল গান্ধীর শয়নকক্ষের দিক থেকে। ছুটলেন বোস। গান্ধীর শয়নকক্ষে ঢুকে দেখলেন, গান্ধী এবং সুশীলা দুজনেই কাঁদছেন। গান্ধীর নাতনী মনুও সেখানে হাজির, তার চোখে অবশ্য জল নেই। আরও এক নারী ছিলেন সেখানে, জল নেই তারও চোখে। বোস বুঝলেন, মনু এবং অন্য মহিলাটি এই নাটকের পার্শ্বচরিত্র, মূল চরিত্র হলেন গান্ধী ও সুশীলা নায়ার। যেটুকু আঁচ করতে পারলেন শ্রী বোস, তা হল, গান্ধী সম্ভবত সুশীলাকে ঠাস ঠাস করে দুটি চড় মেরেছেন। কিন্তু এই শেষ রাতে বিশ্ব যখন নিদ্রামগন, এমন কি একই ঘরে একই শয্যায় শায়িতা অন্য দুই নারী যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তখন কী এমন হয়েছিল যে, সুশীলাকে চড় মারতে হল! সুশীলা বলল, বাপু তাকে মারেননি, চড় মেরেছেন নিজেকে। ব্রহ্মচর্যের পরীক্ষায় সে রাতে ফেল করেছিলেন তিনি, কাম জেগেছিল তাঁর মধ্যে, এগিয়েছিলেন সুশীলার দিকে, ঘুম ভেঙে গিয়েছিল সুশীলার। সে বুঝতেও পেরেছিল যে কী হতে যাচ্ছে। আর তখনই 'রামনাম'-এর জোরে বাঁচলেন গান্ধী। আর বাঁচবার পর অনুশোচনায় নিজের দুই গালে ঠাস ঠাস করে দুটি চড় বসিয়েছেন নিজেই।

মনে রাখতে হবে, এই ঘটনা যখন ঘটে, তখন গান্ধীর বয়স সাতাত্তর এবং তাঁর ব্রহ্মচর্যের বয়স চল্লিশ বছর (শুরু ১৯০৬ সালে)। চল্লিশ বছর ধরে এত সাধনা, এত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল যে তাঁকে পাশমার্কটুকু দিতে পারেনি, তার প্রমাণ এই ঘটনা। অর্থাৎ তাঁর আদর্শকে তাঁর রাজনীতিকে ছাপিয়ে যে ব্রহ্মচর্যের সাধনা হয়ে উঠেছিল তাঁর জীবনবেদ, যে বেদের অধ্যয়ন নোয়াখালির সেই

ভয়ঙ্কর গণহত্যার দিনেও তিনি নিয়মিত চালিয়ে গিয়েছেন মনু-আভা-সুশীলাদের সঙ্গে, তাতেও তিনি ডাহা ফেল করলেন। ভারতের মহিলাদের ভাগ্য ভাল, গান্ধীর আগে এমন ব্রহ্মচর্য আর কোনও সন্ত-মহাত্মারা করেননি। তা যদি করতেন, তবে মহিলা ভক্তদের দুর্দশার অন্ত থাকত না। যে দুর্দশা বর্তমানকালে কিছু সন্তের কারণে মেয়েদের হচ্ছে। তাঁরা সবাই প্রকাশ্যে গান্ধীভক্ত না হলেও গান্ধীর ব্রহ্মচর্য পরীক্ষা সম্ভবত তাঁদের এইসব কাজের প্রেরণা, তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁরা কমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেন, তবে নাকি চরম কিংবা পরম কাজটি করেন না। এই প্রসঙ্গে সন্ত আশারাম বাপুর কীর্তিকাহিনি গান্ধীর অনুরূপ। তফাৎটা এই যে, গান্ধীকে ধরার সাহস বা সুযোগ পুলিশের ছিল না, কিন্তু আশারামের সে সৌভাগ্য হয়নি।

কিন্তু একটা প্রশ্ন অত্যন্ত সঙ্গত কারণে করা যায়। তা হল, একজন সাতাত্তর বছরের বৃদ্ধ যিনি বিগত চল্লিশটি বছর ধরে ব্রহ্মচর্যের পাঠ নিচ্ছেন, তাঁর দেহ-মন থেকে যদি 'কাম' বস্তুটি বিদায় না নিয়ে থাকে, তবে যেসব অল্পবয়সী মেয়ে বা পূর্ণযুবতীদের নিয়ে তিনি এই সাধনায় রত হতেন — তাদের অবস্থাটা কেমন হত! তারা কি নিষ্কাম হয়ে যেতে পারে? নাকি তা সম্ভব? এই প্রশ্নের জবাবও মেলে সুশীলা নায়ারের উপাখ্যান থেকে। মেডিক্যাল পড়ার জন্য মাঝে সুশীলাকে আশ্রম থেকে বিদায় নিতে হল। তার পড়ার পাঠ মিটে গেলে গান্ধী তাকে আশ্রমে ফিরতে বললেন। কিন্তু সুশীলা আপত্তি করল। সে গান্ধীর মেয়ে (daughter) হিসেবে নিজেকে দেখতে পারবে না বলে জানাল। গান্ধী তাকে চিঠি লিখলেন — Rush to me and become one with me। এই সময়ে গান্ধী এবং সুশীলার পত্রাবলী থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, সেবাগ্রাম আশ্রমে ইতিপূর্বে থাকাকালীন গান্ধীর সঙ্গে যে অভিজ্ঞতা তার হয়েছিল, তা সে ভুলতে পারছে না। অতএব গান্ধীর বারংবার আমন্ত্রণের জবাবে সে লিখল ফিরতে পারে আশ্রমে, তবে তার একটি শর্ত আছে। শর্তটি হল আশ্রমে গিয়ে গান্ধীকে কোনও সেবা (service) দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। এই সেবার ধরণটা ছিল গান্ধী গা-হাত-পা টিপে দেওয়া, তেল মাখিয়ে মালিশ করে দেওয়া। ব্রহ্মচর্য পালনের প্রথম দিকের পাঠ ছিল সেটা, বস্ত্রমোচন পর্ব শুরু হয়নি তখনও। যাই হোক, শিষ্যার এহেন শর্ত-আরোপে গান্ধী বিমর্ষ হলেন বটে, তবে মেনে নিলেন শর্ত। সুশীলা এলেন আশ্রমে। ক্রমে গান্ধী যেমন ভুললেন শর্তের কথা, সুশীলাও বাধ্য হল গান্ধীর ব্যক্তিত্বের সামনে তার শর্তের কথা তুলতে। আবার শুরু হল সেবা পর্ব। তবু বিদ্রোহ উঠে এসেছে মাঝে মাঝে। ১৯৪০-এ গান্ধীকে লেখা এক

চিঠিতে মনের আক্ষেপ উজাড় করে দিল সুশীলা। এই চিঠি সম্পর্কে গান্ধী বলেছেন — তাঁকে খুব আহত করেছে এই চিঠি। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সুশীলা গান্ধীর সঙ্গ ত্যাগ করতে পারেনি। গান্ধীর ব্যক্তিত্ব ও জেদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। আর এই আত্মসমর্পণের পর গান্ধীকে মালিশ দিতে দিতে এবং কখনো কখনো গান্ধীর কাছ থেকে মালিশ নিতে নিতে যে 'গরম' হয়নি তাও নয় এবং সেই গরম চাপতে গিয়ে মানসিক বিকারের শিকারও হয়েছে।

এই অবস্থা যে একা সুশীলা নায়ারের হয়েছে, তা নয়। আরও কয়েকজন মেয়ের ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারটা ঘটেছে। নীচে গান্ধীর ব্রহ্মচর্য সাধনার সেইসব শয্যাসঙ্গিনীদের কয়েকজনের কথা বলা হচ্ছে। অনেক মহিলার সঙ্গে গান্ধীর ঘনিষ্ঠতা ছিল। জানা গেছে, অন্তত দশজন তাঁর শয্যায় তথা তাঁর ব্রহ্মচর্য সাধনায় অংশ নিয়েছেন। এই দশজনের প্রথমা অবশ্যই সুশীলা নায়ার। বাকিরা হলেন —

মনু গান্ধী : ছিলেন গান্ধীর এক দাদার নাতনী। মায়ের অকালমৃত্যুর পর তিনি যখন সেবাগ্রাম আশ্রমে আসেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র তের বছর। গান্ধীকে 'মা' বলে ডাকতেন মনু এবং সম্পূর্ণ নিরাবরণা না হয়ে গান্ধীর কোলের মধ্যে শুয়ে, তাঁকে জড়িয়ে ধরে শোয়াটা ছিল মনুর অভ্যাস। অবশ্য অন্য সঙ্গিনীরা থাকলে ততটা ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পেতেন না। গান্ধী যখন নিহত হন, তখন তাঁর দুই পাশে ছিলেন এই মনু আর আভা গান্ধী (চট্টোপাধ্যায়)। গান্ধীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মনুকে জোর করে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয় যাতে গান্ধীজীবনের এই কালো দিকটা বাইরে ফাঁস হতে না পারে। যদিও গান্ধী তাঁর ছেলেকে এব্যাপারে নিজেই এক চিঠিতে অনুমতি দিয়ে গিয়েছিলেন — "I have asked her (Manu) to write about her sharing the bed with me", তথাপি তাঁর ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই ভয়ে মনুকে আর সামনে রাখতে সাহস করেননি গান্ধীর পরিবার পরিজন। গান্ধীপুত্র দেবদাস মনুকে দিল্লির রেলস্টেশনে নিয়ে যাওয়ার পথে বারবার সাবধান করে দিয়েছিলেন যাতে এব্যাপারে কোনও কথা কখনও সে না বলে। তারপর তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন গুজরাতে। রেখেছিলেন কড়া পাহারার মধ্যে। আর কোনওদিন মনুকে প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। গান্ধীর জীবনের শেষ আট বছর মনু সর্বক্ষণ ছিলেন তাঁর এই নতুন 'মা'-র সঙ্গে।

লীলাবতী আসার: গান্ধীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল ১৯২৬ সাল থেকে ১৯৪৮ সালে গান্ধীর মৃত্যু পর্যন্ত। এই সম্পর্কের কথা অবশ্যই সুশীলার মত সুবিদিত ছিল না। তবে গান্ধীর খুব প্রিয়পাত্রী যে তিনি ছিলেন, তাতে সন্দেহ

নেই। নইলে এত দীর্ঘস্থায়ী হত না তাঁদের সম্পর্ক। গান্ধীর শয্যায় তিনি নিয়মিত ছিলেন না বটে, তবে যখনই সেবাগ্রামে আসতেন, তখন গান্ধী তাঁর সেবা (service) নিতেন। এই সেবা বলতে অবশ্য একত্রে স্নান এবং তেল মালিশ বোঝাত। প্রসঙ্গত, এই একত্রে স্নান ব্যাপারটা — অর্থাৎ পুরুষ ও নারীর একত্রে স্নান ব্যাপারটি গান্ধীর আশ্রমে অপ্রচলিত ছিল এমন নয়। গান্ধী ছাড়াও এমন অভিজ্ঞতা আরও কিছু আশ্রমিকের জীবনে হয়েছে। যদিও গান্ধীর আশ্রমে পুরুষ ও মহিলাদের থাকার জন্য আলাদা বাড়ির ব্যবস্থা ছিল, তথাপি মাঝে মাঝে গান্ধী তাঁদের একত্রে স্নান করতে উৎসাহিত করতেন। এব্যাপারে গান্ধী একদা বেশ গর্ব করে লিখেছিলেন — "I sent the boys reputed in mischievous and the innocent young girls to bathe at the same time." বদমাস ছেলেদের সঙ্গে নিষ্পাপ মেয়েদের একত্রে স্নান করতে বলতেন। কী চমৎকার জুটি! আর এটা কেন করতেন তিনি? এখানেও তাঁর অদ্ভুত দর্শন — যাকে পাগলের কাণ্ডকারখানা বললে অত্যুক্তি হয় না। এটা তিনি করতেন যাতে তারা প্রবৃত্তিকে জয় করতে পারে। যে প্রবৃত্তিকে জয় তিনি সাতাত্তর বছর বয়সেও করতে পারেননি, সেটা প্রত্যাশা করতেন অল্পবয়সী যুবক-যুবতীদের কাছ থেকে। যাই হোক, এভাবে স্নান করতে পাঠিয়ে নিজে আবার কড়া হেডমাস্টারের মত নজর রাখতেন তাদের ওপর। বেচাল বুঝলে বেচারা মেয়েরা শাস্তি পেত। তাদের চুল কেটে শরীরের আকর্ষণ কমিয়ে দিতেন। সেই সঙ্গে অন্যান্য শাস্তিও থাকত।

শারদা পার্ণেকর: মারাঠি এই মহিলা ছিলেন রীতিমত সুন্দরী। আশ্রমে তেমন নিয়মিত না হলেও আসতেন। গান্ধীর পাশে শয্যাগ্রহণ করতেন। যথারীতি গান্ধীর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতেন। ১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে শারদা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। মলদ্বারে ফিস্‌চুলা জাতীয় অসুখ। গান্ধী তাকে এইসময় খুব সেবা করেন। মলদ্বারের ভিতরে নিজের হাতে ওষুধ লাগিয়ে দিতেন।

আমতুল সালাম: পাতিয়ালার এই পাঞ্জাবী মুসলমান যুবতীটিকে গান্ধী আদর করে ডাকতেন 'পাগলী' (crazy girl) বলে। গান্ধী যে তাঁর শয্যায় আমতুলের কাছ থেকে শুধুই নিজে মালিশ নিতেন তা নয়, মাঝে মাঝে তাকেও মালিশ দিতেন। গান্ধী তাঁর আত্মজীবনীতে একজায়গায় লিখেছেন — আজ যখন আমি আমতুলকে মালিশ দিলাম, সে অতি আনন্দ পেল।

কাঞ্চন শাহ্: মালিশের কথা বলতে হলে কাঞ্চন শাহ্-র নাম সবার আগে বলতে হয়। মাত্র একটি রাত গান্ধীর শয্যায় এসেছিলেন কাঞ্চন। তখন তিনি বিবাহিতা। গান্ধী তাঁকে বিবাহিত জীবনের ব্রহ্মচর্য বিষয়ে জ্ঞান দেন প্রথমে। বলে

দেন কীভাবে স্বামীকে পিতার মত, ভাইয়ের মত, পুত্রের মত দেখতে হবে। এসব বলতে বলতে তিনি কাঞ্চনকে মালিশ দেওয়া শুরু করেছেন। আর সেই মালিশ নিতে নিতে কাঞ্চন এত গরম হয়ে গেল যে, সোজাসুজি গান্ধীকে বলেই ফেলল যে, যৌনক্রিয়া করতে চায় সে গান্ধীর সঙ্গে। গান্ধী অবশ্য রাজী হন নি। বরং কাঞ্চনের গরম থামাতে সেই রাত্রে ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

রাজকুমারী অমৃত কৌর: পরবর্তী জীবনে স্বাধীন ভারতের প্রথম স্বাস্থ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। গান্ধীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল ১৯১৮ সাল থেকে। অনেক পরে গান্ধী যখন তাঁর স্পেশ্যাল ব্র্যাণ্ড ব্রহ্মচর্যের পরীক্ষা শুরু করেন, তখন সেই পরীক্ষায় বয়স বেশি হয়ে গেলেও হাসিমুখে অংশ নিতেন। অনেকেই বলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর গান্ধীর সৌজন্যে তিনি ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হন।

সুচেতা কৃপালনী: প্রভাবতী নারায়ণের মত ইনিও গান্ধী-প্রদর্শিত বিবাহিত ব্রহ্মচর্যের বড় উদাহরণ। গান্ধীর প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি আচার্য জে বি কৃপালনীকে বিবাহ করেছিলেন। গান্ধীর নোয়াখালি যাত্রায় ইনি সঙ্গী হয়েছিলেন। ধারণা করা হয় যে, ১৯৪৬ সালের ১৭ ডিসেম্বরের রাতে সুশীলার সঙ্গে অনামী মহিলা হলেন এই সুচেতাই। যার অর্থ গান্ধীর শয্যায় তিনিও থাকতেন। কিন্তু গান্ধী যখন তাঁকে নিয়মিত তাঁর শয্যায় আসার আমন্ত্রণ জানান, তখন সুচেতা সেই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন যে, বিবাহিতা নারীদের আলাদা শয্যায় শোওয়াটা আশ্রমের নিয়ম। সুচেতা বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির অধ্যাপিকা ছিলেন এবং ভারতের পার্লামেন্টে সাংসদও হয়েছিলেন। অল্প সময়ের জন্য হলেও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীও হয়েছিলেন।

আভা গান্ধী (চট্টোপাধ্যায়): গান্ধীর ব্যক্তিগত পরিচর্যাকারিণী ও তাঁর সর্বসময়ের সঙ্গিনী হিসেবে আভা গান্ধীর নাম মনু গান্ধীর নামের সঙ্গে একসাথে উচ্চারিত হয়। দুই নারীর কাঁধে হাত রেখে চলমান গান্ধীর যে ছবির সঙ্গে সারা পৃথিবী পরিচিত, সেই দুই নারীর একজন ছিলেন এই আভা। বাংলার মেয়ে। গান্ধী-ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য কানু গান্ধীকে বিবাহ করেন। গান্ধী অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হন এই বিবাহের জন্য। আভাকে আদেশ করেন বিবাহিত ব্রহ্মচর্যের আদর্শ গ্রহণ করে স্বামীকে ছেড়ে আশ্রমে এসে থাকবার জন্য। স্বামীকে ছাড়বেন, না গান্ধীকে — এই দোটানায় বিপর্যস্ত আভা তাঁর স্বামীকে জানালেন সবকিছু। বললেন, বাপুর পাশে তিনি না শুলে বাপুর বিছানা গরম হয় না। বাপু ঘুমোতে পারেন না। একথা শুনে কানু নিজে গেলেন গান্ধীর কাছে এবং প্রার্থনা করলেন আভার বদলে যেন তাকে Bed Warmer বা শয্যাগরমকারী হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

গান্ধী অবশ্য সেই আবেদন শোনামাত্র প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। গান্ধীর হাত থেকে মুক্তি পেলেন আভা, তবে সেই মুক্তি সাময়িক। ১৯৪৬-এ নোয়াখালি যাত্রার সময় আভা আবার এলেন গান্ধীর পাশে। গেলেন নোয়াখালি। তারপর গান্ধীর মৃত্যু পর্যন্ত ছিলেন সঙ্গে।

আভা কি মনুর মত নিরাবরণ হয়ে গান্ধীর সঙ্গে এক চাদরের নীচে শয়ন করতেন? এই প্রশ্নের উত্তর আভা নিজেই দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, প্রথম প্রথম পুরো পোশাক খোলাতে তাঁর আপত্তি থাকত। কাপড়টা খুলতেন বটে, তবে পেটিকোট এবং অন্যান্য ভিতরের পরিচ্ছদ (inner wears) থাকত। কিন্তু বাপু আপত্তি করতে থাকলেন। বললেন, সম্পূর্ণ নিরাবরণ না হলে ব্রহ্মচর্যের পরীক্ষা সম্পূর্ণভাবে করা যাচ্ছে না। অগত্যা শরীরে সুতো রাখা বন্ধ করলেন। নিয়ম থাকত, সাধারণভাবে গান্ধীর বাম পাশে থাকবেন মনু, ডানপাশে আভা। সুশীলা কিংবা অন্যরা এলে অবশ্য মনু-আভাকে কিঞ্চিৎ দূরে সরে যেতে হত। তাদের জায়গায় সেদিনের নবীনারা আসত।

যে সঙ্গিনীদের কথা এতক্ষণ বলা হল, তাদের বাইরে হঠাৎ আসা কোনও দম্‌কা হাওয়া যে থাকত না, তা নয়। রাজনীতির বিচারে, মিথ্‌-এর বিচারে গান্ধী তখন আরবের বেদুইন সর্দারের মত। মেয়েরা লাইন দিয়ে অপেক্ষা করছে তাঁর সাধনসঙ্গিনী হওয়ার জন্য। তাঁর হারেমে প্রবেশের জন্য। গান্ধী তাঁদের সুযোগও দিচ্ছেন দরাজ প্রাণে। এমনই এক দম্‌কা হাওয়ার নাম বীণা। সম্ভবত এটি তার ছদ্মনাম। কারণ, বীণা নামের কোনও মহিলাকে বিশেষভাবে সনাক্ত করা যায়নি গান্ধীর ভক্তমণ্ডলীতে। তবু সেই বীণা সম্পর্কে গান্ধী নিজে তাঁর মাই এক্সপেরিমেন্ট উইথ ট্রুথ-এ লিখেছেন — 'Vina's sleeping with me might be called an accident. All that can be said is that she slept close to me'।

আসলে এক নারীতে গান্ধীর ব্রহ্মচর্য তেমন জমত না। কারণটা খুব পরিচিত। ঘর কা মুর্গা ডাল বরাবর। মনু-আভা-সুশীলারা প্রতি রাতের সঙ্গিনী, প্রতি রাত তাদের সঙ্গে শোওয়ার ফলে তাদের আকর্ষণ যে কমে যাবে, সেটা তো স্বাভাবিক। মাঝে মধ্যে তাই রুটিনের বাইরে 'বাহার কা মুর্গা'দের ডাক পড়ত। একটা নূতন শরীরের সংস্পর্শে এসে ব্রহ্মচর্য পরীক্ষা আরও কষ্টকর হত। আর যত কড়া প্রশ্নপত্র আসত, গান্ধী তত উৎফুল্ল হতেন। নিজেকে আরও কঠোরভাবে পরীক্ষার সুযোগ মিলত তাঁর।

এইসব চরিত্রের বাইরে আরও কিছু চরিত্র থাকত, যাঁদের নিয়ে গান্ধীর স্বর্গীয় প্রেমের খেলা চলত। তাঁরা শয্যায় আসতেন না। এমনই একজন ছিলেন

বাঙালি কন্যা সরলাদেবী। এক পাঞ্জাবি সঙ্গীতকারকে বিয়ে করে যাঁর পদবী হয়েছিল সরলাদেবী চৌধুরানী। অসামান্যা সুন্দরী, সুগায়িকা, সুলেখিকা সরলাকে দেখে গান্ধীর মাথা ঘুরে গেল। তার প্রেমে পড়ে গেলেন গান্ধী। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর ১৯২০ সালে যখন সরলার স্বামী ব্রিটিশ জেলে বন্দী, তখন সরলাকে নিয়ে সারা ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। বলা বাহুল্য, রাজনীতিবিদের ভ্রমণ যেমন সাধারণত হয়, তেমন ছিল গান্ধীর ভ্রমণ। যেখানে যেতেন, সভাসমিতি ঠিক করেই যেতেন। সরলা থাকতেন সঙ্গে। সরলাকে গান্ধী তাঁর আধ্যাত্মিক স্ত্রী (spiritual wife) বলতেন। বলতেন, তাঁদের দুজনের intellectual wedding হয়ে গেছে। সরলা তাঁকে কেমন ভালবাসতেন সে সম্পর্কে গান্ধী জানিয়েছেন — "... (I)... have bathed in her deep affection and she has showered her love on (me) in every possible way."। সরলাদেবী তাঁর জীবন থেকে আস্তে আস্তে চলে গেলে সেই শূন্যস্থান পূরণে আসেন ম্যাডেলিন স্লেড বা মীরাবেন।

এতক্ষণ ধরে গান্ধীর যৌনচিন্তা ও ব্রহ্মচর্য নিয়ে যা বলা হল, তার পরিপ্রেক্ষিতে যদি গান্ধীর চরিত্র নিয়ে কেউ বাজে কথা বলে, তবে দোষটা কার সে বিচার, পাঠক, আপনার। কিন্তু মনে করবেন না যে, এই অভিযোগ এখন উঠছে। আসল ব্যাপারটা হল, জীবদ্দশাতেই গান্ধী এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন এবং মুখোমুখি হওয়ার পর বিষয়টিকে যে তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন, তা নয়। বেশ সোজাসাপটাভাবে নিজের কাজকে সমর্থন করেছেন। যখন আশ্রমে গুঞ্জন উঠল মনুকে নিয়ে — গান্ধী বললেন — তাঁর পাশে না শুলে অসুবিধা হবে মনুরই। তাছাড়া মনু অন্য জায়গায় শুলে প্রমাণ হবে যে তাঁর ব্রহ্মচর্য ব্যর্থ হয়েছে। বলা বাহুল্য, আলাদা শোয়া আর হয়নি মনুর।

কিন্তু একটা প্রশ্ন এবার করা যায়। যে প্রশ্নটি নিয়ে শুরু হয়েছিল এই আলোচনা। সেটা হল, এব্যাপারে কোনও সংশয় নেই যে, গান্ধী তাঁর শয্যায় একজন-দুজন নয়, বহু রমণীকে নিয়ে শুয়েছেন। যাদের নিয়ে শুয়েছেন, তাদের সঙ্গে যৌনসম্পর্ক গড়ে উঠেছে, এমন প্রমাণ কি একটাও পাওয়া গেল? হ্যাঁ, কিছু ক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে লোভ এসেছে ঠিকই, কাম জেগেছে এটাও ঠিক, কিন্তু যৌনক্রিয়া বলতে যা বোঝায়, তা খুব সম্ভব হয়নি। অন্তত সন্দেহাতীতভাবে জানা যায়নি যে, তা হয়েছে। তাহলে গান্ধীকে আমরা কতটা অপরাধী ভাবব?

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথামৃত-এর একটি কাহিনির উল্লেখ করব। বেশ্যাপাড়ার মুখে এক বটগাছ। সেই বটগাছের তলায় এক সাধু এসে

ডেরা বেঁধেছেন। দিনরাত ভগবানের নামগান করেন সাধু, কিন্তু নজরটি থাকে বেশ্যাপাড়ার দিকে। কে এল, কে গেল, দিনরাত বসে বসে তাই লক্ষ করেন। ওই গলিতে থাকে এক রমণী। সে ভোর রাত্রে গঙ্গাস্নানে যায় সাধুর সামনে দিয়ে। ফেরার সময় সাধুকে প্রণাম করে আর ভগবানের উদ্দেশে বলে — ঠাকুর, এই নোংরা জীবনে আর কতদিন থাকতে হবে? মৃত্যু দাও আমাকে।

সেই মৃত্যু এল একদিন। বারাঙ্গনা মেয়েটির এল, সাধুরও এল। কিন্তু ঈশ্বরের বিচারে মেয়েটি পেল স্বর্গ, আর সাধু পেল নরক। সাধু বলল, সারাদিন তোমার নাম করি ভগবান, অথচ আমাকে দিলে নরক। আর ওই খারাপ মেয়েটা সারাদিন নোংরা কাজ করে, তাকে দিলে স্বর্গ? এ কেমন বিচার?

ভগবান বললেন, ওই মেয়ে নোংরার মধ্যে থাকত বটে, তবে তার নজর থাকত নোংরার বাইরে। আর তুই নোংরার বাইরে থাকতিস বটে, কিন্তু নজর রাখতিস নোংরার দিকে। এইজন্যেই সে পেল স্বর্গ, আর তুই পেলি নরক।

বিচারের এই ধারাকে সামনে রেখে তাই আমরা বিচারে গান্ধীর জন্য স্বর্গের ব্যবস্থা কোনওমতেই করতে পারি না। গান্ধী যৌনক্রিয়া করেছেন না করেননি, সেই তর্ক অবান্তর। কিন্তু অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে, যৌনচিন্তা ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। ওই নোংরার দিকে তিনি সবসময় তাকিয়ে থাকতেন। অতএব 'অক্ষয় নরক'ই তাঁর উপযুক্ত স্থান।

বিচারে একটু বোধহয় ভুল হল। দণ্ডবিধির নিয়ম-অনুযায়ী অপরাধী যদি মানসিকভাবে অপ্রকৃতিস্থ থাকে, তবে তার সাজা অনেক ক্ষেত্রে হয় না, হলেও অনেক কমে যায় সেই সাজা। এমন কিছু কি ঘটার সম্ভাবনা আছে গান্ধীর ক্ষেত্রে? সত্যিই কি এটা তাঁর যৌন পাগলামি ছিল? নাকি তাঁর কোনও যৌন রূপান্তর ঘটেছিল, যার জন্য মেয়েরা তাঁকে জড়িয়ে ধরে শুতে দ্বিধা করত না? তিনি কি ক্রমশ নারী হয়ে যাচ্ছিলেন? নাকি তিনি হিজড়া হচ্ছিলেন? মেয়েরা তাঁর পৌরুষত্বকে গুরুত্ব দিত না কেন? বলা বাহুল্য, এসব ব্যাপারে যারা পাগলামিতে ভোগে, বাইরে থেকে তাদের সাধারণ বলেই মনে হয়। গান্ধীর মধ্যে কি তেমন কোনও ব্যাপার ছিল? এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে হয় তাহলে।

গান্ধীর কি যৌন রূপান্তর ঘটেছিল?

গান্ধী তাঁর আত্মজীবনী মাই এক্সপেরিমেন্ট উইথ ট্রুথ গ্রন্থে লিখেছেন, কীভাবে তাঁর সতের বছর বয়সী নাতনী মনু পোশাক-আশাক খুলে নিরাবরণ হয়ে তাঁর পাশে অসংকোচে ঘনিষ্ঠ হয়ে শুয়ে থাকত। গান্ধীর কথায়, একটি যুবতী মেয়ের

শরীরের সঙ্গে এভাবে সংলগ্ন হয়েও তাঁর মধ্যে কোনও যৌন আকাঙ্খা জাগত না এবং আরও বড় কথা, এভাবে তাঁর পাশে শুয়ে থাকাতে মনুর মধ্যেও না দেখা দিত কোনও যৌন-উত্তেজনা, না সে বোধ করত কোনও অস্বস্তি। এর কারণ, মনুকে গান্ধী বলে দিয়েছিলেন, সে যেন তাঁকে বাবা কিংবা দাদা হিসেবে না দ্যাখে, পরিবর্তে সে যেন মা হিসেবে দেখে তাঁকে। আর মনুও সেভাবেই দেখত তাঁকে। গান্ধীকে মনু আক্ষরিক ভাবেই 'বা' বলে ডাকত। মনু নিজে স্বীকার করেছে, জীবনে কামবিষয়ক কোনও উত্তেজনা তার মধ্যে কখনো আসেনি। গান্ধী একারণে তাকে ব্রহ্মচর্যের পক্ষে আদর্শ মনে করতেন। যদিও শেষের দিকে মনুর মধ্যে কিছুটা প্রতিরোধ এসেছিল এবং গান্ধীকে সোজাসুজি জানিয়ে দিয়েছিল, তাদের একসঙ্গে শোয়াটা উচিত নয়। গান্ধীর অবশ্যই ভাল লাগেনি ব্যাপারটা। মনুকে বকাবকিও করেছিলেন। বলেছিলেন, মনুর অনভিজ্ঞতা (inexperience) তাঁর ব্রহ্মচর্যের বাধা হয়েছে, তাঁর নিজের কোনও দোষ নেই এব্যাপারে। এই ঘটনা গান্ধীর মৃত্যুর মাত্র পাঁচদিন আগে ঘটেছিল। মনুর বদলে আভা হয়েছিল গান্ধীর শেষ ব্রহ্মচর্য গিনিপিগ। কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ।

গান্ধীর শয্যাসঙ্গিনী আভা চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে যে কামের ব্যাপারটা ছিল না, তা নয়। কানু গান্ধীকে বিয়ে করে গান্ধীর আশ্রম ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। গার্হস্থ্য জীবনের সব ধর্ম পালন করেছেন। দুবার গর্ভসঞ্চার হয়েছিল, গর্ভাবস্থাতেই মৃত্যু ঘটে ভ্রূণের। দুবারই (এই খবরটি কোনও বইয়ে পাই নি, পেয়েছি তাঁর বাপের বাড়ি থেকে)। পরবর্তী জীবনে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন একটি মেয়েকে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে অগুনতি মেয়েরা গান্ধীর জীবনে আসছেন, গান্ধীর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক তৈরি করছেন, তাঁর শয্যায় সঙ্গিনী হওয়ার জন্য কোনওরকমভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হচ্ছেন না, এর কারণ কী? আর যাই হোক, গান্ধী তো একজন পুরুষ, যেখানে মেয়েরা যুবতী হলে তাদের বাবার সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করতে লজ্জা বোধ করে, গান্ধীর জন্য কোনও দ্বিধা কেন আসত না তাদের মধ্যে — এর কারণ কী?

এর বড় কারণ, গান্ধীকে তারা পুরুষ নয়, নারী হিসেবে দেখত। গান্ধীর নারীসত্তাকে দেখেছিল তারা। বিশ্বাস করত, এই পুরুষটি তাদের শরীরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে না। কারণ, মানুষটি শরীরের দিক থেকে পুরুষ অবশ্যই, কিন্তু তার মানসিকতা নারীর। প্রশ্ন ওঠে, তাই যদি হবে, তাহলে চার-চারটি সন্তানের পিতা হলেন কিভাবে তিনি? জীববিজ্ঞানের নিয়মে এর জন্যও কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। শারীরিক ভাবে তিনি সবসময়েই পুরুষ ছিলেন, কিন্তু মানসিকভাবে ক্রমশই তিনি বেশি করে নারী হয়ে যাচ্ছিলেন।

এটা যে সম্ভব, তার কিছু না কিছু উদাহরণ আমরা সচরাচর দেখেও থাকি। আমার পরিচিত দেবুদি বলে একজনের কথা বলি। পুরো নাম ছিল দেবাশিস। মেয়েলি হাবভাবের জন্য আমরা দেবুদা না বলে বলতাম দেবুদি। এহেন দেবুদির ত্রিশ বছর বয়সে বিয়ে হয়, বছর দুয়েকের মধ্যে একটি মেয়ে হয়। তারপর থেকে এক অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা যায় তার মধ্যে। দিনে দুবার করে দাড়ি-গোঁফ কামাত, ভুরু প্লাক্ করত, গালে রুজ ঘষত, হালকা লিপস্টিক পরত, চোখে সুর্মা লাগাত। ক্রমশ কথার ধরণ, আরও বেশি রকমের মেয়েলি হতে শুরু করল। কোন স্ত্রী তার স্বামীর এই অবস্থা সহ্য করতে পারে? দেবুদির বউও পারল না। মেয়ে নিয়ে বউ চলে গেল বাপের বাড়ি। আমরাও এবার আড়াল ছেড়ে একেবারে সামনাসামনি দেবুদা থেকে চলে এলাম দেবুদি-তে। দেবুদির বন্ধুর চেয়ে বান্ধবীর সংখ্যা এখন বেশি। একবার শুনেছিলাম, অপারেশন করে লিঙ্গ পাল্টাবে দেবুদি। গান্ধীর সময় যদি চালু থাকত লিঙ্গান্তরের অপারেশন, তাহলে কি তিনি মহিলা হয়ে যেতেন? কী জানি। *Brahmacharya, Gandhi and His Woman Associates* গ্রন্থে লেখক গিরিজা কুমার এই প্রশ্নটি নিয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, গান্ধী শুধু মহিলাদের যে ভালবাসতেন তা নয়, তিনি 'মহিলা সত্তাকে'ও ভালবাসতেন। জানিয়েছেন — 'Gandhi had a great desire to be a woman...'। গান্ধী তাঁর যৌন আবেগকে দমন করার চেষ্টার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে তাঁর পুরুষসত্তাকে দমন করার চেষ্টা করেছিলেন। পুরুষালি ভাব ত্যাগ করে মেয়েলি ভাব আনতে চাইছিলেন। এর মানে হল মেয়েলি গুণাবলী বাড়িয়ে তুলছিলেন নিজের মধ্যে। একই দেহে পুরুষ ও নারীর এই সহাবস্থানের কথা ঈশ্বরের 'অর্ধনারীশ্বর' রূপের মধ্যে পাই আমরা। মনু গান্ধী পরবর্তী জীবনে একটি বই লিখেছিলেন, তার নাম — *Bapu, My Mother*। এই বইয়ে তিনি লিখেছেন বাপুর মধ্যে মেয়েলি স্বভাব, মেয়েলি হাবভাব ও অন্যান্য নারীসুলভ গুণাবলী কিভাবে দিন দিন বাড়ছিল। যখন দরকার পড়ত সঙ্গিনীদের শরীরেও তিনি মালিশ করতেন। একজন রমণীর মতই।

সুশীলা নায়ার একবার বলেছেন — "there was nothing special about sleeping next to Bapu... I used to sleep with him just as I would with my mother." অর্থাৎ মা আর মেয়ে যেমনভাবে শুয়ে থাকে, তেমন ভাবেই থাকত তারা। শুধু যে শোয়া তা নয়, সুশীলার সঙ্গে এক চৌবাচ্চায় একত্রে স্নানও করতেন গান্ধী। তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি এব্যাপারে ছিল এরকম — "While she is bathing, I keep my eyes tightly shut. I donot

know the manner of her bathing, whether she bathes naked or with her underwear on. I can tell from the sound that she uses soap. I have seen no part of her body..." এই স্বীকারোক্তি থেকে একটা জিনিষ অন্তত বোঝা যায় যে, স্নানঘরে ঢোকার সময় গান্ধী মহিলা হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সুশীলা কাপড়চোপড় খুলে ফেলার উপক্রম করতেই সম্ভবত কিঞ্চিৎ পুরুষ হয়ে যান এবং যদি চিত্তবৈকল্য উপস্থিত হয়, তাই চোখ বুঁজে ফেলতেন। তখন শুধু সুশীলার সাবান-ঘষার শব্দটাই শুনতে পেতেন।

তার মানে নারীত্বে তখনও পুরোপুরি রূপান্তরিত হতে পারেননি তিনি। কখনও শরীরে পুরুষের ইচ্ছা আসছে, কখনও নারীর। যখন পুরুষের ব্যাপার আসছে, ক্ষেপে লাল হয়ে যাচ্ছেন। নিজেকে শাস্তি দিচ্ছেন নিজেই। চড় মারছেন নিজের গালে, বসছেন অনশনে — আত্মশুদ্ধি বা self-purification-এর জন্য।

একদেহে নারী-পুরুষের এই একত্র অবস্থান নপুংসক বা হিজড়াদের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। গান্ধী চেয়েছিলেন হিজড়া হতে। শারীরিকভাবে সেটা সম্ভব না বলে চেয়েছিলেন মানসিকভাবে। এইজন্যেই তিনি বলেছিলেন, — 'I deliberately want to become a eunuch mentally'। এহেন ইচ্ছার কারণ অবশ্যই শরীর থেকে কামকে দূর করা। কিন্তু এ ধারণাটা রীতিমত ভুল যে নপুংসকের শরীরে যৌন-আকাঙ্খা জাগে না। তার প্রমাণ, মোগল বাদশাদের হারেমে থাকা রমণীদের সঙ্গে নপুংসকদের গড়ে ওঠা যৌন সম্পর্কের একাধিক ঘটনার মধ্যে পাওয়া যায়।

গান্ধী কী তান্ত্রিক ছিলেন?

ভারতীয়দের, বিশেষ করে বাঙালিদের কাছে তন্ত্র ও তান্ত্রিক খুবই পরিচিত শব্দ। তারাপীঠের কল্যাণে আজকের নব্যযুবকদের মধ্যেও শব্দটি যথেষ্ট চেনা। শোনা যায়, তারাপীঠের শ্মশানে তান্ত্রিক হিসেবে দু-চার রাত কাটাবার জন্যে বেশ কিছু মানুষ যানও। সেখানে রেডিমেড সাধন সঙ্গিনী পাওয়া যায়। আর কারণবারি ও মাংস পাওয়া তো আদৌ কোনও সমস্যা নয়। এইসব শখের তান্ত্রিকদের তথা বিকৃত যৌনাচারীদের কল্যাণে তারাপীঠ তথা বীরভূমের বহু জায়গাতেই অন্য ধরণের একটা সেক্স ট্যুরিজম্ গড়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য, এদের দৌরাত্ম্যে তন্ত্র এবং তান্ত্রিক শব্দের অপব্যাখ্যা ক্রমশ এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে, অনেক ক্ষেত্রেই শব্দদুটির নাম শুনলে মানুষের মধ্যে একধরণের বিতৃষ্ণা তৈরি হয়। অথচ, তন্ত্রের মূল নিহিত আছে এক গভীর দর্শনে। ঈশ্বর সাধনার অনেক পথ আছে। তন্ত্র সেইসব পথের একটি। মহাশক্তির অন্যতম উপাসনা বিধি। শক্তির জাগরণই

হল তান্ত্রিকসাধনার মূল লক্ষ। তান্ত্রিক আচার মুখ্যত বামাচারী। যে আচার তন্ত্রোক্ত পঞ্চসাধন বা পঞ্চ 'ম'-কার সহযোগে সম্পন্ন হয়, তাই হল বামাচার। এই পঞ্চ ম-কার হল — মদ্য, মাংস, মুদ্রা, মৎস্য ও মৈথুন।

গান্ধী অবশ্যই মদ, মাংস, মৎস্য গ্রহণ করতেন না। মুদ্রা শব্দের অর্থটিকে একটু ব্যাপক করে নিলে হয়তো বলা যায়, মুদ্রা গ্রহণ একেবারে পরিত্যাগ করেননি। কিন্তু সেটা তর্কসাপেক্ষ। আসল প্রশ্নটা দাঁড়াচ্ছে 'মৈথুন' শব্দটি নিয়ে। মৈথুন শব্দের অর্থ রতিক্রিয়া। অবশ্য দুটি রমণী যদি রতিক্রিয়ায় রত থাকে (আজকের বিশ্বে লেস্‌বিয়ানিজ্‌ম নামে যা পরিচিত) তাকে মৈথুন বলা যাবে কিনা ভাষাবিদরা সে প্রশ্নের উত্তর দেন নি এখনো। মৈথুন অর্থে আমরা তাই ধরি রতিক্রিয়া বা রমণরত নারী-পুরুষ।

প্রশ্নটা হচ্ছে, নারী-পুরুষের রমণ তো অতি সাধারণ ও সহজ বিষয়। তন্ত্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক কোথায়? এখানেই আসে তন্ত্রসাধনার মূল দর্শন। তন্ত্রশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্রমতে দেহের মধ্যে মূলাধার পদ্মে অর্থাৎ অধোমুখে, তিনটি বেষ্টনীর আকারে কুণ্ডলী পাকিয়ে অবস্থান করে তিনটি নাড়ি। তাদের নাম যথাক্রমে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। মানুষের মেরুদণ্ডের বামপাশে থাকে ইড়া, তারপর থাকে সুষুম্না নাড়ি এবং সবশেষে পিঙ্গলা। সাধনার দ্বারা এই তিনটি নাড়িকে সচল করলে জাগ্রত হয় কুলকুণ্ডলিনী শক্তি। এই শক্তিই হল জীবগণের পরমাশক্তি। তন্ত্রসাধনা হল এই কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত করার সাধনা। আর পঞ্চ ম-কার হল এই সাধনার আচার। মৈথুন সেই আচারের অন্যতম অঙ্গ। অন্যতম বটে, তবে সর্বাপেক্ষা কঠিনতম। পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের ধর্মীয় আচারে এর উল্লেখমাত্র পাওয়া যায় না। এবারে বলি সেই মৈথুনের কথা। তারপর বলব কেন বামাচারী সাধনার চারটি আচার পালন না করা সত্ত্বেও গান্ধীর ব্যাপারে তান্ত্রিক সাধনার অভিযোগ উঠেছে।

তন্ত্রে মৈথুন হল বিন্দুসাধন। সহজবোধ্য ভাষায় বললে বিন্দুধারণ। বিন্দু অর্থ শুক্র। প্রাণীর জীবনীশক্তি। ব্রহ্মচর্য সাধনার বড় লক্ষ যে শুক্র ধারণ করা, সেই একই লক্ষ তন্ত্রসাধনার বিন্দুধারণেও। তবে ধরণটা আলাদা। ব্রহ্মচর্য সম্পর্কিত ভারতের চিরায়ত ধারণায় মহিলা-সংশ্রব থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে, কিন্তু গান্ধীর ব্রহ্মচর্যে মহিলা সংশ্রবকে ব্রহ্মচর্যসাধনার অঙ্গ করে নেওয়া হয়েছে। তন্ত্রোক্ত বিন্দুসাধনেও (যা ব্রহ্মচর্যের নামান্তর) মহিলার উপস্থিতি আবশ্যিক। এই কারণেই প্রশ্ন উঠেছে — এবং তা খুব সঙ্গত কারণে যে, গান্ধী কি তাহলে তান্ত্রিক ছিলেন?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে তন্ত্রের মৈথুন ক্রিয়া সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ আলোকপাত করা দরকার। ইতিপূর্বে আমরা বলেছি, তন্ত্রসাধনার মূল লক্ষ হচ্ছে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করা, অর্থাৎ শক্তির উত্থান ঘটানো। এই উত্থান ঘটাতে গেলে জাগতিক কামনা-বাসনা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে। সাধক তাঁর শরীর থেকে সমস্ত রকমের কামনা দূরীভূত করবেন। মানুষের ছয় রিপুর মধ্যে প্রবলতম হল কাম। কামকে দমন করা তাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তান্ত্রিক সাধনতত্ত্বে কাম দমন করার পদ্ধতি হল একাসনে থাকবেন সাধক ও তাঁর ভৈরবী অর্থাৎ সাধনসঙ্গিনী। তান্ত্রিকের কোলের ওপর বসবেন ভৈরবী। মৈথুনরত অবস্থায়। মৈথুনরত অবস্থায় থাকবেন, কিন্তু শরীর থাকবে পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল। কামনার দুর্গে প্রবেশ করে কামনাকে জয় করার সংগ্রাম চলতে থাকবে। রেতঃপাত বা বিন্দুপতন হবে না। সাধনার এই ক্রমবিকাশের পথ ধরে আসবে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ।

এবার গান্ধীর কথায় আসা যাক। তাঁর ব্রহ্মচর্য সাধনার পথে তন্ত্রসাধকদের মতই নারী পরিত্যাজ্য নয়। এমন কি যারা তাঁর সঙ্গিনী হয়েছে, তারা বস্ত্রের আবরণ ছেড়ে যে তাঁর শয্যায় যেতেন, তা-ও জানা গেছে। পরের অংশ অর্থাৎ মৈথুনে লিপ্ত হতেন কিনা গান্ধী, সে ব্যাপারে নিজে যেমন তিনি কিছু বলেননি, তাঁর সেই ভৈরবীদের কেউই এব্যাপারে কোনও কথা বলেননি। এমত অবস্থায় তাঁরা মৈথুনে লিপ্ত হয়েছিলেন কিনা সেই বিচারের রায় ক্রিকেটের নিয়ম অনুযায়ী ব্যাটস্‌ম্যানের ফেভারে দেওয়া উচিত — এই আপ্তবাক্যটিকে সামনে রেখে ব্যাটধারী গান্ধীকে সন্দেহের আওতা থেকে বাদ দেওয়াটা বাঞ্ছনীয়। তবে এটুকু নির্দ্বিধায় বলা যায়, সত্তরোর্দ্ধ এক বৃদ্ধ এক চাদরের নীচে নিরাবরণা একাধিক নারীকে নিয়ে থাকার পরও যদি চিত্তবৈকল্য না ঘটে (অবশ্যই কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া যখন মৈথুন ব্যাতিরেকে তাঁর শুক্রপাত হয়ে গেছে), তবে একজন তান্ত্রিকের পক্ষে কম প্রাপ্তি নয় সেটা।

স্বাভাবিক ভাবেই এতক্ষণ পরে এই প্রশ্নটা উঠতে পারে, গান্ধীর আজব ব্রহ্মচর্য কি তাহলে আসলে তান্ত্রিক সাধনা? নাকি সেটা হল ব্রহ্মচর্য প্লাস তান্ত্রিক সাধনা — এই দুইয়ের মিলনে এক নতুন ধরণের কক্‌টেল? যে কক্‌টেল পরবর্তী কালে স্বামী রজনীশ, ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারীদের মধ্যে কিংবা আরও সাম্প্রতিক সময়ে নিত্যানন্দ স্বামী, আশারাম বাপুদের মধ্যে দেখি?

এই ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন গান্ধীর ঘনিষ্ঠ রায়হানা তায়াবজি। যাঁর অতীত অভিজ্ঞতা ছিল তন্ত্রসাধনার। তবে তা বামাচারী নয়, দক্ষিণাচারী

তন্ত্রসাধনা। সেখানে পঞ্চ 'ম'-এর কোনও ভূমিকা ছিল না। গান্ধীর ব্রহ্মচর্যকে তায়াবজি সবসময় বলতেন তন্ত্রসাধনা। তিনি বলতেন, গান্ধী বামাচারী ও দক্ষিণাচারী তান্ত্রিকের মিশ্রণ।

একটা প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে ওঠে, এত সাধনার ফল কি আদৌ প্রাপ্ত হয়েছিলেন গান্ধী? শক্তির জাগরণ আদৌ কি ঘটেছিল তাঁর মধ্যে? যদি ঘটে থাকে, তবে সেই শক্তিবলে কিছু কি করতে পেরেছিলেন তিনি? কী করতে বা চেয়েছিলেন তিনি?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে যেসব তথ্যের মুখোমুখি হয়েছি, তাতে শেষ জীবনে গান্ধীর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল কিনা, এই সন্দেহ দৃঢ় হয়েছে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি কাম জয় করতে পারেন নি। সুশীলা নায়ারের সঙ্গে ঘটে যাওয়া 'কালো রাত্রির' ঘটনাটা ঘটেছিল নোয়াখালিতে। ১৯৪৬ সালে। তখন তাঁর বয়স প্রায় সাতাত্তর বছর। তাহলে কেন তিনি পাগলের মত ছুটেছিলেন ব্রহ্মচর্য নামক এই তন্ত্রসাধনার পিছনে? তার কারণ, একের পর এক পরাজয়ের মুখোমুখি হতে হতে গান্ধী তখন স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলেন। বিয়াল্লিশে শুরু করা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন চূড়ান্ত ফ্লপ, এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীর নির্দেশে প্রাদেশিক আইনসভাগুলি থেকে কংগ্রেসি সদস্যরা পদত্যাগ করায় প্রশাসনে জাঁকিয়ে বসার সুযোগ পেয়েছিল মুসলিম লীগ। ব্রিটিশের কৃষকবিরোধী নীতি ও মুসলিম লীগের নেতাদের দুর্নীতিতে দেশজুড়ে চরম দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে, ব্রিটিশের কাছে গান্ধীর গুরুত্ব তলানিতে এসে ঠেকেছে। এমন দুঃসময়ের মধ্যে দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি রীতিমত ভয়ানক হয়ে উঠেছে। যত কঠিন হয়ে আসছে পরিস্থিতি, গান্ধী ততই তাঁর তথাকথিত ব্রহ্মচর্য কিংবা তন্ত্রসাধনার দিকে আরও গভীরভাবে ঝুঁকে পড়েছেন। তাঁর মনে এই বিশ্বাস জন্মেছিল — কুলকুণ্ডলিনী শক্তির প্রভাবে মুসলিম লীগের নেতা মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌কে তিনি বশ করতে পারবেন। আর তাঁকে বশ করতে পারলে ভাগ হওয়ার হাত থেকে বাঁচবে দেশ এবং দেশও দ্রুত স্বাধীন হবে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে তিনি যেমন জাগাতে পারেননি, তেমন বশ করতে পারেননি জিন্নাহ্‌কে। ফলে দেশ যেমন ভাগ হয়েছে, তেমনি ইতিহাসের বীভৎসতম সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে চরম দুর্দশা নেমে এসেছে এদেশের মানুষের ওপর।

সপ্তম অধ্যায়

আধ্যাত্মিক গান্ধী : সন্ন্যাসী রাজা, নাকি রাজসন্ন্যাসী ?

সন্ত বনাম নেতা : গান্ধীকে অনেকেই রাজনীতির মানুষ বলেন না। বলেন, সন্ত বা সন্ন্যাসী। বলেন গান্ধীবাবা। এর পিছনে তাঁর সযত্নলালিত সাধারণ পোশাক, সহজ সরল গরীবানা মতের জীবনযাত্রার একটা মস্ত ভূমিকা আছে। কিন্তু এমন উপাধি প্রদানের সেটাই একমাত্র কারণ নয়। তাঁরা বলেন, গান্ধীর মানস-গঠনই ছিল নাকি সন্ন্যাসীর। পোশাক-আশাক তো বহিরঙ্গের, তার আর কতটুকু ভূমিকা ? উদাহরণ হিসেবে তাঁরা টেনে আনেন প্রাণজীবন মেহতাকে। অনেকে মনে করেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাকি গান্ধীকে 'মহাত্মা' উপাধি দিয়েছিলেন ও তাঁকে এই নামে প্রথম সম্বোধন করেছিলেন। কিন্তু এই ধারণাটি ভুল। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের নামে এই খবরটি প্রচারের পশ্চাতে গান্ধী ভক্তদের আর একটা গেমপ্ল্যান ছিল। সেটা এই যে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যখন এই মানুষটিকে 'মহাত্মা' বলছেন, তখন তিনি সত্যিই মহাত্মা না হয়ে যান না। এইরকম আরও একটা বড় ভুল প্রচারিত রয়েছে গান্ধীর 'জাতির জনক' উপাধি নিয়ে। এই উপাধিটি আবার গান্ধীর চিরশত্রু নেতাজির দেওয়া বলে বাজারে প্রচারিত। বলা বাহুল্য, সত্যিটা তা নয়। দেশভাগের ব্যবস্থা সম্পন্ন করে যখন কলকাতায় বসে অনশনের সার্কাস করছেন, তখন নেহরু-প্যাটেলের চিঠি নিয়ে দূত এল তাঁকে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য, স্বাধীনতা প্রাপ্তির সমারোহে অংশগ্রহণের জন্য। সেই চিঠিতে গান্ধীকে 'জাতির জনক' বলে উল্লেখ করেছিলেন তাঁরা। ব্যস, তারপর থেকে তিনি হয়ে গেলেন জনক। ভাগ্যি ভাল, 'জননী' হিসেবে কাউকে এখনও পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা হয়নি। অনেকটা অবিশ্যি এগিয়েছিলেন ইন্দিরা, তবে সম্ভবত জনকের সঙ্গে জননীর সম্পর্ক নিয়ে একটা কূটকচাল তৈরি হওয়ার ভয়ে 'জননী' উপাধি দেওয়া নিয়ে এগোনোর কথা ভাবেনি কেউ। সম্প্রতি এক সংবাদে জানা গেছে যে উত্তরপ্রদেশের এক স্কুল-ছাত্র তথ্যের অধিকার আইনের বলে এবিষয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। তার দায়ের করা জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রধানমন্ত্রীর দফ্‌তর জানিয়ে দিয়েছে, গান্ধীকে জাতির জনক করা হয়নি। পিতৃহারা হওয়ার এই দুঃখ গান্ধীভক্তদের বড় ব্যথা দিয়ে থাকতে পারে বটে, তবে দেশের বিরাট সংখ্যক মানুষ অবৈধ পিতৃত্বের লজ্জা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস যে ফেলেছে, সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। এবার ফিরে আসি 'মহাত্মা' প্রসঙ্গে।

মহাত্মার উৎস : প্রাণজীবন মেহতা ছিলেন রেঙ্গুনের এক জুয়েলারি ব্যবসায়ী। তাঁর আদি বাড়ি ছিল গুজরাট। ব্যবসায়িক সূত্রে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা এই দুটি দেশেও তাঁর যাতায়াত ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ের জন্য গান্ধীকে তিনি মোটা রকম অর্থ সাহায্যও করতেন। এই অর্থ সাহায্যের পিছনে দক্ষিণ আফ্রিকার হীরের খনির দিকে যে শুধু তাঁর নজর ছিল, তা নয়। তাঁর গর্বও ছিল গান্ধীকে নিয়ে। একটা গুজরাটি ছেলে লড়াইয়ের সেনাপতি—গর্ব সেটা নিয়ে। গুজরাটিরা ব্যবসাটা ভাল বোঝে বলে সুনাম আছে। তাই গান্ধীকে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে নিয়ে এসে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতা করার প্রস্তাব দিয়ে মেহতা সাহেব একটা চিঠি লিখলেন তৎকালীন কংগ্রেসের প্রধান পুরুষ গোপাল কৃষ্ণ গোখলেকে। সেটা ১৯০৯ সাল। গান্ধী তখন ঊনচল্লিশ বছরের যুবক। তখনও তাঁর পরণে পুরোদস্তুর সাহেবি পোশাক। তখনও মহানতার তেমন কোনও নিদর্শন ফুটে ওঠেনি তাঁর মধ্যে। কিন্তু প্রাণজীবনের ছিল জহুরীর চোখ। তিনি সেই লক্ষণ দেখেছিলেন তাঁর মধ্যে। গোখলেকে লেখা চিঠিতে গান্ধীকে উল্লেখ করলেন 'মহাত্মা' নামে। গান্ধীর প্রশংসা করে লিখলেন যে, এই মানুষটির মধ্যে ব্যক্তিগত কঠোর তপশ্চর্যা (personal asceticism) এবং তীক্ষ্ণ এক সাংগঠনিক ক্ষমতা আছে যার বলে দক্ষিণ আফ্রিকাতে বিভিন্ন সফল সংগঠন তৈরি করতে পেরেছেন। সুতরাং তিনি যদি উপযুক্ত দায়িত্ব পান, তবে ভারতে এসেও অনেক কাজ করতে পারবেন।

এই চিঠির পর গান্ধী 'মহাত্মা' হলেন। এবং গোখলেও তাঁকে শিষ্যত্বে বরণ করে নিলেন। এখানে একটা অদ্ভুত লক্ষণীয় ব্যাপার আছে। প্রাণজীবন মেহতার এই চিঠি লেখার মাত্রই কিছুদিন আগে বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে গান্ধী সেখানকার ভারতীয়দের হাতে ভীষণভাবে প্রহৃত হয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর থাকার ব্যাপারে প্রশ্ন উঠতেও শুরু করেছে, তাই কি প্রাণজীবন মেহতাকে দিয়ে গান্ধী নিজেই লিখিয়েছিলেন গোখলেকে দেওয়া চিঠিখানি ? আর এই চিঠিতে নিজেই কি নিজেকে 'মহাত্মা' উপাধিটি দিয়েছিলেন ? সম্ভাবনাটা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে বটে, তবে অসম্ভব নয়। এবং ধরতে গেলে ১৯০৯ সালের পর থেকে প্রায় গায়ের জোরেই 'মহাত্মা' উপাধিটি দখল করে ফেললেন গান্ধী। অথচ সাধু-মহাত্মাদের দেশ ভারতে এই শব্দটি ছিল উন্মুক্ত। কারও একচেটিয়া অধিকারের অন্তর্গত নয়। কিন্তু প্রশ্ন উঠল যে, একজন রাজনীতিবিদকে কিভাবে মহাত্মা বলা যাবে ? ভারতের মানুষ যাঁদের মহাত্মা বলে জানেন, তাঁরা তো সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ! তাঁদের পরণে তো কেবল কটিবস্ত্র ; ধুরন্ধর গান্ধী বুঝলেন ব্যাপারটা।

অতএব এরপর থেকে শুরু হল তাঁর সাজ পরিবর্তন। অবশ্যই এক লাফে নয়, ধাপে ধাপে। উৎসাহী পাঠক তাঁর বিভিন্ন সময়ের ছবিগুলিকে দেখলে সহজেই বুঝতে পারবেন যে, রাজনৈতিক সুবিধার স্বার্থে তিনি কিভাবে পুরোদস্তুর সাহেব থেকে হাফসাহেব, হাফসাহেব থেকে দেশী গান্ধী, সেখান থেকে গরীব গান্ধী এবং সর্বশেষ তাঁর বিখ্যাত ট্রেডমার্ক কটিবস্ত্রধারী হাফ নেকেড ফকিরের (সৌজন্য : ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল) সাজ ধারণ করেছেন। এই ছবিগুলি দেখলে গান্ধীর বিবর্তনের ইতিহাসটি বুঝতে অসুবিধা হবে না।

যাই হোক, রাজনীতিবিদ কিভাবে মহাত্মা হবেন—এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে গান্ধীভক্তরা বললেন—তিনি একজন সন্ন্যাসী, রাজনীতিবিদ হতে চাইছেন (A saint trying to be a politician)। আর গান্ধী কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে বললেন—তিনি একজন রাজনীতিবিদ, সন্ন্যাসী হতে চাইছেন (A politician trying to be a saint)।

মূল্যবোধের রাজনীতি : দুটি উক্তির বিশ্লেষণ করতে গেলে যে প্রশ্নটি প্রথমেই মনে আসে, তা হল, সন্ন্যাসীর জীবন ও রাজনীতিবিদের জীবনের মধ্যে কি কোনও বিরোধ আছে ? একজন সন্ন্যাসী কি কখনও রাজনীতিবিদ হতে পারেন ? কিংবা কোনও রাজনীতিবিদ কি হতে পারেন সন্ন্যাসী ? আজকের এই একুশ শতকের ভারতের রাজনীতিতে এমনটা হওয়ার উদাহরণ পাওয়া যায় না যে, তা নয়। কিন্তু প্রশ্নটা তবু থেকেই যায়। কেননা, ধড়াচূড়া পরলেই তো আর যোগী হওয়া যায় না। যোগী হতে গেলে দরকার যোগীসুলভ গুণাবলীর। ইংরেজিতে যাকে বলে saintly values। আর রাজনীতিও হওয়া উচিত value based politics সুতরাং value শব্দটি দু জায়গাতেই আছে। আসলে দু জায়গা কেন বলি, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই values থাকাটা জরুরি। কিন্তু সন্ন্যাস আর রাজনীতি এই দুয়ের মধ্যে যে মৌলিক বিরোধ আছে, সেটা কম নয়। সন্ন্যাস যেখানে সর্ববন্ধনমুক্ত, ঈশ্বরে নিবেদিত জীবন, রাজনীতি সেখানে শুধুই বন্ধন। নিজের ক্ষমতার বন্ধন, দলের ক্ষমতার বন্ধন, নিজের স্বার্থ দলের স্বার্থ। দেশের স্বার্থও কী আছে ? কে জানে ! আর এই স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে চলে আসে মিথ্যা, কুশ্রিতা, অসততা, বিশ্বাসঘাতকতা। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, গান্ধী কি সন্ন্যাসীর মূল্যবোধ বা ভ্যালুজের সঙ্গে রাজনীতির মেলবন্ধন ঘটাতে পেরেছিলেন ?

গান্ধী নিজে একবার খুব চমৎকার ভাষায় 'ভ্যালুজ' বলতে কী বোঝায়, তা বলেছেন এভাবে—

"Keep your thoughts positive because your thoughts become your words. Keep your words positive because your words become your behaviours. Keep your behaviours positive because your behaviours become your habits. Keep your habits positive because your habits become your values. Keep your values positive because your values become your destiny."

অর্থাৎ, তোমার চিন্তাকে সদর্থক রাখো কারণ তা তোমাকে ভাষা দেবে ; তোমার ভাষাকে সদর্থক রাখো কারণ তা তোমাকে সঠিক আচরণ দেবে ; তোমার আচরণকে সদর্থক রাখো কারণ তা তোমাকে সঠিক অভ্যাস দেবে ; তোমার অভ্যাসকে সদর্থক রাখো কারণ তা তোমাকে মূল্যবোধ দেবে ; তোমার মূল্যবোধকে সদর্থক রাখো কারণ মূল্যবোধ তোমার নিয়তি হবে।

গান্ধীর নিজের দাবি অনুযায়ী, সারাজীবন মূল্যবোধকে পরম শ্রেয় বলে তিনি মনে করেছেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা দেখেছি, মূল্যবোধের চেহারা সবসময় এক থাকেনি তাঁর কাছে। দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষদের প্রতি ঘৃণা, সম্প্রীতির নামে প্রকাশ্যে ধর্মীয় তোষণ, গণতন্ত্রের তোয়াক্কা না করে স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ব্রহ্মচর্য পরীক্ষার নামে আজব যৌনাচার (যা তিনি মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত চালিয়ে গিয়েছেন), ইংরেজের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে সন্ধিস্থাপন—ইত্যাদি বহুবিষয়ে তাঁর মূল্যবোধ বিপুল প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে। গান্ধী নিজে যে সেই প্রশ্নের আঁচ সম্পর্কে একেবারে অবহিত ছিলেন না তা নয়। সেই কারণে আগে থেকেই সাফাই তৈরি রেখেছেন এই ব্যাপারে—"It is the action, not fruit of the action, that is important you have to do the right thing..............if you do nothing, there will be no result."

সঠিক কাজটি করে যেতে হবে 'বলেছেন বটে, কিন্তু নিজে সঠিক কাজ করেন নি বহুসময়। তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম, ঠিক ব্যাপারটা ধরতে পারেন নি, তাই ভুল করেছেন। কিন্তু একই রকমের ভুল কতবার করে একজন মানুষ ? যদি কেউ বারবার ভুল করেন তবে তিনি কিভাবে দূরদর্শী, ভূয়োদর্শী, প্রজ্ঞাসম্পন্ন মানুষ হতে পারেন ? আরও একটা কথা। তিনি বলেছেন, চিন্তাকে সৎ রাখলে ভাষাও সেই মত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব এই কথাটিকেই অন্যভাবে বলেছেন—তোরা মনে আর মুখে এক হ। অর্থাৎ চিন্তায় ও কাজে যেন ফারাক না থাকে। গান্ধী বারবার বলেছেন এক, করেছেন আর এক। এই আচরণ মূল্যবোধের রাজনীতির তথাকথিত গুরু রাজনীতিবিদ থেকে সন্ত হতে প্রত্যাশী একজন মানুষের কাছে আশা করা যায় না।

গান্ধীর রাজনৈতির সত্তা নিয়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে অনেকে কথা বলা হয়েছে, তবু সেই প্রসঙ্গ আরও একবার এখানে টানতে হল এই জন্য যে, নিজেকে সন্ন্যাসী রাজনীতিবিদ হিসেবে দাবি করেছেন তিনি। এবার আমরা গান্ধীর সন্ন্যাসী-সত্তা বা আধ্যাত্মিকতা নিয়ে আলোচনা করব।

গান্ধীর আধ্যাত্মিকতা : আধ্যাত্মিক শব্দটির অভিধানগত অর্থ হল—আত্মাসম্বন্ধীয় বা ব্রহ্মবিষয়ক বা ঈশ্বরবিষয়ক। আবার আত্ম অর্থাৎ নিজেকে জানাই হচ্ছে ঈশ্বরকে জানা। সেই অর্থে অধ্যাত্মবিষয়ক জ্ঞান হল আত্মবিষয়ক জ্ঞানও। নিজের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক, নিজের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করার তত্ত্বকে বলা হয় অধ্যাত্মতত্ত্ব। শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল spiritual।

গান্ধীর আধ্যাত্মিকতা নিয়ে আলোচনা করার আগে সাধারণভাবে আধ্যাত্মিকতা বলতে কী বোঝায়, সেই সম্পর্কে দু চার কথা বলা উচিত। নইলে গান্ধীর আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে ঠিকমত আলোচনা করা যাবে না। আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ বিভিন্নভাবে হয়, তার সংজ্ঞাও তাই বহু। তবে যেটি সবচেয়ে বেশি প্রচলিত, তা সৃষ্টিতত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। পৃথিবীর সমস্ত ঈশ্বরবাদী ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী এক মহাশক্তি এই মহাবিশ্বকে পরিচালিত করছেন। তাঁরই পরিচালনায় সৃষ্টির প্রতিটি জীব এমন কি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধূলিকণাও একে অপরের সঙ্গে গভীর এক বন্ধনে আবদ্ধ। এই বন্ধনের বাইরে যাওয়ার শক্তি কারও নেই। সবকিছুই নিয়মাবদ্ধ। আমাদের জন্ম, আমাদের মৃত্যু সবকিছু এক অপ্রতিরোধ্য নিয়মের মধ্যে চলছে। সৃষ্টির এই তত্ত্বকে জানা, স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির সম্পর্ককে জানা, কেন এই জীবন তা জানা, কিভাবে জীবনে উৎকর্ষতা আসবে, কিভাবে শান্তি আসবে জীবনে, কোন্‌পথে অন্যের জীবনে শান্তি আনা যাবে—আধ্যাত্মিকতা এইসব বিষয়গুলি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করে। এককথায় স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির যোগসূত্র স্থাপন করার নাম হল আধ্যাত্মিকতা।

যদিও, সাধারণভাবে আধ্যাত্মিকতাকে ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেখা হয়, তথাপি ধর্মীয় ভাবনার ঊর্ধ্বে উঠে ব্যক্তিগত স্তরেও আধ্যাত্মিকতার চর্চা করা যায়। স্বার্থশূন্যতা, মানুষের প্রতি মমত্ববোধ ও ভালবাসা, পরার্থে জীবনকে উৎসর্গ করা ও এইসব সৎ কাজের মধ্য দিয়ে অন্তরে পরম শান্তি অনুভব করাটাও আধ্যাত্মিকতা। বৌদ্ধধর্ম ঈশ্বরবাদী ধর্ম নয়। বুদ্ধদেব কোনও অবতার নন (যদিও হিন্দুরা তাঁকে বিষ্ণুর নবম অবতার বলে ঘোষণা করেছে), কিংবা যীশুখ্রিষ্ট বা হজরত মুহাম্মদের মত ঈশ্বরের পুত্র বা পয়গম্বরও তিনি নন, তাঁর জীবনে অলৌকিক ঘটনাবলীও নেই। অলৌকিক ও ঐশ্বরিক ক্ষমতার বলে কারও

রোগমুক্তি তিনি ঘটান নি বা মৃতব্যক্তির শরীরে প্রাণসঞ্চারও করতে পারেন নি। তবু শোকার্ত, মানুষকে তিনি সান্ত্বনা দিয়েছেন, তার শোককে ভুলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর জীবনের সেই বিখ্যাত কাহিনিটাকে এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি আমরা। একদিন এক নারী তার মৃতপুত্রকে নিয়ে এসেছেন বুদ্ধদেবের কাছে। বড় আশা, ভগবান বুদ্ধ তার সন্তানকে বাঁচিয়ে দেবেন। বুদ্ধদেব জ্ঞানের কথা, জীবনের অনিত্যতার কথা এসব কিছু বললেন না। তিনি সেই নারীকে শুধু বললেন, নগরীর মধ্যে যে গৃহে কখনও কোনও শোক স্পর্শ করেনি, সেই গৃহ থেকে এক মুঠো শস্য ভিক্ষা করে আনতে। সেটা আনতে পারলেই তিনি তার সন্তানকে বাঁচিয়ে তুলবেন। তারপর সেই নারী নগরীর প্রতিটি গৃহে গেল। কিন্তু শোকহীন একটি গৃহও খুঁজে পেল না। বিফলমনোরথ হয়ে সে ফিরে এল বটে, তবে এক মহাসত্য সে ততক্ষণে উপলব্ধি করেছে। তা হল, জীবন থাকলে দুঃখ থাকবে। জীবন থাকলে ব্যাধি থাকবে, জীবন থাকলে মৃত্যু থাকবে। এই সব কিছু স্বীকার করেই পরম শান্তি খুঁজে নিতে হবে। এই শান্তির পথটি তাকে দেখালেন বুদ্ধ। নিজে শান্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপরকে শান্তি দিতে পারাটাই আধ্যাত্মিকতা।

আজকের এই পৃথিবীতে, বিজ্ঞান যখন অপরিমেয় উন্নতি করেছে, সুখের সব চাবিকাঠি তার করায়ত্ত হয়েছে বলে মানুষ যখন নিজেকে সর্বশক্তিমান বলে ভাবতে শুরু করেছে, তখন দেখা গেল আর এক বিশাল অ-সুখ এসে তাকে দখল করে ফেলছে। সেই অসুখের মূলে নিত্যনূতন ব্যাধি যেমন ক্যান্সার, এইড্স্ ইত্যাদি তো আছেই, কিন্তু সবার চেয়ে বড় হল প্রাচুর্যের ব্যাধি, একাকিত্বের ব্যাধি, সৎচিন্তায় নিজেকে সমর্পণ না করতে পারার ব্যাধি। তাই প্রথম বিশ্বের ধনী দেশগুলির মানুষের কাছে অধ্যাত্মবাদ এক নতুন চেহারায় হাজির হয়েছে আজ। এই অধ্যাত্মবাদের মধ্যে আছে বিশ্বাস (Faith), আশা (Hope), ক্ষমাশীলতা (Forgiveness), ভালবাসা এবং সামাজিক সেবা (Love and Social Service), প্রার্থনা (Prayer), ধ্যান (Metitation) ইত্যাদি।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, আধ্যাত্মিকতা শুধু ঈশ্বরচেতনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, জীবনের যা কিছুর মধ্যে মঙ্গলময় চিন্তা ও চেতনার প্রকাশ আছে, তাই হল আধ্যাত্মিক। এই দৃষ্টিতে আমরা দেখব, গান্ধীর আধ্যাত্মিকতার মধ্যে কোন বিষয়গুলি আছে এবং সেই বিষয়গুলি কতটা সততার সঙ্গে তিনি পালন করেছেন।

তাঁর আধ্যাত্মিকতার সবচেয়ে বড় অঙ্গ হিসেবে তিনি দেখেছেন ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসকে। এই সম্পর্কে তিনি বলেছেন—'To have faith in God should be the easiest thing in the world, yet it appears to be the most

difficult.' এই উক্তির স্বাভাবিক ব্যাখ্যা করলে এটা বোঝায়, ঈশ্বরের চিরাচরিত ধারণা অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা হিসেবে যে ঈশ্বরের কল্পনা করি আমরা, সেই ঈশ্বরের কথাই বলেছেন তিনি। অন্যত্র বহু জায়গায়ও তিনি বলেছেন—ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। তিনি এই চরাচর সৃষ্টি করেছেন, এর নিয়ন্ত্রণও তাঁর হাতে। এই ধারণা ঈশ্বর সম্পর্কিত চিরাচরিত ধারণা থেকে পৃথক নয়। তবে ঈশ্বর সম্পর্কে গান্ধীর এই ধারণার পরিবর্তন আসে পরবর্তী কালে। ১৯৩১ সালের ৮ই ডিসেম্বর তারিখে এক বক্তৃতায় তিনি বলছেন—'I would say with those who say God is love. But deep down in me I used to say that though God may be love, God is truth above all.......But two years ago, I went a step further and said that truth is God. ....I found that the nearest approach to truth was through love. But I also found that love has many meanings in the English language at least and that human love in the sense of passion could become a degrading thing also. I found too that love in the sense of ahimsa had only a limited number of votaries in the world. But I never found a double meaning in connection with truth and not even atheist had demurred to the necessity or power of truth.' যে কথাটি তিনি বললেন, তা কিন্তু ঈশ্বরের চিরায়ত ধারণা থেকে বেশ আলাদা। প্রথমে তিনি বললেন—প্রেমই ঈশ্বর। কথাটি বাইবেল থেকে উদ্ধৃত। আবার আমাদের বৈষ্ণব ধর্মেও ঈশ্বর সাধনার অন্যতম পথ হিসেবে বাৎসল্য, সখ্য ও দাস্য এই তিন রসের সঙ্গে প্রণয় বা প্রেমরসকেও উল্লেখ করা হয়েছে। ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে যশোদার সম্পর্কে বাৎসল্য, সুদামা ইত্যাদিদের সঙ্গে সম্পর্কে সখ্য, মীরাবাঈ-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে দাস্যভাব, শ্রীরাধা ও গোপিনীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রণয়ভাব। কিন্তু এই রসগুলির কোনওটাই ঈশ্বর নয়, তারা কেবল ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর পথ। কিন্তু গান্ধী পথকেই বললেন ঈশ্বর। এখানে বাইবেলের ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে তাঁর ধারণার মিল। কিন্তু তার পর যে কথাটি বললেন, তা প্রেমের ধারণাটিকে ছোট করে দিল। বললেন, ইংরেজি ভাষায় প্রেমের বহু অর্থ আছে, তার মধ্যে মনুষ্যপ্রেমের এমন কিছু প্রকাশ আছে যা প্রেমের ধারণাটিকে নোংরা করে দেয়। অতএব প্রেম নয়, ঈশ্বর বলতে বোঝায় 'সত্য'-কে। তারপর তিনি বললেন 'সত্য হল ঈশ্বর।' ঈশ্বর সম্পর্কে গান্ধীর এই মন্তব্যগুলি পড়তে পড়তে মনে পড়ল কৃষ্ণ রাধার কিংবা কৃষ্ণ গোপিনীদের আখ্যান নিয়ে চ্যাংড়া ছেলে-ছোকরাদের বলা বহু খ্যাত একটা কথা—'ভগবানের বেলায় লীলাখেলা আর মানুষের বেলায় ছলাকলা'।

Human love-এর কুশ্রিতার দিকে ঈঙ্গিত করে তিনি বললেন 'degrading thing' অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের যথার্থ চেহারাটাই তিনি বুঝলেন না। এখানেই শেষ নয়। প্রেমকে অহিংসার সঙ্গে সম্পর্কিত করে আবার বললেন—অহিংসার অর্থে যদি ব্যবহৃত হয় প্রেম শব্দটি, তবে খুব সামান্য সংখ্যক মানুষই তা মানবে। অর্থাৎ প্রেম বলতে অহিংসাও বোঝায় না। সুতরাং প্রেম নয়, সত্য বা Truth-ই হল সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। Truth এমন একটি শব্দ যা Love-এর মত দুরকম অর্থে (খারাপ প্রেম ও ভাল প্রেম ?) ব্যবহৃত হয় না। অতএব ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে, সত্য (এবং অহিংসা)-ই হল ঈশ্বর।

হিন্দু শাস্ত্রে বলা হয়েছে, যা সত্য তাই শিব তাই সুন্দর। এখানে শিব মানে শিব ঠাকুর নন, এখানে শিব অর্থে শুভদায়ক। 'সত্যম শিবম সুন্দরম' কথাটির অর্থ যা সুন্দর তাই শুভদায়ক তাই সুন্দর। কবি কীটস্ তাঁর 'ওড্ টু এ নাইটিঙ্গেল' কবিতায় তাঁর মত করে বলেছেন—Truth is beauty, beauty is truth. আবার beauty সম্বন্ধে বলেছেন—A thing of beauty is a joy forever. আনন্দ বা joy-কে যদি কেউ ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনা করেন, আপত্তির কিছু থাকতে পারে না। যদি কেউ অহিংসার সঙ্গে মিলিয়ে দ্যাখেন ঈশ্বরকে তাও নাহয় মানা গেল। কিন্তু এগুলো তো ঈশ্বর প্রাপ্তির সাধনপথ মাত্র। এরা ঈশ্বর হবে কেমন করে ? ঈশ্বর হচ্ছেন তো সেই সৎ-চিৎ-আনন্দ। তাঁকে পাওয়ার জন্য সর্বোত্তম পথ হল প্রেম, প্রেমের পথেই থাকে ত্যাগ-তিতিক্ষা-সত্যের প্রতি সমর্পণ। গান্ধী কিন্তু পুরো ব্যাপারটা গুলিয়ে দিলেন। প্রেমে double meaning আছে বলে তাকে বর্জন করলেন। এর দ্বারা ঈশ্বর সম্পর্কিত ভাবনাতেই নানান প্রশ্ন তুলে দিলেন তিনি। প্রশ্ন তুলে দিলেন প্রেম সম্পর্কিত ধারনাতেও। সম্পূর্ণ ভ্রান্ত পথে।

যাই হোক, সত্যকে তো দেবতা বলে মেনে নিলেন তিনি, আমরাও তা মেনে নিলাম আলোচনার জন্য, কিন্তু সত্যের পথে বা তাঁর ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে কতটা সৎ ছিলেন তিনি ? ইতিপূর্বে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, নিজের অবস্থান বারবার পাল্টেছেন তিনি। যে বিশ্বাসের কথা বড় মুখ করে বলেছেন, কাজের বেলায় করেছেন তার উল্টো। যেটা করতে চাইতেন, তা কখনও পরিষ্কার করে বলতেন না, একটা ধোঁয়াশা রেখে দিতেন যাতে সহজেই পথ পরিবর্তন করা যায়। অন্যে কে কতটা গান্ধীর এই মানসিকতাকে ধরতে পেরেছিল, তা বলা সহজ নয়। ধরতে পারলেও তাঁরা তা প্রকাশ করেন নি। কিন্তু ধুরন্ধর ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন খুব ভালভাবেই তা ধরতে পেরেছিলেন এবং তা প্রকাশও করেছিলেন—"It is

Gandhi's habit to make propositions, leaving many of their implications unsaid, and this method of negotiation has put him and the congress in difficult positions in the past. For example, there is no reference here to the Muslim league participation in the Constituent Assembly. If Jinnah were to accept his proposal, Gandhi probably takes it for granted that the Muslim league would enter the Constituent Assembly. It seems to me clear therefore that the present proposals do not expose his full mind." (প্রসঙ্গ : Gandhi offer of PM-ship to Jinnah in 1947 ; দ্রষ্টব্য : Mountbatten Papers, official correspondence, Note by Mr.V. P. Menon (75 page 122); Files : Plans, Alternative (for transfer of Power), Part 1)

দেখা গেল, সত্যকে যিনি ঈশ্বর হিসেবে মেনে নেওয়ার কথা বারবার বলেছেন, তিনি সত্যকে এড়িয়ে চলার ব্যাপারে কখনোই আবার পিছিয়ে আসেন নি। সুতরাং অন্তত সত্যধর্ম রক্ষার ব্যাপারে আধ্যাত্মিক সত্তার চেয়ে রাজনৈতিক সত্তা বড় ছিল তাঁর কাছে।

১৯৩১ সালের আগে থেকে 'Truth is God' বললেও ঈশ্বর সম্পর্কিত চিরায়ত ধারণা তাঁর মন থেকে একেবারে বিদায় নেয়নি। এইজন্যই তিনি 'রাম' নামের শক্তিতে ঘোর বিশ্বাসী ছিলেন। নিয়মিত প্রার্থনা করা, প্রার্থনা সভায় বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করাকে অবশ্যকর্তব্য বলে বিবেচনা করে গেছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। প্রশ্ন হল, যিনি সত্য এবং অহিংসাকে ঈশ্বর হিসেবে মেনে নিয়েছেন, তিনি এইভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে অংশ কেন নেবেন ? তিনি তো তাঁর ধর্ম নিয়ে, তাঁর ঈশ্বর নিয়েই ব্যস্ত থাকবেন। আসলে নবলব্ধ ঈশ্বর সম্পর্কিত চেতনার সঙ্গে ঈশ্বর সম্পর্কিত চিরায়ত ধারণা এই দুটি দিকের মধ্যে পেণ্ডুলামের কাঁটার মত অবিচ্ছিন্নভাবে দুলে গেছেন তিনি এবং যখন যেটাতে সুবিধা হয় তখন সেটাকেই আশ্রয় করেছেন। এটাকেও তাঁর রাজনৈতিক সত্তার জয় এবং আধ্যাত্মিক সত্তার পরাজয় হিসেবে ধরাটাই ভাল।

অহিংসাকে গান্ধীর আধ্যাত্মিক চেতনার সবচেয়ে বড় দিক বলে ধরা হয়। ভারতে অহিংসার ধারণা অতি প্রাচীন। সুতরাং এদেশের মানুষ এই কথাটি গান্ধীর মুখ থেকে প্রথম শুনল না। পৃথিবীর অন্য দেশের মানুষের কাছে, বিশেষ করে ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষের কাছে কথাটা খুব একটা শ্রুত না হওয়ার ফলে তারা মুগ্ধ হয়েছে, এবং গান্ধীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে বটে, তবে বাস্তবে গান্ধীর আগে সেদেশের টলস্টয়ের মত মানুষ অহিংসার শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে অনেক কিছু ততদিনে লিখেছেন। শুধু লেখা নয়, টলস্টয় তাঁর জীবন দিয়ে সেই

আদর্শকে অনুসরণও করেছেন। পক্ষান্তরে, গান্ধীর অহিংসা তাঁর নিজের ভাষাতেই যেন দায়ে পড়ে হিংসাকে ভোলা। স্বাধীনতা যুদ্ধে কেন অহিংসার পথকে শ্রেয় ভাবছেন তিনি, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন—ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করার মত অস্ত্র আমাদের কাছে নেই বলেই আমরা অহিংসার পথ বেছে নিয়েছি। অস্ত্র থাকলে আমরা এই পথ নিতাম না। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য ব্রিটিশের হয়ে সৈন্য সংগ্রহে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। ফ্রান্সে এবং মেসোপটেমিয়াতে নিজে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন। আবার এই গান্ধীই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যাতে না বাধে, তার জন্য হিটলার ও মুসোলিনিকে চিঠি লিখেছেন। মুসোলিনির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, আলোচনা করেছেন ও তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। সত্যদ্রষ্টা হয়ে অহিংসাকে যিনি ঈশ্বর হিসেবে দ্যাখেন, তাঁর এমন বারংবার অবস্থান বদল হবে কেন ? আবার ক্রমাগত এরকম বদল হতে হতে শেষমেশ তাঁর অহিংসা-মন্ত্র কোথায় গিয়ে দাঁড়াল ? দাঁড়াল রাজনৈতিক তুষ্টিকরণের অস্ত্র হিসেবে। এই বইয়ের বিভিন্ন অংশে, বিশেষ করে ধর্মীয় তুষ্টিকরণের রাজনীতির অংশে তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছি।

ধ্যানসমাধি : ধ্যানসমাধি বা Meditation ভারতের সাধু ঋষি যোগীদের কাছে একটি অবশ্য করণীয় ধর্মীয় আচার ছিল। ধ্যানরত বাল্মীকি মুনির সমস্ত শরীর বল্মীকের ঢিপির মধ্যে চলে গিয়েছিল এই কাহিনি এই কথাটা বলে যে, ধ্যানে বসলে বিশ্ব-চরাচরের অস্তিত্ব মুছে যায় ধ্যানীর মধ্যে। গান্ধী নাকি Meditation খুব পছন্দ করতেন। তাঁর এই পছন্দ অবশ্য ভারতীয় মুনিঋষিদের দ্বারা অনুপ্রেরিত নয়। তার নিজের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী লণ্ডনে থাকাকালীন তিনি Quaker নামক এক ধর্মীয় গোষ্ঠীর (সম্প্রদায় কথাটি সঙ্গত কারণে ব্যবহার করলাম না, কারণ, ধর্মমতে এঁরা প্রধানত খ্রিষ্টান) সভায় যেতেন। এই গোষ্ঠীভুক্ত মানুষরা প্রার্থনা করত নিঃশব্দে। যা তাঁদের দাবি অনুযায়ী meditation। গান্ধী নাকি তাঁদের গৃহীত পদ্ধতি অনুযায়ী ধ্যান করা পছন্দ করতেন। বর্তমান লেখকের সৌভাগ্য হয়েছিল কোয়েকারদের মেডিটেশনে দু-বার অংশ নেওয়ার। অবশ্য গান্ধীর সময়ে নয়, একেবারেই একালে। ২০১১ সালে। শহরতলী লণ্ডনের লেটনস্টোন নামে এক জায়গায় চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশে কোয়েকারদের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানটি ছিল। পথচলতি আমার নজরে এসেছিল প্রবেশপথের মুখে একটা ছোট্ট নোটিশ বোর্ড। তাতে লেখা ছিল নীরবতার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের আরাধনা করি। কোয়েকারদের নামটা আগে থেকেই জানা ছিল। ঢুকে পড়লাম তার কম্পাউণ্ডে। বড়সড় একটা প্রাঙ্গণ। সেটা পেরিয়ে একতলা বাড়ির বারান্দা।

পা রাখতে এক মধ্যবয়সী মহিলা (পরে জেনেছিলাম তিনি অফিস সেক্রেটারি) আপ্যায়ন করে বসালেন। তারপর পরিচয় করিয়ে দিলেন গীর্জার ফাদারের মত দেখতে (পাদ্রীর পোশাক কিন্তু নয়) অন্তত আশি-পঁচাশি বছর বয়স্ক এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে। আমি আমার ভারতীয় ও বাঙালি পরিচয়ের কথা বললাম। আরও বললাম যে, নোটিশ বোর্ডে লেখা 'নীরব প্রার্থনা'র কথা শুনে এখানে এসেছি। দিনটি ছিল রবিবার। সময় সকাল প্রায় দশটা। বৃদ্ধমানুষটি বললেন, তাঁদের প্রার্থনা এখনই শুরু হয়েছে, তিনি সেখানে যাবেন। এবং জানতে চাইলেন আমি সেখানে যাব কিনা।

তাঁর সঙ্গে সেই বাড়িরই পিছন দিকের একটি ঘরে গেলাম। বেশ বড়সড় ঘরটি। পঁচিশ থেকে নব্বই-পঁচানব্বই বিভিন্ন বয়সের জনা ত্রিশেক মানুষ (তবে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাই বেশি) চেয়ারে বসে আছেন। চেয়ারগুলি গোল করে রাখা। একটা পাশ খালি ছিল, আমরা দুজন সেখানে গিয়ে বসলাম। আমাদের সাড়া পেয়ে যাঁরা ধ্যান করছিলেন, তাদের অনেকেরই চোখ খুলে গেল। আমার দিকেই সবার দৃষ্টি। সে দৃষ্টি যে একবার দেখে বন্ধ হল, তা নয়। কয়েকজন তো সময় নিয়ে দেখতে থাকলেন। বাকিরা অবশ্য চোখ বোঁজালেন। মিনিট পনের-কুড়ি ধরে ধ্যান চলল। তারপর যাঁর সঙ্গে আমি এসেছিলাম ঘরে, তিনি ধ্যানপর্বের সমাপ্তি জানিয়ে দিয়ে দিলেন।

সবাই নড়েচড়ে বসতে আমায় তিনি বললেন—নিজের পরিচয় দিতে এবং সবার উদ্দেশে meditation নিয়ে দু চার কথা বলতে। সম্ভবত, মিনিট পাঁচেক বলেছিলাম। তার মধ্য আমাদের দেশের মুনিঋষিরা ধ্যান বলতে কী বোঝেন, কিভাবে ধ্যানের দ্বারা অন্ধকার আকাশে চাঁদের উদয় ঘটানো যায় সে সম্পর্কে আল্‌গা করে দু চার কথা ছিল। সবার রিঅ্যাক্‌শন দেখে বুঝলাম, আমার কথার কিছুই বোঝেননি তাঁরা এবং আমিও কিছুই বোঝাতে পারিনি তাঁদের। ততক্ষণে ক্যান্টিনে চা-কফি-হালকা জলযোগ তৈরি। আমাকে নিয়ে গেলেন সেই ক্যান্টিনে। এক অতিবৃদ্ধ ইংরেজ ভদ্রলোক নিজের হাতে কফির কাপ নিয়ে এসে আমার টেবিলে রাখলেন। ততক্ষণে আরও কয়েকজন আমার চারপাশে।

ক্রমে আলাপ জমে উঠল। অনেক বিষয়েই আলোচনা হয়েছিল। তাতে রাজনীতিও ছিল। তবে সেসব ছেড়ে কোয়েকারদের ধ্যানের কথা বলি। জিগ্যেস করেছিলাম—ধ্যানের সময় কী চিন্তা করেন তাঁরা। উত্তর পেয়েছিলাম—কিছুই না। মনটাকে চিন্তামুক্ত (thought tess) করে চুপচাপ বসে থাকি কেবল। কেননা, নীরবতাই হল ঈশ্বর।

আমি জানতে চেয়েছিলাম—চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়া কি এক সহজ?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারলেন না কেউ। সেই বৃদ্ধ কেবল একটু সময় চুপ করে থেকে বলেছিলেন—বলি বটে, তবে চিন্তা চলে যায় না। আমরা কেবল বসে থাকি।

পরের সপ্তায় আবার গিয়েছিলাম। আলাপচারিতার সময় বলেছিলাম, চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা না করে যদি চিন্তা একটু বেশি করে করা যায়, তাহলে ক্ষতি কী? মেডিটেশনের সময় আমরা চোখ বুঁজে ভাবব, আমাদের কপালটা এক অন্ধকার পৃথিবী—চারদিক গাঢ় কালো—তার মধ্যে খুব সামান্য একটা আলোর বিন্দু। খুবই স্নিগ্ধ আলো। যে আলো চাঁদে থাকে। সেই চাঁদ ক্রমশ বড় হচ্ছে। তারপর তার আলোয় আলোকিত হচ্ছে আমাদের কপালের ওপরের অন্ধকার পৃথিবীটা।

জানি না, এই পদ্ধতিতে ধ্যান করাটা চালু করেছিলেন কিনা তাঁরা। কেননা, সেই সপ্তাহেই দেশে ফিরে এসেছিলাম। এই ছিল কোয়েকারদের মেডিটেশন। গান্ধী সেই মেডিটেশনের ভক্ত ছিলেন। ব্যাপারটা ছিল নোটবই পড়ে পরীক্ষা পাশের মত। সত্যিকারের টেক্সট্-এর ধারে কাছে না যাওয়া। ব্যাপারটাকে আদৌ মেডিটেশন বলা যায় না। গান্ধীও যা করতেন, তা এইরকম। সকাল ও সন্ধ্যায় প্রার্থনা করতেন, তার মধ্যে একটুকরা ধ্যানের সেশান। সত্য অহিংসা ছাড়া যিনি অন্য ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না, তিনি কার ধ্যান করতেন? কিসের ধ্যান করতেন? আদৌ কি ধ্যান করতেন? ধ্যান কি এত সহজ?

শয়তান কে, সে কোথায় থাকে—এই প্রসঙ্গে গান্ধী বলেছেন—'The only devils in this world are those running around inside our own hearts, and that is where all our battles should be fought.' অর্থাৎ, শয়তান আমাদের নিজেদের অন্তরের মধ্যে থাকে এবং নিজেদের মধ্যেকার সেই শয়তানের বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হবে। এই বিশ্বাস থেকে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত গীতার নব ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কৌরব-পাণ্ডব লড়াইয়ের অন্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বলেছেন, কৌরবরা বাইরের কেউ নয়, তারা পাণ্ডবদের অন্তরের মধ্যে থাকা শয়তান। অন্তরের এই কুশ্রিতার বিরুদ্ধে লড়াই করাটাই হচ্ছে ধর্ম। বলা বাহুল্য, এই ব্যাখ্যার মধ্যে সত্যতা যে নেই, তা নয়। সৎ ও অসতের দ্বন্দ্ব প্রতিটি মানুষের মধ্যে থাকে। সেই দ্বন্দ্ব আমরা নিরন্তর অনুভবও করি। কিন্তু যেহেতু মতামতের ব্যাপারে মধ্যপন্থার ধার ধারতেন না গান্ধী, তাই তিনি বলে দিলেন অন্তরের মধ্যে ছাড়া শয়তান বা শত্রু আর কোথাও নেই এবং নিজের সঙ্গে নিজের

লড়াইটাই একমাত্র লড়াই। তাঁর এই মতকে অর্থাৎ only devils are inside our own hearts—এই মতকে মানলে দেশে আইন-আদালত, অপরাধিক দণ্ডবিধি ইত্যাদির কোনও প্রয়োজন থাকে না। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই মত শুধু মাত্র যে অবাস্তব তাই নয়, পৃথিবীর কোনও দেশের কোনও ধর্মমতই একথা কখনও বলতে পারেনি।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনার সারাৎসারে তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, গান্ধীর অধ্যাত্মচিন্তায় যত না আছে আধ্যাত্মিকতা, তার চেয়ে অনেক বেশি আছে আধ্যাত্মিকতার ভান, আধ্যাত্মিকতা নিয়ে অবাস্তব সব কথার ফানুস। তবু এই ফানুস উড়িয়ে দিয়ে তাঁর ভক্তরা সরব হয়েছেন গান্ধীকে সন্ত বানাবার জন্য। সরব হয়েছেন বটে, তবে সফল হতে পারেন নি।

অষ্টম অধ্যায়

ইতিহাসের গান্ধী : বামন, না বামনাবতার ?

ভগবান বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে পঞ্চম অবতারের নাম বামনাবতার। অত্যাচারী দৈত্যরাজের কাছে গিয়ে ছোট্ট এক ব্রাহ্মণ সন্তান তার দুটি পা রাখবার জন্য সামান্য একটু ভূমি প্রার্থনা করেছিল। দৈত্যরাজ চিনতে পারেননি মানুষরূপী ভগবানকে। অট্টহাস্য করে মঞ্জুর করেছিলেন বামনের প্রার্থনা। তখন সেই বামন ক্রমশই বিশাল থেকে বিশালতর হতে থাকল। তার পা-ও হতে থাকল বিশাল, তা রাখার জায়গা মিলল না সসাগরা এই পৃথিবীতে। দৈত্যরাজ বুঝতে পারলেন, এই বামন কোনও সাধারণ বামন নয়, তিনি তখন তাঁর মাথা এগিয়ে দিলেন। । বললেন, হে প্রভু, আমার মস্তকে রাখুন আপনার চরণ।'

গান্ধী সম্পর্কে এক ভক্ত আক্ষরিকভাবেই লিখেছিলেন যে, তিনি স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার। পৃথিবীকে তিনি দিয়েছেন অহিংসার মন্ত্র, অহিংসার পথে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মন্ত্র। তাঁর সেই আপাত-নিরীহ ও অতি-সাধারণ অহিংসা মন্ত্রের কাছে পর্যুদস্ত হয়েছে প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরেজ শাসক। শেষমেশ তারা তাদের পরাজয় স্বীকার করেছে ও তাদের আভিজাত্যের অভিমান বিসর্জন দিয়ে তাদের শাসনের রাজমুকুট রেখে দিয়েছে গান্ধীর পদতলে। পুরাণের সেই দৈত্যরাজের মত পরাজয় স্বীকার করে বলেছে — আমার মাথা নত করে দিনু হে প্রভু তোমার চরণধূলার তলে। সুতরাং গান্ধীকে দশের ওপর এক বাড়িয়ে একাদশ অবতার নাম না দিয়ে ভগবানের পঞ্চম অবতার বামনাবতারের নতুন একটি প্রকাশ হিসেবে দেখলে বেশি যুক্তিযুক্ত হবে মনে হয়।

এখন প্রশ্নটা উঠছে, গান্ধী কি সত্যিই যেমনটি বলা হল উপরে, তেমনটি? না কি তিনি বামনাবতার নন, নিতান্ত এক বামন? ইতিহাসের ব্যাখ্যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। রাজানুগ্রহে লিখিত ইতিহাসের ওপর থেকে মিথ্যার আবরণ খসে গেলে বেরিয়ে আসে কঠিন সত্য। পৃথিবীর সব দেশে এটা ঘটেছে, ভবিষ্যতেও ঘটবে। সোবিয়েত আমলের স্বপ্নের দেশ তথা সোনার দেশের আসল হালটি জানতে আমাদের কেটেছে বেশ কয়েকটি দশক। তারপর দেখেছি সোনার মত বটে, তবে সোনা নয়। মেকি সোনা। সময় লেগেছে বটে, তবে অনন্তকালের জন্য মিথ্যাকে বাঁচিয়ে রাখা যায়নি।

তেমন কিছু কি ঘটেছে গান্ধীর ব্যাপারেও? আর সেই নয়া ব্যাখ্যার আগমন কি শুরু হয়েছে? কী বলছে এখনকার ইতিহাস? কী বলছেন এখনকার মানুষ? এই বইয়ের পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে কিছুটা আঁচ দিয়েছি গান্ধী সম্পর্কে এখনকার ভাবনা-বিষয়ে। সেই ভাবনার প্রেক্ষিতগুলিকে সামনে রেখে আমরা বিচার করব গান্ধী সাধারণ নাকি অসাধারণ, মানব না অতিমানব, কিংবা যেভাবে নামকরণ করেছি এই অধ্যায়ের — সেই হিসাবে বলব, বামন নাকি বামনাবতার?

গান্ধীর আন্দোলনের ধরনকে ব্রিটিশ যে খুব ভয় পেত, তা নয়। বরং শাসন চালাতে সুবিধা হবে ভেবে বিভিন্ন সময়ে গান্ধীর আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুরকমভাবেই সাহায্য করে গেছে তারা। কিন্তু গণ-আন্দোলন এমনই একটা ব্যাপার, যার রাশ সবসময় নেতৃত্বের হাতে থাকে না। তাই মাঝে মাঝে বেলাগাম গণ-আন্দোলন থামাতে গিয়ে কড়া ব্যবস্থা নিতে হয়েছে ব্রিটিশ শাসককে। তবে তার জন্য গান্ধীর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কে যে ভীষণ রকমের তিক্ততা এসেছে, এমন নয়। কারণ, বেলাগাম গণ-আন্দোলনকে গান্ধী নিজেই পরিত্যাগ করেছেন। আসলে এই মানুষটি সম্পর্কে ব্রিটিশের ধারণা কখনোই ভীতিকর পর্যায়ের ছিল না, কেননা, গান্ধীর আদর্শবাদ ও গান্ধীর রাজনীতিকে বাস্তবতা বর্জিত এক কাল্পনিক মতবাদ বলে মনে করত ব্রিটিশ। তাঁর অহিংসা, তাঁর সত্যাগ্রহ, তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের গতিপ্রকৃতিতে এক ধরনের মজা পেয়েছিল ব্রিটিশ। তারা মনে করত, এই নাটক কখনো পঞ্চমাঙ্কে পৌঁছবে না, প্রথম দু-এক অঙ্কেই শেষ হয়ে যাবে। তাদের এই ধারণাকে পুষ্ট করেছিল আন্দোলনের চরম পর্যায়ে গিয়ে গান্ধীর পশ্চাদপসরণের একাধিক ঘটনা।

রবীন্দ্রনাথ বনাম গান্ধী : কিন্তু গান্ধীর চিন্তাধারার অসংলগ্নতা ও অবাস্তবতা যে ব্রিটিশের চোখেই শুধু ধরা পড়েছিল, তা নয়। এদেশের মানুষ যাঁরা তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ছিলেন তাঁরা তো বটেই, কংগ্রেসের মধ্যেও বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ বিশ্বাস করতেন যে, গান্ধীর চিন্তাধারা সঠিক ছিল না। এমন কি, তৎকালীন ভারতবর্ষের আর এক কিংবদন্তী পুরুষ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত বেশ কিছু বিষয়ে গান্ধীর আদর্শের ঘোর সমালোচক ছিলেন। ইতিহাসে গান্ধীর স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার ওপর প্রধানত নির্ভর করব আমরা। এবং দেখব, গান্ধীর গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির যৌক্তিকতা কতটা ছিল।

গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের মত ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে খুবই পরিচিত। গান্ধীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত

চিঠিগুলি এই পার্থক্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ দেয়। যে অসহযোগ আন্দোলন গান্ধীর প্রধান রাজনৈতিক অস্ত্র ছিল, রবীন্দ্রনাথ তাকে সমালোচনা করেছেন ধর্মীয় কাজকর্ম বলে। বলেছেন, ভয়ংকর রকমের উচ্ছৃঙ্খলতা (Orgy of frightfulness) যা দেশকে কোনও সুফল তো দেবেই না, বরং নিরর্থক ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে। শুধু এইটুকু বলেই থামেননি, আরও বলেছেন—অসহযোগ আন্দোলন আমাদের বিচ্ছিন্ন করবে পশ্চিমের হৃদয় ও মন থেকে, যা, আধ্যাত্মিক আত্মহত্যার নামান্তর। প্রশ্ন উঠতে পারে, গান্ধী যা করেছেন তা ভুল এবং রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা ঠিক—বিচারের মাপকাঠিকে এমন একদেশদর্শী হিসেবে ধরা হবে কেন? অবশ্যই সঙ্গত প্রশ্ন। তাই আমরা চেষ্টা করব, কার বিশ্বাসে যুক্তি ও বাস্তবতার জোর বেশি ছিল, সেটা দেখতে। সেই সঙ্গে এটাও দেখব, কার মতকে বেশি মান্যতা দিয়েছে ভবিষ্যৎ। রবীন্দ্রনাথের দেহান্ত ঘটেছে ১৯৪১ সালে, আর গান্ধীর দেহান্ত ১৯৪৮ সালে। তার পর থেকে অনেক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। আমরা দেখব, কালের বিচারে কার মতটি বাস্তবোচিত বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রসঙ্গত, একটা কথা সবার আগে জানিয়ে রাখা উচিত। তা হল, গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে শুধু আদর্শগত সংঘাতই ছিল, তা নয়। অনেক বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতের একতাও ছিল। তবে মতে একতা থাকলেও পথ নিয়ে সাধারণভাবে একতা ছিল না। বিষয়টিকে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন জওহরলাল নেহরু। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তিনি তাঁর জেলখানার ডায়েরিতে ১৯৪১ সালের ৭ আগষ্ট তারিখে লিখেছিলেন—"Gandhi and Tagore. Two types entisely different from each other, and yet both of them typical of India, both in the long line of India's great men."

শুধু যে জওহরলালই এই বৈপরীত্য দেখেছিলেন দুজনের মধ্যে, তা নয়। দেখেছিলেন রোমাঁ রোলাঁও। ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে গান্ধীর জীবন নিয়ে লেখা তাঁর পুস্তকটির রচনা শেষ হওয়ার পর তিনি লিখেছিলেন—"আমি আমার গান্ধী পুস্তকটি শেষ করেছি। এই বইয়ে আমি শ্রদ্ধা জানিয়েছি দুই মহান আত্মাটগোর ও গান্ধীকে যাদের মধ্যে ঐশ্বরিক বিভা বিরাজমান।" এই কথা বলার ঠিক পরের মাসে তিনি তাঁর ডায়েরিতে উল্লেখ করলেন দুজনের মধ্যকার ভাবনাগত ও আদর্শগত বিরোধ বিষয়ে। যে বিরোধের কথ তিনি জানতে পেরেছিলেন রেভারেণ্ড সি. এফ. অ্যাণ্ড্রুজের কাছ থেকে।

রোঁলার সঙ্গে আলাপচারিতায় বিরোধের যে বিষয়গুলির উল্লেখ করেছিলেন এণ্ড্রুজ, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল মূর্তিপূজা (Idol-worshipping)। রবীন্দ্রনাথ

বিমূর্ত পরমব্রহ্মের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। পক্ষান্তরে, ব্যক্তিগত ধর্মচর্চায় মূর্তি-আরাধনার প্রতি তেমন কোনও নিষ্ঠা না দেখালেও, মূর্তিপূজার সপক্ষে জোরালো ভাবে কলম ধরেছিলেন গান্ধী। এ বিষয়ে তাঁর যুক্তি ছিল ট্র্যাডিশনাল মূর্তিপূজকদের যুক্তির অনুরূপ। সেটা হল, সাধারণ মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের বিমূর্ত সাধনা বড় কঠিন কাজ। তাই মূর্তির প্রয়োজন আছে। অন্যদিকে, সাধারণ মানুষকে এভাবে বোধহীন শিশুর মত ধরে নেওয়াতে আপত্তি ছিল রবীন্দ্রনাথের। তাঁর মত ছিল, এর ফলে ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণা থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাবে মানুষ। ঈশ্বর নয়, ঈশ্বরের নামাঙ্কিত মূর্তি হয়ে উঠবে প্রধান। কথাটিকে অত্যন্ত সহজভাষায় তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর একটি কবিতায়—

রথযাত্রা লোকারণ্য মহাধূমধান
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম
রথ ভাবে আমি দেব, পথ ভাবে আমি
মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী॥

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, রথ-পথ-মূর্তি—এরাই ক্রমশ প্রধান হয়ে ওঠে মূর্তিপূজক ভক্তদের কাছে। আর যত প্রধান হয়ে ওঠে এই ত্রয়ী, ঈশ্বর তত দূরে চলে যান। মূর্তিপূজায় আজ যাঁরা বিশ্বাস করেন, সাধারণভাবে সেই হিন্দুদের ধর্মচর্চার দিকে তাকালে আমরা কী দেখতে পাই? দেখতে পাই, পূজা রূপান্তরিত হয়েছে উৎসবে। সেখানে ভক্তি নেই, ঈশ্বরকে অনুভব করার কোনও চেষ্টা নেই ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতি কোনও বিশ্বাস নেই। আছে সেই বিশ্বাসের নামে ভণ্ডামি। মনে কি হয় না যে, ঠিক কথাটি বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ?

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীর বিরোধের একটি বড় বিষয় ছিল জাতীয়তাবাদের স্বরূপ নিয়ে। গান্ধী বলেছেন, ভাল জাতীয়তাবাদী হতে পারলে ভাল আন্তর্জাতিকতাবাদী হওয়া যায়। আরও বলেছেন, "....the same way that one must go through war to reach peace." সাধারণভাবে মনে হতে পারে, তাহলে কি গান্ধী যুদ্ধকে সমর্থন করতেন? নইলে কেন বলবেন যে, 'go though war to reach peace?' আসলে হয়তো ব্যাপারটি তা নয়, অহিংসার পথেও যে যুদ্ধ করা যায়, গান্ধী সেকথাই বলতে পারেন।

গান্ধীর জাতীয়তাবাদ, দেশাত্মবোধ, যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানবিরোধিতা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত চিন্তাধারার প্রবল সমালোচনা তাঁর জীবৎকালে শুরু হয়েছিল, এখনও তা শেষ হয়নি। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর অহিংস যুদ্ধের কার্যকারিতা, সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলন বিষয়ে নিজের সিদ্ধান্ত

অপরের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতার বিরুদ্ধেও সেই সময় অনেকেই তীব্র প্রতিবাদ করেছেন, অনেক সময় এই প্রতিবাদের বড় মুখ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। গান্ধীর ব্রহ্মচর্য ও বিবাহ-বিষয়ক মতামত তো হাসির খোরাক হয়ে উঠেছিল মানুষের কাছে। এই সমস্ত বিষয় সেযুগে কিভাবে সমালোচিত হয়েছিল, গান্ধীর মতামত তাঁর সময়ে কতটা প্রাসঙ্গিক ছিল এবং আজ তা কতটা প্রাসঙ্গিক আছে, তার একটা ছোট্ট হিসাবে দিয়ে শেষ করব আমাদের প্রসঙ্গ।

গান্ধীর জাতীয়তাবাদ : স্বাধীনতার জন্য অহিংস পথে সংগ্রাম করা, এই ছিল গান্ধীর জাতীয়তাবাদ। এই সংগ্রামের পদ্ধতি ছিল অসহযোগ আন্দোলন। অসহযোগ আন্দোলনে জিনিষপত্রে আগুন ধরানো হচ্ছিল, সেই পদ্ধতিটির মধ্যে হিংসা ছিল কিনা, সেই প্রশ্ন অনেকেই করেছেন সেদিন। রবীন্দ্রনাথও এই প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি মনে করেছেন এইসব কাজ হল উগ্র জাতীয়তাবাদের কালো দিক।

রবীন্দ্রনাথ অভিযোগ করেছিলেন যে, অসহযোগ আন্দোলন হল হিংসারই আর একটি রূপ। এতে গান্ধী ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে লিখেছিলেন—"I respectfully warn him against mistaking its excrescences for the movement itself."

ইতিহাসের যে কোনও সচেতন ছাত্র মানবেন যে, বিদেশী বস্ত্র বর্জন ইত্যাদি আন্দোলনের দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ অতি সামান্যই উপকৃত হয়েছে। উপকার হোক বা না হোক, প্রশ্নটা অন্য জায়গায়। তা হল, এই ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজে কি কখনও উপকার হওয়া সম্ভব ছিল ?

একই রকম ছিল অসহযোগ আন্দোলনের অন্যান্য কর্মসূচিও। এক নজরে দেখলে বোঝা যাবে, এইসব আন্দোলন প্রচার পেয়েছে বিপুল, তবে সাফল্য সেই তুলনায় না-পাওয়ার সামিল। অসহযোগ আন্দোলনের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাই ছিল এর কারণ। আবার আমাদের আশ্রয় নিতে হবে রবীন্দ্রনাথের কাছে। তিনি মনে করতেন, অসহযোগ আন্দোলন ব্রিটিশের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছিন্নতাই আনতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতে আত্মীকরণ করতেই হবে। এই কারণেই গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনকে রবীন্দ্রনাথ কখনও সমর্থন করেন নি। ইতিহাস প্রমাণ করেছে, এ ব্যাপারে কবির ধারণাই বাস্তবোচিত ছিল।

গান্ধীর ইংরেজি হটাও কর্মসূচি : ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক বন্ধুকে একটা চিঠিতে লেখেন যে, গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের শিকার হচ্ছে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা। সরকারি স্কুল ছেড়ে ছাত্রদের বেরিয়ে আসার যে ডাক গান্ধী দিয়েছিলেন, তার সমালোচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সমালোচনায় ছিল

যুক্তি এবং একটা দূরদৃষ্টি। কয়েকদিন পরেই গান্ধী উত্তর দিয়েছিলেন কবির অভিযোগের। কিন্তু সেই উত্তরে কবির সুনিশ্চিত মতামতকে অগ্রাহ্য করে ইংরেজি শিক্ষা বাতিলের যে কারণগুলি দেখিয়েছিলেন গান্ধী, তাকে নিম্নমানের বলাটা বোধহয় অন্যায় হবে না। গান্ধী বলেছিলেন—ইংরেজি ভাষা ভারতীয়রা শেখে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে, রাজনীতি করার জন্যে এবং বিয়ের জন্য ছাড়পত্র পেতে—"Our boys think, and rightly in the present circumstances, that without English they cannot get Government services. Girls are taught English as a passport to marriage." (Young India, 27 April 1921) । শুধু একটুকু বলেই যে তিনি ক্ষান্ত হলেন, তা নয়। আরও লিখলেন—যে সব কুসংস্কার ভারতের সবচেয়ে ক্ষতি করছে, তাদের মধ্যে প্রধানতমটি হল এই যে, ইংরেজি ছাড়া স্বাধীনতার ধারণা সম্পূর্ণ হয় না এবং চিন্তার পূর্ণ স্ফূরণ হয় না এমন একটি ধারণা। বেশ বড় আকারের প্রবন্ধ ছিল এটি। এই প্রবন্ধে ইংরেজি হঠাও-এর যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে টেনে এনেছিলেন রাজা রামমোহন রায় ও বালগঙ্গাধর তিলকের প্রসঙ্গ এবং একটি অত্যন্ত অপমানজনক উক্তি করেছিলেন তাঁদের প্রসঙ্গে। তিনি লিখেছিলেন—"Rammohan Roy would have been a greater reformer, and Lokmanya Tilak would have been a greater scholar, if they had not to start with the handicap of having to think in English and transmit their thoughts chiefly in English." অর্থাৎ ইংরেজিতে চিন্তা না করলে এবং ইংরেজি চিন্তা ইংরেজিতে প্রকাশ না করলে রামমোহন রায় আরও বড় সমাজসংস্কারক এবং লোকমান্য তিলক আরও বড় পণ্ডিত হতে পারতেন। অর্থাৎ ইংরেজিতে ভাবার জন্য ও লেখার জন্য তাঁরা ততটা বড় হতে পারেন নি। মনে রাখতে হবে, এমন উক্তি গান্ধী করছেন ১৯২১ সালে! সবে ব্রিটিশের বদান্যতায় এদেশে এসে পায়ের তলায় মাটি পেয়েছেন যখন, তখন। রবীন্দ্রনাথ তখন জুরিখে ছিলেন। গান্ধীর সমালোচনার ভাষায় তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন, বিশেষ করে রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে যে অপমানকর ভাষা গান্ধী ব্যবহার করেছিলেন, তারজন্য। ১০ই মে ১৯২১ তারিখে বন্ধু রেভারেণ্ড সি. এফ. অ্যাণ্ড্রুজকে লেখা এক চিঠিতে তিনি তাঁর প্রতিবাদ জানালেন—"I strongly protest against Mahatina Gandhi's trying to cut down such great personalities of Modern India as Rammohan Roy in his blind zeal for crying down our modern education." গান্ধীর সমালোচনা

রবীন্দ্রনাথকে এই কথাটিও বলতে বাধ্য করেছিল যে, গান্ধী ক্রমশই অধিকতর আত্মগর্বী হয়ে পড়ছেন—"(He) is growing enamoured of his own doctrines–a dangerous form of egatism, that even great people suffer from at a time."

এই প্রসঙ্গে সম্প্রতিকালে বিভিন্ন বইয়ে এই সম্পর্কে কিছু ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, উড়িষ্যার এক জনসভায় নাকি কবীর ও নানকের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে রামমোহনকে 'পিগ্‌মি' বলে উল্লেখ করেছিলেন গান্ধী। যদিও, তা তিনি বলেন নি। তবে এটাও স্বীকার করতে হয় যে, রামমোহনকে তিনি ছোট করে দেখাতে চেয়েছিলেন। আর ঘটনাটি ১৬ই জুলাই ১৯২১ সালে বোম্বাই বন্দরে নামার পর যে রবীন্দ্রনাথ জেনেছিলেন, তা নয়। রামমোহন ও তিলক সম্পর্কে গান্ধীর কুরুচিকর মন্তব্যটি উড়িষ্যার এক জনসভায় বলেন নি গান্ধী, সেটি তিনি লিখেছিলেন ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকার ২৭শে এপ্রিল (১৯২১) সংখ্যায়। লেখাটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় কয়েকদিন পরে। তিনি তখন জুরিখে। ১০ই মে (১৯২১) তারিখে সি. এফ. অ্যাণ্ড্রুজকে চিঠি লেখেন তিনি।

ইংরেজি শিক্ষার প্রতি গান্ধীর এই যুদ্ধঘোষণা সাময়িক ভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছিল বটে, তবে বেশিদিন পারেনি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও কয়েক দশক ধরে গান্ধীভক্ত শাসককূল ইংরেজিকে নির্বাসন দেওয়ার চেষ্টা করেছিল বটে, তবে আজ আর সেই চেষ্টার নামগন্ধটি মাত্র নেই। গান্ধীর দৃষ্টি যে কতটা স্বল্পপরিসরের মধ্যে নিবন্ধ ছিল, এটি তার আর এক প্রমাণ।

গান্ধী ও আধুনিক সভ্যতা : আধুনিক সভ্যতা মানবজাতির পক্ষে অত্যন্ত ভয়াবহ। হিন্দু স্বরাজ পত্রিকায় ভারতের সমস্যা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে একথা লিখেছিলেন গান্ধী। লিখেছিলেন, কর্মী হিসেবে এবং উপভোক্তা হিসেবে মানুষ আজ যন্ত্রের দাস হয়ে পড়েছে। সাম্রাজ্যবাদ ও জাতিবাদ এই সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আরোগ্যের নামে আধুনিক ঔষধ পর্যন্ত উপকারের পরিবর্তে মানুষের অপকার করে রোগ আরও ছড়িয়ে দেয়। (প্রসঙ্গত, এইজন্য নিজের স্ত্রী অসুস্থ হলেও ওষুধ খাওয়াননি তিনি) আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার প্রচুর দোষের উল্লেখ করে তিনি এই সভ্যতাকে পরিত্যজ্য মনে করেছেন। আধুনিক সভ্যতার মাত্র দুটি গুণ তিনি দেখেছিলেন। এক, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা, যা তাঁর মতে সত্যকে (Truth) আবিষ্কার করা। এবং দুই, পশ্চিমী জীবনের সংঘবদ্ধতা, যা থেকে শিক্ষা নেওয়া যায়।

বলা বাহুল্য, আধুনিক সভ্যতার এমন বিরোধকে কেউই আজ সমর্থন করেন না। তা করলে 'চরৈবেতি'র মূল মন্ত্রেরই বিরোধিতা করা হয়। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে না চেয়ে যারা নিজেকে আটকে রাখতে চায়

সংকীর্ণ 'ঘেটো'র মধ্যে, তারা আজ পৃথিবীতে সবচেয়ে যে পশ্চাৎপদ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

গান্ধীর কুসংস্কার ও বিজ্ঞান বিরোধিতা : গান্ধীর মধ্যে কুসংস্কার ও বিজ্ঞানবিরোধী একটি সত্তা বিপুল ভাবে কাজ করত। ব্যাপারটা এন্নিতে খারাপ তো বটেই, কিন্তু আরো খারাপ হয়ে যেত যখন গান্ধী এটাকে রাজনীতির প্রয়োজনে জেনেশুনে ব্যবহার করতেন। ১৯৩৪ সালের জানুয়ারি মাসে বিহারে ভয়ংকর ভূমিকম্প হয়, যাতে কয়েকহাজার মানুষের মৃত্যু হয়! এই ভূমিকম্পকে অস্পৃশ্যদের ওপর উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অত্যাচারের জন্য ঈশ্বরের দেওয়া অভিসম্পাত বলে বর্ণনা করলেন। একবারও খেয়াল করলেন না যে, ভূমিকম্পে শুধু উচ্চবর্ণের মানুষ মরেনি, অনেক বেশি পরিমাণে মরেছে নীচুবর্ণের মানুষ। উচ্চবর্ণকে শাস্তি দিতে ভগবান যদি এই কাণ্ডটি ঘটিয়ে থাকেন, তবে তো উচ্চবর্ণের মানুষদেরই মারবেন। তাছাড়া এমন একটি অবৈজ্ঞানিক মত যদি গান্ধীর মত মানুষের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, তাহলে মানুষের বিজ্ঞানমনস্কতা কোথায় পৌঁছায় ? আরও বড় কথা, এমন ব্যাখ্যা এসে গেলে প্রশাসনেরও তো সুবিধা হয় ঘাড় থেকে দায়-দায়িত্ব ফেলে দিতে!

রবীন্দ্রনাথ এব্যাপারে গান্ধীর সমালোচনা করে লিখেছিলেন—"It is all the more unfortunate because this kind of unscientific view of (natural) phenomena is too readily accepted by a large section of our countrymen."

চরকার অর্থনীতি : প্রতিটি ভারতবাসীর প্রতিদিন অন্তত কিছুটা সময় চরকা কাটা উচিত—বলেছিলেন গান্ধী। চরকা এইজন্যেই কাটা উচিত কারণ এর দ্বারা ভারতবাসীর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি হবে। চরকা কাটার মধ্য দিয়ে গান্ধী ভারতের অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটাতে চেয়েছিলেন। গান্ধীর এই ধারণার সমালোচক ছিলেন বিরাট সংখ্যক মানুষ। চরকায় সুতো কেটে ও সেই সুতোয় তৈরি খাদি পোশাক পরে বিদেশি বস্ত্রের বিরোধিতা করার এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ছিলেন স্বয়ং গান্ধীপত্নী কস্তুরবাও। খাদিবস্ত্র পরতে প্রচণ্ড আপত্তি ছিল তাঁর, পরেনও নি। এ ব্যাপারে গান্ধীর মুখ রেখেছিলেন তাঁর তথাকথিত আধ্যাত্মিক স্ত্রী সরলা দেবী চৌধুরাণী।

সে যাই হোক, চরকা কেটে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতির এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি গান্ধীর এই পরিকল্পনাকে বলেছিলেন অবাস্তব। বলেছিলেন, প্রগতির চাকা এগোবার বদলে পিছিয়ে যাবে এমনতর অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য। রোঁমা রোঁলা জানিয়েছেন, চরকার বিরুদ্ধে বলতে কখনও ক্লান্তি বোধ করতেন না কবি। বলা বাহুল্য, তাঁর এই সমালোচনায় গান্ধী

যে ক্রোধান্বিত হন নি, তা নয়। পাল্টা বলেছেন—"The poet lives for the morrow, and would have us do likewise......" Why should I, who have no need to work for food, spin?" may be the question asked. Because I am eating what does not belong to me. I am living on the spoliation of my countrymen. Trace the source of every coin that finds its way into your pocket, and you will realise the truth of what I write. Every one must spin. Let Tagore spin like the others. Let him burn his foreign clothes; that is the duty today. God will take care of the morrow." প্রচণ্ড রেগে গেলেই এখন ঝগড়ার কথা বেরিয়ে আসে। কবিকে কী না বললেন গান্ধী! দেশবাসীর টাকা লুট করে তিনি বেঁচে আছেন, এমন কথা বললেন। কবির পকেটে যে মুদ্রাগুলি আছে, সেগুলো কিভাবে এসেছে, তার উৎস সন্ধান করতে বললেন, তাঁকে চরকা কাটার উপদেশ দিলেন এবং বললেন তাঁর বিদেশী কাপড়চোপড় পুড়িয়ে ফেলতে। কারণ, এটা হল আজকের দিনের কর্তব্য। আগামী দিনের কথা ঈশ্বর ভাববেন।

বলা বাহুল্য, গান্ধীর চরকা ও গ্রামীণ অর্থনীতির ভাবনা অবাস্তব বলেই পরিত্যক্ত হয়েছে। আজ নয়, বহুদিন আগেই। সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে কবিগুরুর কথা।

বিবাহ বিষয়ক গান্ধী ভাবনা : সম্ভবত, এবিষয়ে কিছু বলার অপেক্ষা নেই আর। এই বইয়ে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে গান্ধীর ব্রহ্মচর্য সাধনার কথা। দেখানো হয়েছে, এটা কিভাবে অসুখে রূপান্তরিত হয়েছিল গান্ধীর ক্ষেত্রে। যদিও সাধারণভাবে ভীমরতি বৃদ্ধবয়সে মানুষের মধ্যে আসে, তবে তাঁর বেলায় বেশ খানিকটা তাড়াতাড়ি এসেছিল। যাই হোক, তাঁর ব্রহ্মচর্য মানুষ গ্রহণ করেনি, রাষ্ট্রের পক্ষেও গ্রহণের প্রশ্নই ওঠে না। অতএব এ ব্যাপারে গান্ধী সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। সঙ্গত কারণেই, একই কথা প্রযোজ্য বৈবাহিক জীবন কেমনভাবে কাটাবে স্বামী-স্ত্রী—সেই সম্পর্কে তাঁর নির্দেশাবলীর ব্যাপারেও। তাঁর বাণীকে অবাস্তব বললে কম বলা হয়, পাগলের প্রলাপ বলাটাই ভাল।

কথা শেষ : জীবনের এমন কোনও দিক সম্ভবত নেই, যা নিয়ে গান্ধী অভিমত দেননি। সমস্ত দিক নিয়ে এখানে আলোচনা করা গেল না, পরে আবার কখনও দৃষ্টিপাত করা যাবে এব্যাপারে। আপাতত তাই ইতি টানছি। কিন্তু এর পরে এই অধ্যায়ের নামকরণ করেছি যে প্রশ্নটির মধ্যে দিয়ে, সে সম্পর্কে উত্তরটি দিয়ে শেষ করব প্রসঙ্গ। প্রশ্নটি ছিল—তিনি বামন, নাকি বামনাবতার ?

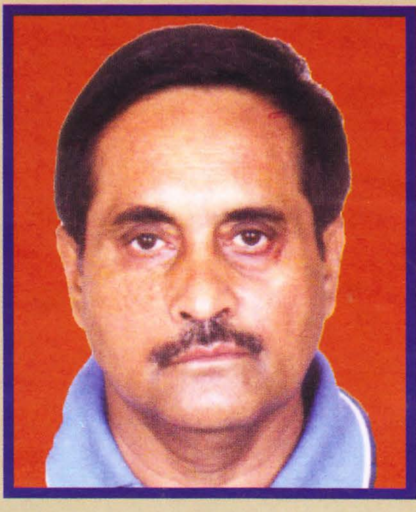
ইতিহাসের প্রতি সুবিচার করলে বলতে হয়, তিনি বামনও নন, বামনাবতারও নন। তিনি মানুষ। এবং মানুষের মধ্যেও অবশ্যই অ-সাধারণ। বেশ কিছু গুণের সঙ্গে বেশ কিছু দোষও আছে তাঁর মধ্যে। এই সবকিছু নিয়ে তাঁর আদর্শ, তাঁর রাজনীতি, তাঁর সমগ্র সত্তা। তিনি চেয়েছিলেন অনেক কিছু করতে, কিন্তু তাঁর চরিত্রের অন্তর্নিহিত ব্যাধিগুলি তাঁকে ঠিক পথ দেখায় নি। এর দায় অবশ্যই তাঁর নিজের, কিন্তু তাঁর সঙ্গীদেরও দায়মুক্ত করা যায় না। নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থে গান্ধীকে ব্যবহার করেছেন তাঁরা। গান্ধীর অন্যায় কাজকে মেনে নিয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে পাকাপাকি ভাবে চলে আসার পর গান্ধীর সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্ত ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনকে সাহায্য করা। কংগ্রেসের মধ্যে বিরোধ হয়েছিল। কিন্তু দলীয় অর্ন্তদ্বন্দ্বে গান্ধীর পক্ষে সমর্থন ভারি হয়। প্রথম পরীক্ষায় এভাবে জয়ী হওয়ার পর গান্ধীর একনায়কতান্ত্রিক মনোভাব ক্রমশই বাড়তে থাকে। তারপর থেকে তো একের পর এক ভুলের লম্বা ফিরিস্তি। খিলাফত, চৌরিচৌরা, মোপলা বিদ্রোহ—কোন্‌টা ছেড়ে কোনটার কথা বলব ? শেষদিকে একমাত্র প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ছিল সুভাষচন্দ্রের, গান্ধীর রাজনীতি তাঁকেও কংগ্রেসের বাইরে ফেলে দিল। তেমন কোনও প্রতিবাদই হল না এমন অন্যায়ের বিরুদ্ধে। সুতরাং গান্ধী যদি একনায়ক হয়ে ওঠেন, তবে দোষ কি তাঁর একার ? তা নয় বোধহয়।

আর বড় দোষ এদেশের মানুষের। যাঁরা গান্ধীকে ভগবান বানিয়ে ছেড়েছেন। ভারতীয়রা চিরকালই অলৌকিকত্বে আস্থাশীল। কারও মধ্যে কিছু অসাধারণত্ব দেখলে তাঁকে ভগবান না বানিয়ে ছাড়েন না। সেইজন্যেই এদেশে এত মহাত্মার ছড়াছড়ি। অমুক বাবা, তমুক বাবা। চোর-জোচ্চোর-খুনী-লম্পট-ধর্ষকরাও এদেশে মাথায় পাগড়ি বেঁধে কিংবা লেঙটি পরে দেবতার অভিনয় করে বেড়ায় এবং মানুষ তা মহা বিশ্বাসে মেনেও নেয়। এই বিশ্বাসের জোরে গান্ধী তাঁর প্রাপ্য উচ্চতার ওপরে কয়েকগুণ উচ্চতা বাড়িয়ে নিয়েছেন। হয়ে গেছেন গান্ধীবাবা, মহাত্মা। তাঁর চরিত্রে দোষণীয় কিছু থাকতে পারে না, এটাই হয়ে উঠল সবার বিশ্বাস। আসল ব্যাপারটা যদিও তা নয়। প্রতিটি মানুষের মধ্যে একটি মহাত্মা সত্তা থাকে, একটি থাকে পাপাত্মা সত্তা। গান্ধীর মধ্যেও এই সত্তা দুটি ছিল। দুঃখের কথা, মহাত্মা সুলভ অনেক কাজ করেছেন বটে তিনি, কিন্তু পাপাত্মাসুলভ কাজও কম নেই। নিক্তিতে তুলে বিচার করলে দেখব, দেশের প্রতি মানুষের প্রতি কম অন্যায় তিনি করেননি। এবং সবচেয়ে বড় কথা, প্রমাণিত হওয়ার পরও অন্যায়কে অন্যায় বলতে তিনি প্রস্তুত থাকতেন না। তাকে সমর্থন করে যেতেন।

গান্ধী চরিত্রের ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতা এখানেই।

তথ্যপঞ্জী

1. Going Native : Gandhi's Relationship with western women by Thomas Weber.
2. Gandhi by Romain Rolland
3. Soulmates : The story of Mahatma Gandhi and Hermann Kallenbach by Shimon Lev.
4. Perceptions, Emotions, Sensibilities : Essays on India's Colonial and Post Colonial Experiences by Tapan Raychaudhuri.
5. Mahatma Gandhi's Letters on Brahmacharya, Sexuality and Love By Girja Kumar.
6. The Myth of Mahatma Gandhi By Arthur Kemp.
7. The Mukherjee Commission Report.
8. The Gandhi You May Not Know By Rajmohan Gandhi.
9. Great Soul by Joseph Lelyveld.
10. Gandhi : Naked Ambition by Jad Adams.
11. The last Phase by Pyarelal Nayyar.
12. The Men who killed Gandhi By Manohar Malgonkar.
13. Murder of Mahatma by G. D. Khosla.
14. Brahmacharya, Gandhi and his Women Associates by Girja Kumar.
15. Gandhi Before India by Ramchandra Guha.
16. Gandhi : Behind the Mask of Divinity by G. B. Singh.
17. The Life and Death of Mahatma Gandhi by Robert Payne.
18. Gandhi : The Man by Millie Polak.
19. Gandhi Responsible for Partition by V.N. Datta (News article published in the Tribune, Chandigarh on 30.12.2002).
20. Subhas Chandra Bose 1897–1945 by Prof. Satadru Sen.
21. Was Gandhi a Tantric? by Nicholas Gier.
22. Gandhi offer of Jinnah PM-ship 1947–Cabinet Mission Plan Mountbatten Papers Dt. 01.04.1947, 05.04.1947, 08.04.1947, 10.04.1947 and 11.04.1947.
23. Role of Celibacy in Spiritual Life : An Interview with Swami Chinmayananda.
24. Gandhi's Autobiography
25. Gandhi, Kasturba by Lorna Mungur.
26. Collected works of Mahatma Gandhi
27. The Prolonged Partition and its Programs : Testimonies of Violence Against Hindus in East Bengal 1946-64 by A. J. Kamraj
28. পাক-ভারতের রূপরেখা by প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ি
29. Mahatma Gandhi and His Apostles by Ved Mehta
30. My Religion by Leo Tolstoy.
31. Mahatma Gandhi by Dhananjay Keer.
32. Gandhi and Godse by Koenrad Elst.
33. এছাড়াও ট্রিবিউন, টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ডেইলি মেল, নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যাবলী।



মনোজ দাশ: জন্ম ১৯৪৮ বর্তমান উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত বরুণহাট গ্রামে। পিতৃপুরুষের আদি নিবাস বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত ঘলঘলে গ্রাম। ১৯৫০-এর হিন্দুনিধন যজ্ঞের সময় দেশত্যাগ করে সুন্দরবনাঞ্চলের কালীনগর গ্রামে চলে আসেন পিতা-পিতামহ। শিক্ষার পাট শেষ করে প্রথমে স্কুলে শিক্ষকতা, তারপর স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ায় কর্মজীবন। মূলত গল্পলেখক হলেও আকাশবাণী কলকাতার জন্য কুড়িটি নাটক লিখেছেন। প্রথম নাটক 'অলৌকিক অভিনয়' বেতার নাটক প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত। বিভিন্ন লিটিল ম্যাগাজিনের নিয়মিত লেখক। এছাড়াও বিভিন্ন প্রথম শ্রেণির পত্রিকায় নিয়মিত লেখেন।

কলকাতা বইমেলা ২০১৪-য় লেখকের গ্রন্থ 'প্রসঙ্গ মুসলমানদের উন্নয়ন ও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক' বইটিতে মুসলমানদের করণীয় বিষয়ে বলতে গিয়ে মৌলবাদী বিষ যেমন ছড়াননি, তেমনই তথাকথিত সেকুলারদের মত তুষ্টিকরণের রাজনীতিও করেননি।

'মহাত্মা গান্ধী কেন মহাত্মা নন' বইটিতে মিথের আবরণ সরিয়ে সোজা চোখে গান্ধীকে দেখেছেন লেখক। গান্ধী-চরিত্রের অসংলগ্নতা ও অব্যবস্থিতচিত্ততা, গান্ধী-রাজনীতির অদূরদর্শিতা ও অহংসর্বস্বতা, গান্ধী-আদর্শের অবাস্তবতা ও কল্পনানির্ভরতা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়কে সৎ সমালোচকের দৃষ্টিতে বিচার করেছেন লেখক। এবং সেই বিচারের প্রেক্ষিতে নির্দেশ করেছেন ইতিহাসে তাঁর প্রাপ্য স্থান।